ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

Web: www.at-tahreek.com

২০তম বর্ষ ১ম সংখ্যা

অক্টোবর ২০১৬

Contents

بسم الله الرحمن الرحيم

রেজিঃ নং রাজ ১৬৪

মাসিক

আত-তাহরীক

مجلة "التحريك" الشهرية علمية أدبية ودينية

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

www.at-tahreek.com

২০তম বর্ষ ১ম সংখ্যা

যিলহজ্জ-মুহাররম ১৪৩৭-৩৮ হিঃ

আশ্বিন-কার্তিক ১৪২৩ বাং

অক্টোবর ২০১৬ ইং

সার্বিক যোগাযোগ

সম্পাদক, মাসিক আত-তাহরীক
নওদাপাড়া (আমচত্বর)
পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩
ফোন ও ফ্যাক্স : ০৭২১-৮৬১৩৬৫।
সহকারী সম্পাদক : ০১৯১৯-৪৭৭১৫৪
সার্কুলেশন বিভাগ : ০১৫৫৮-৩৪০৩৯০
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বই বিভাগ : ০১৭৭০-৮০০৯০০
ফৎওয়া হটলাইন : ০১৭৩৮-৯৭৭৭৯৭
কেন্দ্রীয় 'আন্দোলন' অফিস : ০৭২১-৭৬০৫২৫
'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ' ঢাকা অফিস : ০২-৯৫৬৮২৮৯
ই-মেইল : tahreek@ymail.com
ওয়েবসাইট : www.at-tahreek.com

হাদিয়া : ২০ টাকা মাত্র

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা	সাধারণ ডাক	রেজিঃ ডাক
বাংলাদেশ	(ষাণ্মাসিক ১৬০/-)	৩০০/-
সার্কভুক্ত দেশসমূহ	৮০০/-	১৪৫০/-
এশিয়া মহাদেশের অন্যান্য দেশ	১১৫০/-	১৮০০/-
ইউরোপ-আফ্রিকা ও অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশ	১৪৫০/-	২১০০/-
আমেরিকা মহাদেশ	১৮০০/-	২৪৫০/-

সূচীপত্র

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত এবং হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, নওদাপাড়া, রাজশাহী হ'তে মুদ্রিত।

Contents

আল্লাহ্র সামনে ঝগড়া

আল্লাহ বলেন, '..মানুষ হ'ল সবচেয়ে বেশী ঝগড়া প্রিয়' *(কাহফ ১৮/৫৪)*। তিনি বলেন, 'যদি তোমার প্রতিপালক চাইতেন, তবে সকল মানুষকে একই দলভুক্ত করতেন। কিন্তু তারা সর্বদা মতভেদ করতেই থাকবে'। 'কেবল তারা ব্যতীত যাদের উপর তোমার পালনকর্তা অনুগ্রহ করেন..' *(হূদ ১১/১১৮-১৯)*। মানুষ কেবল দুনিয়াতেই ঝগড়া করবে না, ক্বিয়ামতের দিনও আল্লাহ্র সামনে ঝগড়া করবে। যেমন তিনি বলেন, 'অতঃপর ক্বিয়ামতের দিন তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের সামনে আপোষে ঝগড়া করবে' *(যুমার ৩৯/৩১)*। এর দ্বারা কাফির-মুমিন ও যালেম-মযলূম সবাইকে বুঝানো হয়েছে। কেননা দুনিয়াতে এদের ঝগড়া মিটবে না। আল্লাহ্র সামনে গিয়েও এরা ঝগড়া করবে এবং প্রত্যেকে নিজের পক্ষে ছাফাই গাইবে। কে না জানে যে, জীবনের বিপরীত হ'ল মৃত্যু। যখন তার আর কিছুই করার ক্ষমতা থাকেনা। অথচ এমন একটি অবিসংবাদিত সত্য বিষয় নিয়েও মানুষ ঝগড়া করে। আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয়ই তুমি মৃত্যুবরণ করবে এবং তারাও মৃত্যুবরণ করবে' *(যুমার ৩৯/৩০)*। আয়াতটি কুরআনের মৌলিক আয়াত সমূহের অন্যতম। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মৃত্যুর পর আবুবকর (রাঃ) শোকাহত ছাহাবীদের সামনে এই আয়াতটি পাঠ করেই তাদের শান্ত করেছিলেন। সেই সাথে তিনি আলে ইমরান ১৪৪ আয়াতটিও পাঠ করেছিলেন *(বুখারী হা/৩৬৬৮)*। কিন্তু যুগে যুগে মূর্তিপূজারীরা মূর্তির মধ্যে জীবনের কল্পনা করেছে। অন্যদিকে মারেফতী নামধারী কিছু লোক রাসূল (ছাঃ)-এর বরযখী জীবনকে দুনিয়াবী জীবনের সাথে তুলনা করে তিনি কবরে সবকিছু শুনতে পান ও মানুষের ভাল-মন্দ করতে পারেন বলে ধারণা করেন। সেই সাথে 'পীর-আউলিয়ারা মরেন না' বলে মিথ্যা প্রচার করেন। অথচ আল্লাহ এদের ঝগড়া অবশ্যই মিটাবেন সূক্ষ্ম বিচারের মাধ্যমে। তিনি বলেন, 'নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক ক্বিয়ামতের দিন তাদের মতভেদের বিষয়গুলিতে তাদের মধ্যে ফায়ছালা করে দিবেন' *(সাজদাহ ৩২/২৫)*।

তিনি বলেন, 'আর মানুষের মধ্যে কিছু লোক এমন রয়েছে, যারা অন্যকে আল্লাহ্র সমকক্ষ সাব্যস্ত করে। তারা তাদেরকে ভালোবাসে আল্লাহকে ভালোবাসার ন্যায়। কিন্তু যারা ঈমানদার তারা আল্লাহ্র জন্য সর্বাধিক ভালোবাসা পোষণ করে থাকে...। 'আর (স্মরণ কর) যেদিন অনুসরণীয়গণ তাদের অনুসারীদের থেকে পৃথক হয়ে যাবে এবং তারা আযাবকে প্রত্যক্ষ করবে ও পরস্পরের সকল সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে'। '(সেদিন) অনুসারীরা বলবে, যদি আমাদের (পৃথিবীতে) ফিরে যাওয়ার সুযোগ হ'ত, তাহ'লে আমরা তাদের থেকে পৃথক হয়ে যেতাম, যেমন তারা (আজ) আমাদের থেকে পৃথক হয়ে গেছে। এভাবেই আল্লাহ তাদের কৃতকর্ম সমূহকে তাদের জন্য অনুতাপ হিসাবে দেখাবেন। আর তারা কখনোই জাহান্নাম থেকে বের হ'তে পারবে না' *(বাক্বারাহ ২/১৬৫-৬৭)*।

সেদিন 'তাদেরকে তোমার প্রতিপালকের সম্মুখে হাযির করা হবে সারিবদ্ধভাবে..., 'অতঃপর পেশ করা হবে আমলনামা। তখন তাতে যা আছে তার কারণে তুমি অপরাধীদের দেখবে আতংকগ্রস্ত। তারা বলবে, হায় আফসোস! এটা কেমন আমলনামা যে, ছোট-বড় কোন কিছুই ছাড়েনি, সবকিছুই গণনা করেছে? আর তারা তাদের কৃতকর্ম সামনে উপস্থিত পাবে। বস্তুতঃ তোমার প্রতিপালক কাউকে যুলুম করেন না' *(কাহফ ১৮/৪৮-৪৯)*। তিনি বলেন, '...আর ক্বিয়ামতের দিন আমরা তাকে বের করে দেখাব একটি আমলনামা, যা সে খোলা অবস্থায় পাবে'। '(সেদিন আমরা বলব,) তুমি তোমার আমলনামা পাঠ কর। আজ তুমি নিজেই নিজের হিসাবের জন্য যথেষ্ট'। 'যে ব্যক্তি সৎপথ অবলম্বন করে, সে তার নিজের মঙ্গলের জন্যেই সেটা করে। আর যে ব্যক্তি পথভ্রষ্ট হয়, সে তার নিজের ধ্বংসের জন্যেই সেটা হয়। বস্তুতঃ একের বোঝা অন্যে বহন করে না। আর আমরা রাসূল না পাঠানো পর্যন্ত কাউকে শাস্তি দেই না' *(ইসরা ১৭/১৩-১৫)*। 'যেদিন অবিশ্বাসীদের জাহান্নামের দিকে দলে দলে হাঁকিয়ে নেওয়া হবে। অতঃপর যখন তারা জাহান্নামের কিনারে এসে উপস্থিত হবে ও তার দরজা সমূহ খুলে দেওয়া হবে, তখন তার দাররক্ষীরা বলবে, তোমাদের নিকটে কি তোমাদের মধ্য থেকে রাসূলগণ আসেন নি?... তারা বলবে, অবশ্যই এসেছিলেন।... বলা হবে, তোমরা জাহান্নামে প্রবেশ কর স্থায়ীভাবে। কতইনা নিকৃষ্ট আবাসস্থল এটি অহংকারীদের জন্য' *(যুমার ৩৯/৭১-৭২)*। সেদিন বাম হাতে আমলনামা প্রাপ্তরা বলবে, 'হায় যদি আমাকে আজ আমলনামা না দেওয়া হ'ত'! 'হায় যদি আমি আমার হিসাব জানতে না পারতাম'! 'আজ আমার ধন-সম্পদ কোন কাজে লাগল না'! 'আমার রাজনৈতিক ক্ষমতা আজ ধ্বংস হয়ে গেছে'! 'এ সময় বলা হবে, ওকে ধর'। 'অতঃপর ওকে বেড়ীবদ্ধ কর'। 'অতঃপর ওকে জাহান্নামে নিক্ষেপ কর'। 'অতঃপর সত্তর হাত লম্বা শিকল দিয়ে ওকে শক্ত করে বেঁধে ফেল' *(হাক্কাহ ৬৯/২৫-৩২)*।

'সেদিন তারা বলবে, হায়! যদি আমরা আল্লাহকে মানতাম ও রাসূলকে মানতাম'! 'তারা আরও বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা আমাদের নেতাদের ও বড়দের আনুগত্য করতাম। অতঃপর তারাই আমাদের পথভ্রষ্ট করেছিল'। 'হে আমাদের প্রতিপালক! তাদেরকে তুমি দ্বিগুণ শাস্তি দাও এবং তাদেরকে মহা অভিশাপ দাও' *(আহযাব ৩৩/৬৬-৬৮)*। আল্লাহ বলেন, '...সেদিন পাপীদের জন্য কোন সুসংবাদ থাকবে না। তারা বলবে, বাঁচাও বাঁচাও'। 'আর আমরা সেদিন তাদের কৃতকর্মসমূহের দিকে মনোনিবেশ করব। অতঃপর সেগুলিকে বিক্ষিপ্ত ধূলিকণায় পরিণত করব' *(ফুরক্বান ২৫/২২-২৩)*। 'যালেম সেদিন নিজের দু'হাত কামড়ে বলবে, হায়! যদি (দুনিয়াতে) রাসূলের পথ অবলম্বন করতাম'। 'হায় দুর্ভোগ! যদি আমি অমুককে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করতাম'! 'আমার কাছে উপদেশ (কুরআন) আসার পর সে আমাকে পথভ্রষ্ট করেছিল। বস্তুতঃ শয়তান মানুষের জন্য পথভ্রষ্টকারী'। 'সেদিন রাসূল বলবেন, হে আমার প্রতিপালক! নিশ্চয়ই আমার উম্মত এই কুরআনকে পরিত্যাজ্য গণ্য করেছিল'। 'এভাবেই আমরা প্রত্যেক নবীর জন্য অপরাধীদের মধ্য থেকে শত্রু করেছি। আর তোমার জন্য পথপ্রদর্শক ও সাহায্যকারী হিসাবে তোমার পালনকর্তাই যথেষ্ট' *(ফুরক্বান ২৫/২৭-৩১)*।

'(সেদিন) জান্নাতবাসীরা জাহান্নামবাসীদের (উপহাস করে) বলবে, আমাদের প্রতিপালক আমাদের যেসব প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, সবই আমরা যথার্থভাবে পেয়েছি। এখন তোমরা কি তোমাদের প্রতিপালকের দেওয়া প্রতিশ্রুতি যথার্থভাবে পেয়েছ? তারা বলবে, হ্যাঁ। অতঃপর একজন ঘোষক উভয় দলের মধ্যে ঘোষণা করে বলবে, যালিমদের উপর আল্লাহ্র অভিসম্পাৎ'। 'তারা আল্লাহ্র পথ থেকে মানুষকে বাধা দিত এবং তাতে বক্রতা খুঁজে বেড়াত। আর তারা আখেরাতকে অস্বীকার করত' *(আ'রাফ ৭/৪৪-৪৫)*।

অতঃপর মানব জাতির প্রতি সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্র নাযিলকৃত সর্বশেষ আয়াত, 'আর তোমরা ঐ দিনকে ভয় কর, যেদিন তোমরা সকলে আল্লাহ্র নিকটে ফিরে যাবে। আর সেদিন প্রত্যেকে স্ব স্ব কর্মের ফল পুরোপুরি পাবে এবং তাদের প্রতি কোনরূপ অবিচার করা হবে না' *(বাক্বারাহ ২/২৮১)*। তালাবদ্ধ হৃদয় সমূহে কুরআনের উপরোক্ত বাণীগুলি করাঘাত করবে কি? অতঃপর ২০তম বর্ষের শুরুতে আল্লাহ্র জন্য রইল সকল প্রশংসা *(স.স.)*।

Contents

কুরআন অনুধাবন

-মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ-

অনুবাদ : 'এটি এক কল্যাণময় কিতাব, যা আমরা তোমার প্রতি নাযিল করেছি। যাতে তারা এর আয়াতসমূহ অনুধাবন করে এবং জ্ঞানীরা উপদেশ গ্রহণ করে' *(ছোয়াদ ৩৮/২৯)*।

অত্র আয়াতে আল্লাহ মানুষকে কুরআন গবেষণা ও তার তাৎপর্য অনুধাবনের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছেন। একই মর্মে কুরআনে বহু আয়াত এসেছে। যেমন বলা হয়েছে, أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلاَفًا كَثِيرًا- 'তারা কেন কুরআন নিয়ে গবেষণা করে না? যদি এটা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারু নিকট থেকে আসত, তাহ'লে তারা এর মধ্যে বহু গরমিল দেখতে পেত' *(নিসা ৪/৮২)*। যারা কুরআন গবেষণা করেনা, তাদের প্রতি ধমক দিয়ে আল্লাহ বলেন, أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا- 'তবে কি তারা কুরআনকে গভীরভাবে অনুধাবন করে না? নাকি তাদের হৃদয়গুলি তালাবদ্ধ?' *(মুহাম্মাদ ৪৭/২৪)*।

'তাদাব্বুর' অর্থ চিন্তা-গবেষণা। এর বিপরীত হ'ল উদাসীনতা ও অজ্ঞতা। যেকোন বিষয়ে চিন্তা-গবেষণা মূল জিনিষ। এটা না থাকলে জ্ঞান সম্পন্ন প্রাণী হিসাবে মানুষের পৃথক কোন মূল্য থাকে না। 'কুরআন' আল্লাহ্‌র কালাম। যিনি জ্ঞানের আধার। তাঁর অফুরন্ত জ্ঞানের ভাণ্ডার থেকে কিছু অংশ দান করে তিনি বান্দাগণের মধ্যে বণ্টন করে দিয়েছেন। মানুষকে কল্যাণের পথে পরিচালনার জন্য তিনি কুরআন নাযিল করেছেন তাদের বোধগম্য ও সহজবোধ্য ভাষায়। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা অনুধাবন করে না। ফলে তারা শয়তানের কুহকে পড়ে প্রবৃত্তির তাড়নায় চালিত হয়। যারা পাঠ করে, তারা বুঝে না। আবার যারা শিখে, তারা অনুধাবন করে না। অনেকে উল্টা বুঝে মানুষকে বিভ্রান্ত করে। ফলে নিজেরা বঞ্চিত হয়। অন্যকেও বঞ্চিত করে।

কুরআন অনুধাবনের মূলনীতি :

কুরআন অনুধাবনের প্রধান মূলনীতি হ'ল, কুরআনের যিনি বাহক, তাঁর বুঝ অনুযায়ী কুরআন অনুধাবন করা। অতঃপর তিনি যাদের কাছে কুরআন ব্যাখ্যা করেছেন, সেই ছাহাবীগণের বুঝ অনুযায়ী অনুধাবন করা। এর বাইরে ব্যাখ্যা দিতে গেলে পথভ্রষ্ট হবার সম্ভাবনা থেকে যাবে। যেমন জনৈক মুফতী কুরআনের ৮টি আয়াত দিয়ে মীলাদ অনুষ্ঠানের প্রমাণ দিয়েছেন। অথচ মীলাদের আবিষ্কারই হয়েছে রাসূল (ছাঃ)-এর মৃত্যুর বহু পরে ৬০৫ অথবা ৬২৫ হিজরীতে।

কুরআন অনুধাবনের গুরুত্ব :

কুরআন নাযিলের মূল উদ্দেশ্যই হ'ল তাকে বুঝা, অনুধাবন করা ও সে অনুযায়ী কাজ করা। শুধুমাত্র পাঠ করা ও মুখস্ত করা নয়। যদিও তাতে রয়েছে অশেষ নেকী। কসাই বলে খ্যাত ইরাকের শাসক হাজ্জাজ বিন ইউসুফ (৪০-৯৫ হি./৬৬১-৭১৪ খৃ.) প্রতি রাতে সিকি কুরআন অর্থাৎ চারদিনে কুরআন খতম করতেন এবং তাঁর উদ্যোগেই প্রথম কুরআনে নুকতা ও হরকত দেওয়া হয়'।[১] অথচ আলেমদের উপর নির্যাতনের জন্য ইতিহাসে তিনি কুখ্যাত। সেকারণ হাসান বাছরী (২১-১১০ হি./৬৪২-৭২৮ খৃ.) বলেন, আল্লাহ্‌র কসম! কুরআন অনুধাবনের অর্থ কেবল এর হরফগুলি হেফয করা এবং এর হুদূদ বা সীমারেখাগুলি বিনষ্ট করা নয়। যাতে একজন বলবে যে, সমস্ত কুরআন শেষ করেছি। অথচ তার চরিত্রে ও কর্মে কুরআন নেই'।[২] তিনি বলতেন, কুরআন নাযিল হয়েছে তা বুঝার জন্য ও সে অনুযায়ী আমল করার জন্য। অতএব তোমরা তার তেলাওয়াতকে আমলে পরিণত কর'।[৩]

জ্যেষ্ঠ তাবেঈ মুহাম্মাদ বিন কা'ব আল-কুরাযী বলেন, ফজর পর্যন্ত পুরা রাতে সূরা যিলযাল ও ক্বারে'আহ পাঠ করা এবং তার বেশী পাঠ না করা আমার নিকটে অধিক প্রিয়, সারা রাত্রি কুরআন তেলাওয়াতের চাইতে'।[৪] এর দ্বারা তিনি কুরআন অনুধাবনের গুরুত্ব বুঝিয়েছেন।

ইবনু জারীর ত্বাবারী (২২৪-৩১০ হি./৮৩৯-৯২৩ খৃ.) বলেন, কুরআন অনুধাবন অর্থ আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের প্রমাণসমূহ অনুধাবন করা, তাঁর বিধান সমূহ জানা, তাঁর উপদেশ সমূহ গ্রহণ করা ও সে অনুযায়ী আমল করা'।[৫]

সৈয়ূতী (৮৪৯-৯১১ হি./১৪৪৫-১৫০৫ খৃ.) বলেন, কুরআন অনুধাবন করাটাই হ'ল মূল উদ্দেশ্য। কেননা কুরআনই হবে কর্মপদ্ধতি ও আচরণে পথ প্রদর্শক। এর মাধ্যমেই মানুষ দুনিয়া ও আখেরাতে সর্বোচ্চ স্থান লাভ করবে'।[৬]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِنَّ اللهَ يَرْفَعُ بِهَذَا الْكِتَابِ أَقْوَامًا وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ- 'নিশ্চয়ই আল্লাহ এই কিতাবের মাধ্যমে বহু সম্প্রদায়কে উঁচু করেন ও অনেককে নীচু করেন'।[৭] কুরআনের অনুধাবনকারী ও আমলকারীদের পরকালীন উচ্চ মর্যাদা সম্পর্কে নাউওয়াস বিন সাম'আন (রাঃ) বলেন, 'আমি

১. *তাফসীর কুরতুবী, ভূমিকা অংশ ১/১০১।*
২. *ইবনু কাছীর, তাফসীর সূরা ছোয়াদ ২৯ আয়াত।*
৩. *ইবনুল ক্বাইয়িম, মাদারিজুস সালিকীন (বৈরূত : তাহকীক সহ দারুল কিতাবিল 'আরাবী, ৩য় সংস্করণ ১৪১৬ হি./১৯৯৬ খৃ.) ১/৪৫০।*
৪. *আব্দুল্লাহ বিন মুবারক, আয-যুহদ (বৈরূত : দারুল কিতাবিল ইলমিয়াহ, তাহকীক : হাবীবুর রহমান আ'যামী, তাবি) ক্রমিক ২৮৭, পৃ. ৯৭।*
৫. *ইবনু জারীর, তাফসীর ত্বাবারী সূরা ছোয়াদ ২৯ আয়াত।*
৬. *সৈয়ূত্বী, আল-ইতক্বান (মিসর : আল-হাইআতুল মিছরিইয়াহ, ১৩৯৪/১৯৭৪) ১/৩৬৮।*
৭. *মুসলিম হা/৮১৭; মিশকাত হা/২১১৫।*

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, ক্বিয়ামতের দিন কুরআন ও তার বাহককে আনা হবে। যারা তার উপর আমল করেছিল। যাদের সম্মুখে থাকবে সূরা বাক্বারাহ ও আলে ইমরান। সে দু'টি হবে মেঘমালা সদৃশ। যার মধ্যে থাকবে চমক'।[৮]

কুরআন অনুধাবনের প্রয়োজনীয়তা :

(১) আল্লাহ্র আদেশ-নিষেধ অবগত হওয়া ও সে অনুযায়ী আমল করা। এটিই হ'ল প্রধান বিষয়। ইহূদী আলেমরা তাওরাত পড়ত ও তার বিপরীত আমল করত। এমনকি তারা শাব্দিক পরিবর্তন ঘটাতো। নাছারাগণ একই নীতির অনুসারী ছিল। ফলে উভয় উম্মত মাগযূব (অভিশপ্ত) ও যাল্লীন (পথভ্রষ্ট) হয়ে গেছে। মুসলিম উম্মাহ্র আলেমরাও যেন সে পথে না যায়। সেজন্য সতর্ক করে আল্লাহ আহলে কিতাবদের অবস্থা বর্ণনা করে বলেন, وَإِذْ أَخَذَ اللهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلاَ تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلاً فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ– 'আর আল্লাহ যখন আহলে কিতাবদের নিকট থেকে অঙ্গীকার নিলেন যে, তোমরা অবশ্যই (শেষনবী মুহাম্মাদের আগমন ও তার উপর ঈমান আনার বিষয়টি) লোকদের নিকট বর্ণনা করবে এবং তা গোপন করবে না। অতঃপর তারা তা পশ্চাতে নিক্ষেপ করল এবং গোপন করার বিনিময়ে তা স্বল্পমূল্যে বিক্রয় করল। কতই না নিকৃষ্ট তাদের ক্রয়-বিক্রয়' *(আলে ইমরান ৩/১৮৭)*।

(২) ঈমান বৃদ্ধি পাওয়া :

কুরআন অনুধাবন করে পাঠ করলে পাঠকের ঈমান বৃদ্ধি পায়। প্রতিটি আয়াত ও সূরা তার মনের মধ্যে গভীরভাবে রেখাপাত করে। কারণ এসময় তার চোখ-কান-হৃদয় সবকিছু কুরআনের মধ্যে ডুবে থাকে। এদিকে ইঙ্গিত করেই আল্লাহ বলেন, وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ– 'আর যখন কোন সূরা নাযিল হয়, তখন তাদের মধ্যেকার কিছু (মুশরিক) লোক বলে, এই সূরা তোমাদের মধ্যে কার ঈমান বৃদ্ধি করল? বস্তুতঃ যারা ঈমান এনেছে, এ সূরা তাদের ঈমান বৃদ্ধি করেছে এবং তারা আনন্দ লাভ করেছে' *(তওবাহ ৯/১২৪)*। তিনি আরও বলেন, إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ– 'নিশ্চয়ই মুমিন তারাই, যখন তাদের নিকট আল্লাহকে স্মরণ করা হয়, তখন তাদের অন্তর সমূহ ভয়ে কেঁপে ওঠে। আর যখন তাদের উপর তাঁর আয়াতসমূহ পাঠ করা হয়, তখন তাদের ঈমান বৃদ্ধি পায় এবং তারা তাদের প্রতিপালকের উপর ভরসা করে' *(আনফাল ৮/২)*।

(৩) আল্লাহভীতি অর্জন :

অনুধাবনের সাথে কুরআন পাঠ করার মাধ্যমে হৃদয়-মন শিহরিত হয়। আল্লাহ্র অসীম ক্ষমতা অবহিত হয়ে ভয়ে অন্তর জগত কেঁপে ওঠে। ফলে পাপ চিন্তা দূরীভূত হয় এবং আল্লাহ্র উপর ভরসা করে হৃদয়ে প্রশান্তি লাভ হয়। যেমন আল্লাহ বলেন, اللهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللهِ ذَلِكَ هُدَى اللهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ– 'আল্লাহ সর্বোত্তম বাণী (কুরআন) নাযিল করেছেন যা পরস্পরে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং যা পুনঃ পুনঃ পাঠ করা হয়। এতে তাদের দেহচর্ম ভয়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে, যারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করে। অতঃপর তাদের দেহমন প্রশান্ত হয়ে আল্লাহ্র স্মরণে ঝুঁকে পড়ে। এটি (কুরআন) হ'ল আল্লাহ্র পথনির্দেশ। এর মাধ্যমে তিনি যাকে চান পথ প্রদর্শন করেন। আর যাকে আল্লাহ পথভ্রষ্ট করেন, তাকে পথ দেখানোর কেউ নেই' *(যুমার ৩৯/২৩)*।

অন্যত্র তিনি বলেন, قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا– وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا– وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا– 'তুমি বলে দাও (হে অবিশ্বাসীগণ!), তোমরা কুরআনে বিশ্বাস আনো বা না আনো (এটি নিশ্চিতভাবে সত্য)। যাদেরকে ইতিপূর্বে জ্ঞান দান করা হয়েছে (আহলে কিতাবের সৎ আলেমগণ), যখন তাদের উপর এটি পাঠ করা হয়, তখনই তারা সিজদায় লুটিয়ে পড়ে'। 'আর তারা বলে, মহাপবিত্র আমাদের পালনকর্তা! আমাদের প্রতিপালকের প্রতিশ্রুতি অবশ্যই কার্যকর হয়'। 'আর তারা কাঁদতে কাঁদতে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে এবং তাদের বিনয় আরও বৃদ্ধি পায়' *(ইসরা ১৭/১০৭-০৯)*। ইবনু হাজার (৭৭৩-৮৫২ হি.) বলেন, খুশূ' তথা আল্লাহভীতি অর্জনই কুরআন তেলাওয়াতের মূল উদ্দেশ্য (الْخُشُوعَ الَّذِي هُوَ مَقْصُودُ التِّلَاوَةِ)।[৯]

(৪) সার্বিক হেদায়াত লাভ :

তাৎপর্য অনুধাবনের মাধ্যমে কুরআন পাঠ করলে জীবনের চলার পথে সার্বিক হেদায়াত লাভ করা যায়। ছোট-খাট বিষয়গুলি তখন বড় হয়ে দেখা দেয় না। বরং বৃহত্তর কল্যাণের বিষয় ও সার্বিক মঙ্গলের বিষয়টি তার সামনে প্রতিভাত হয়। ফলে সে পথভ্রষ্ট হওয়া থেকে বেঁচে যায়। এদিকে ইঙ্গিত করে আল্লাহ বলেন, إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي

---

৮. মুসলিম হা/৮০৫; মিশকাত হা/২১২১।

৯. ফাৎহুল বারী হা/৫০৪৮-এর পূর্বে 'তারজী' অনুচ্ছেদ-এর আলোচনা।

Contents

هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَات أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا 'নিশ্চয় এই কুরআন এমন পথের নির্দেশনা দেয় যা সবচাইতে সরল। আর তা সৎকর্মশীল মুমিনদের সুসংবাদ দেয় যে, তাদের জন্য রয়েছে মহা পুরস্কার' *(ইসরা ১৭/৯)*।

(৫) কুরআনের স্বাদ আস্বাদন ও হৃদয়ে প্রশান্তি লাভ :

কুরআনের শব্দালংকার বুঝদার পাঠকের অন্তরে ঝংকার তোলে। এর গভীর তাৎপর্য জ্ঞানজগতকে চমকিত করে। এর বিজ্ঞান ও অতীত ইতিহাস মানুষকে হতবিহ্বল করে। বহু অজানা প্রশ্নের উত্তর পেয়ে হৃদয় প্রশান্ত হয়। এক পর্যায়ে সমর্পিত চিত্ত প্রশান্তিতে ভরে যায়। ইবনু জারীর ত্বাবারী বলেন, আমি বিস্মিত হই ঐ ব্যক্তির জন্য, যে ব্যক্তি কুরআন তেলাওয়াত করে। অথচ এর তাৎপর্য অনুধাবন করে না। সে কিভাবে এর স্বাদ আস্বাদন করবে?[১০]

(৬) আল্লাহ্র কিতাবের জন্য দণ্ডায়মান হওয়া :

কুরআনের তাৎপর্য অনুধাবন করতে পারলে এর হক ও সীমারেখা সমূহ আদায়ে পাঠক দণ্ডায়মান হবে। এর মর্যাদা রক্ষায় উৎসর্গীতপ্রাণ হবে। সর্বাবস্থায় এর প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করবে এদিকে ইঙ্গিত করেই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, «الدِّينُ النَّصِيحَةُ» قُلْنَا لِمَنْ؟ قَالَ : لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ 'দ্বীন হ'ল নছীহত'। আমরা বললাম, কাদের জন্য হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! তিনি বললেন, আল্লাহ্র জন্য, তাঁর কিতাবের জন্য, তাঁর রাসূলের জন্য, মুসলিম নেতৃবৃন্দের জন্য ও সকল মুসলমানের জন্য'।[১১]

এখানে النَّصِيْحَةُ لِكِتَابِهِ 'আল্লাহ্র কিতাবের জন্য নছীহত'-এর তাৎপর্য হ'ল এ বিষয়ে হৃদয়ে পরিচ্ছন্ন ঈমান পোষণ করা যে, আল্লাহ্র কালাম চূড়ান্ত সত্য। এটি কোন মানুষের কালামের সদৃশ নয়। এরূপ কালাম কোন সৃষ্টির পক্ষে সম্ভব নয়। অতঃপর আল্লাহ্র কিতাবের যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করতে হবে ও শ্রদ্ধাবনত চিত্তে তেলাওয়াত করতে হবে। এর 'মুহকাম' বা স্পষ্ট আয়াত সমূহের অর্থ বুঝতে হবে। তার আদেশ-নিষেধের উপরে আমল করতে হবে ও 'মুতাশাবিহ' বা অস্পষ্ট অর্থবোধক আয়াত সমূহের উপরে ঈমান রাখতে হবে যে, এগুলির প্রকৃত তাৎপর্য কেবলমাত্র আল্লাহ জানেন। অমুসলিম বিদ্বানদের অহংকার চূর্ণ করার জন্যই এগুলি নাযিল হয়েছে। কিতাবে বর্ণিত বিজ্ঞানময় আয়াত সমূহে গবেষণা করতে হবে। তা থেকে আলো নিয়ে সমাজ পরিশুদ্ধ করার সাধ্যমত চেষ্টা চালাতে হবে। এই কালামের সর্বোচ্চ মর্যাদা রক্ষার জন্য সর্বদা দণ্ডায়মান থাকতে হবে।

(৭) হালাল-হারাম জানা :

জীবন সংশ্লিষ্ট বহু বৈধ-অবৈধ বিষয় মানুষ জানতে পারবে কুরআন অনুধাবনের মাধ্যমে। যা তার বৈষয়িক জীবনকে সঠিক পথে পরিচালিত করবে এবং শয়তানের ধোঁকা থেকে দূরে থাকতে পারবে। সেকারণ আল্লাহ বলেন, يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلاَ تَتَّبِعُوا خُطُوَات الشَّيْطَان إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ– 'হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামে প্রবেশ কর এবং শয়তানের পদাংক অনুসরণ করো না। নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য দুশমন' *(বাক্বারাহ ২/২০৮)*।

(৮) ভিতর ও বাইরের রোগ সমূহের আরোগ্য :

গভীর অনুধাবনের সাথে কুরআন পাঠের মাধ্যমে ভিতরকার বহু সন্দেহবাদ দূরীভূত হয়। বহু অন্যায় আকাংখা অন্তর্হিত হয়। এদিকে ইঙ্গিত করে আল্লাহ বলেন, يَاأَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ 'হে মানব জাতি! তোমাদের নিকট তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে এসে গেছে উপদেশবাণী (কুরআন) এবং অন্তরের রোগসমূহের নিরাময়কারী এবং বিশ্বাসীদের জন্য পথ প্রদর্শক ও রহমত' *(ইউনুস ১০/৫৭)*। তিনি আরও বলেন, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلاَ يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلاَّ خَسَارًا 'আর আমরা কুরআন নাযিল করি, যা বিশ্বাসীদের জন্য আরোগ্য ও রহমত স্বরূপ। কিন্তু পাপীদের জন্য তা কেবল ক্ষতিই বৃদ্ধি করে' *(ইসরা ১৭/৮২)*।

ইবনু জারীর বলেন, কুরআন মূর্খতা ও পথভ্রষ্টতা থেকে মুক্তি দেয়। মুমিনগণ এর মাধ্যমে অন্ধকারে আলোর পথ খুঁজে পান। অবিশ্বাসীরা নয়। কেননা মুমিনগণ কুরআনের হালাল-হারাম মেনে চলেন। সেজন্য আল্লাহ তাদের জান্নাতে প্রবেশ করান ও আযাব থেকে রক্ষা করেন। আর এটাই হ'ল তাঁর পক্ষ হ'তে রহমত ও অনুগ্রহ'।[১২] যা তিনি তাদেরকে দান করেন। এছাড়া শারঈ ঝাড়-ফুঁক মুমিনের দৈহিক আরোগ্য দান করে থাকে আল্লাহ্র হুকুমে। এটা কেবল তার জন্যই হয়ে থাকে, যিনি কুরআন অনুধাবন করেন ও সে অনুযায়ী আমল করেন। ঐ ব্যক্তির জন্য নয়, যে কেবল ভান করে তেলাওয়াত করে। যার মধ্যে কোন খুশূ-খুযূ ও আনুগত্য নেই। এ কারণেই ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, কুরআন হ'ল আরোগ্য গ্রন্থ। যা আত্মা ও দেহ এবং দুনিয়া ও আখেরাত সবকিছুকে শামিল করে। ঐ ব্যক্তির জন্য যে ব্যক্তি একে পূর্ণ বিশ্বাস ও ভালোবাসার সাথে গ্রহণ করে এবং এর প্রতি অকুণ্ঠ আনুগত্যের শর্ত সমূহ পূরণ করে। এটি আসমান

---

১০. ইবনু জারীর, তাফসীর ত্বাবারী, (বৈরূত : মুআসসাসাতুর রিসালাহ, ১ম সংস্করণ ১৪২০/২০০০) 'ভূমিকা' অধ্যায় ১/১০ পৃ.।

১১. মুসলিম হা/৫৫; মিশকাত হা/৪৯৬৬।

১২. ইবনু জারীর, তাফসীর ত্বাবারী সূরা ইসরা ৮২ আয়াত।

ও যমীনের মালিকের কালাম। যদি এটি পাহাড়ের উপর নাযিল হ'ত, তাহ'লে তা ফেটে চৌচির হয়ে যেত। যমীনের উপর নাযিল হ'লে তা বিদীর্ণ হয়ে যেত। অতএব আত্মার ও দেহের এমন কোন রোগ নেই, কুরআনে যার আরোগ্যের নির্দেশনা নেই'।[১৩]

অনুধাবন ছাড়াই পাঠ করার ক্ষতি :

ঐ ব্যক্তি চিনির বলদের মত কেবল বোঝা বহন করেই জীবন কাটায়। কিন্তু চিনি মিষ্টি না তিতা বুঝতে পারে না। এই স্বভাব ছিল ইহূদী-নাছারাদের। যেমন আল্লাহ বলেন, وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لاَ يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلاَّ أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلاَّ يَظُنُّونَ 'আর তাদের মধ্যে একদল নিরক্ষর ব্যক্তি রয়েছে, যারা আল্লাহ্‌র কিতাবের কিছুই জানে না স্রেফ একটা ধারণা ব্যতীত। আর তারা স্রেফ কল্পনা করে মাত্র' *(বাক্বারাহ ২/৭৮)*। শাওকানী (১১৭২-১২৫০ হি.) বলেন, বলা হয়েছে যে, (أَمَانِيَّ) অর্থ তেলাওয়াত। অর্থাৎ তাদের নিকট আল্লাহ্‌র কিতাবের কোন বুঝ ও অনুধাবন ছিল না, কেবলমাত্র পাঠ করা ব্যতীত'।[১৪] ইবনুল ক্বাইয়িম (৬৯১-৭৫১ হি.) বলেন, অত্র আয়াতে আল্লাহ তাঁর কিতাবের পরিবর্তনকারীদের এবং উম্মীদের নিন্দা করেছেন, যারা পাঠ করা ব্যতীত আর কিছুই জানে না। আর এটাই হ'ল (أَمَانِيَّ) বা কল্পনা'।[১৫] অনুরূপভাবে ক্বিয়ামতের দিন উম্মতের পতনদশার কারণ সম্পর্কে আল্লাহ্‌র প্রশ্নের উত্তরে আমাদের রাসূল (ছাঃ) কৈফিয়ত দিয়ে বলবেন, وَقَالَ الرَّسُولُ يَارَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا 'সেদিন রাসূল বলবেন, হে আমার প্রতিপালক! নিশ্চয়ই আমার উম্মত এই কুরআনকে পরিত্যক্ত গণ্য করেছিল' *(ফুরক্বান ২৫/৩০)*। এর ব্যাখ্যায় হাফেয ইবনু কাছীর (৭০১-৭৭৪ হি.) বলেন, কুরআন পরিত্যাগ করা অর্থ হ'ল এর অনুধাবন ও যথার্থ বুঝ হাছিলের চেষ্টা পরিত্যাগ করা' *(ঐ, তাফসীর)*। ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, কুরআন পরিত্যাগ করার কতগুলি অর্থ হ'তে পারে। তার মধ্যে অন্যতম হ'ল, কথক (আল্লাহ) কি বলতে চান, সেটা অনুধাবন না করা, বুঝার চেষ্টা না করা ও গভীর তত্ত্ব উদঘাটনের প্রচেষ্টা ত্যাগ করা'।[১৬]

কুরআন অনুধাবনের ফযীলত :

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, আল্লাহ্‌র কোন গৃহে একদল লোক যখন সমবেত হয় এজন্য যে, তারা আল্লাহ্‌র কিতাব পাঠ করে ও নিজেদের মধ্যে তার পর্যালোচনা করে, সেখানে কেবলই আল্লাহ্‌র পক্ষ হ'তে বিশেষ রহমত হিসাবে 'সাকীনাহ' (السكينة) অবতীর্ণ হয়। আল্লাহ্‌র রহমত তাদের বেষ্টন করে রাখে ও ফেরেশতারা স্থানটি ভরে ফেলে। আর আল্লাহ তাদের সম্পর্কে তাঁর নিকটবর্তী ফেরেশতাদের সঙ্গে আলোচনা করেন'।[১৭] এখানে 'সাকীনাহ' ও রহমত নাযিলের প্রধান কারণ হ'ল তেলাওয়াত ও অনুধাবন। কিন্তু বর্তমানে আমাদের মধ্যে তেলাওয়াত আছে অনুধাবন নেই। ফলে রহমতও নেই।

কুরআন অনুধাবনে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) :

(ক) হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান (রাঃ) বলেন, তিনি এক রাতে রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে ছালাত আদায় করছিলেন। তখন রাসূল (ছাঃ) থেমে থেমে (مترسّلا) ক্বিরাআত পড়ছিলেন। যখনই কোন তাসবীহ অর্থাৎ আল্লাহ্‌র গুণগানের আয়াত অতিক্রম করতেন, তখন 'সুবহানাল্লাহ' বলতেন। যখন কোন প্রার্থনার আয়াত অতিক্রম করতেন, তখন প্রার্থনা করতেন। যখন আল্লাহ্‌র নিকট পানাহ চাওয়ার আয়াত অতিক্রম করতেন, তখন পানাহ চেয়ে 'আঊযুবিল্লাহ' বলতেন'।[১৮] এটাই ছিল রাসূল (ছাঃ)-এর কুরআন বুঝে পড়া ও তার তাৎপর্য অনুধাবনের নমুনা।

(খ) আবু যার গেফারী (রাঃ) বলেন, এক রাতে রাসূল (ছাঃ) স্রেফ একটি আয়াত দিয়ে তাহাজ্জুদ শেষ করেন। এমতাবস্থায় ফজর হয়ে যায়। সেটি হ'ল, إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ 'যদি আপনি তাদেরকে শাস্তি দেন, তাহ'লে তারা আপনার বান্দা। আর যদি আপনি তাদের ক্ষমা করেন, তাহ'লে আপনি মহাপরাক্রান্ত ও প্রজ্ঞাময়'।[১৯] এতে বুঝা যায়, তাঁর কুরআন অনুধাবন কত গভীর ছিল।

(গ) তরুণ ছাহাবী আব্দুল্লাহ বিন আমর ইবনুল 'আছ (রাঃ) যখন প্রতিদিন এক খতম কুরআন পাঠ করতে চাইলেন, তখন রাসূল (ছাঃ) তাকে তিনদিনের কমে খতম করতে নিষেধ করে বললেন, তিনদিনের কমে খতম করলে সে কিছুই বুঝবে না'।[২০] এতে পরিষ্কার যে, কুরআন বুঝে পড়াটাই উদ্দেশ্য। কেবলমাত্র পাঠ করা নয়।

কুরআন অনুধাবনে ছাহাবায়ে কেরাম :

(১) আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন, আমাদের মধ্যে একজন ছিলেন, যিনি ১০টি আয়াত পাঠ করার পর আর আগে বাড়তেন না। যতক্ষণ না তার মর্ম অনুধাবন করতেন ও সেমতে আমল করতেন।[২১]

---

১৩. যাদুল মা'আদ ৪/৩২৩।
১৪. শাওকানী, তাফসীর ফাৎহুল ক্বাদীর, সূরা বাক্বারাহ ৭৮ আয়াত।
১৫. আছ-ছাওয়াইকুল মুরসালাহ (রিয়াদ : দারুল 'আছেমাহ, ১ম সংস্করণ ১৪০৮/১৯৮৮) ৩/১০৪৯।
১৬. ইবনুল ক্বাইয়িম, আল-ফাওয়ায়েদ (বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, ২য় সংস্করণ ১৩৯৩/১৯৭৩) ৮২ পৃ.।
১৭. মুসলিম হা/২৬৯৯; মিশকাত হা/২০৪।
১৮. মুসলিম হা/৭৭২।
১৯. মায়েদাহ ৫/১১৮; নাসাঈ হা/১০১০।
২০. তিরমিযী হা/২৯৪৯; মিশকাত হা/২২০১।
২১. মুক্বাদ্দামা ইবনু কাছীর; তাফসীর ত্বাবারী হা/৮১, হাদীছ ছহীহ।

Contents

(২) আবু আব্দুর রহমান আব্দুল্লাহ বিন হাবীব আস-সুলামী (মৃ. ৭২ হি.) বলেন, আমাদেরকে যারা কুরআন পাঠ করিয়েছেন তারা বলতেন, তারা রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট থেকে যখন কুরআন পাঠ শিখতেন, তখন ১০টি আয়াত জানলে তারা আর তাঁর পিছে পড়তেন না, যতক্ষণ না ঐ আয়াতগুলির উপর তারা আমল করতেন। এভাবে আমরা কুরআন ও তদনুযায়ী আমল সবই শিখতাম।[২২]

(৩) এদের মধ্যে ছিলেন রাসূল (ছাঃ)-এর চাচাতো ভাই তরুণ ছাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস। আল্লাহ্র রাসূল তাঁর জন্য দো'আ করেছিলেন, اَللَّهُمَّ فَقِّهْهُ فِى الدِّينِ وَعَلِّمْهُ التَّأْوِيلَ 'হে আল্লাহ তুমি তাকে দ্বীনের বুঝ দান কর এবং এর যথার্থ ব্যাখ্যা শিক্ষা দাও'।[২৩] সেকারণে ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন, نِعْمَ تُرْجُمَانُ الْقُرْآنِ بْنُ عَبَّاسٍ 'কুরআনের কতই না সুন্দর ব্যাখ্যাতা ইবনু আব্বাস'! *(হাকেম হা/৬২৯১)*। ইবনু মাসঊদ (রাঃ) মারা গেছেন ৩২ হিজরীতে। তারপরেও ইবনু আব্বাস (রাঃ) ৩৬ বছর বেঁচে ছিলেন এবং ত্বায়েফে মৃত্যুবরণ করেন ৬৮ হিজরীতে। তাহ'লে বাকী জীবনে তিনি কুরআনকে আরও কত সুন্দরভাবেই না অনুধাবন করেছিলেন!

(৪) আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, পিতা ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) ১২ বছরে সূরা বাক্বারাহ শেষ করেন। অতঃপর যেদিন শেষ হয়, সেদিন তিনি কয়েকটি উট নহর করে সবাইকে খাওয়ান'।[২৪] ওমর (রাঃ)-এর ন্যায় একজন মহান ব্যক্তির এই দীর্ঘ সময় লাগার অর্থ সূরাটির গভীর তাৎপর্য অনুধাবনে দীর্ঘ সময় ব্যয় করা।

(৫) আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, জনৈক ব্যক্তি ওমর (রাঃ)-এর দরবারে এল। তখন তিনি তাকে লোকদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। জবাবে লোকটি বলল, হে আমীরুল মুমেনীন! তাদের মধ্যে কেউ কেউ এরূপ এরূপভাবে কুরআন তেলাওয়াত করে। তখন আমি বললাম, এত দ্রুত কুরআন তেলওয়াত করা আমি পসন্দ করি না। তখন ওমর (রাঃ) আমাকে থামালেন। এতে আমি দুঃখিত মনে বাড়ী ফিরে এলাম। অতঃপর তিনি আমার নিকটে এলেন এবং বললেন, ঐ লোকটি যা বলল, তার কোনটা তুমি অপসন্দ করলে? আমি বললাম, ওরা যত দ্রুত কুরআন পড়বে, তত আপোষে ঝগড়া করবে। প্রত্যেকেই নিজেরটাকে সঠিক বলবে। আর যখনই ঝগড়া করবে, তখনই বিরোধে লিপ্ত হবে। অবশেষে নিজেরা লড়াইয়ে রত হবে। তখন ওমর (রাঃ) বললেন, তোমার পিতার জন্য আমার জীবন উৎসর্গীত হৌক। আমি এটা লুকিয়ে রেখেছিলাম। অবশেষে তুমিই সেটা বলে দিলে'।[২৫]

বস্তুতঃ ওমর ও ইবনু আব্বাস (রাঃ) যেটা ধারণা করেছিলেন, পরে সেটাই হয়েছিল। খারেজীরা বের হ'ল। তারা কুরআন পাঠ করত। কিন্তু তা তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করত না। অর্থাৎ তারা কুরআন অনুধাবন করত না এবং এর মর্ম উপলব্ধি করত না। ইতিহাসে এরাই প্রথম চরমপন্থী জঙ্গীদল হিসাবে কুখ্যাত। এরাই হযরত আলী (রাঃ)-কে কাফের আখ্যা দিয়ে হত্যা করে।

(৬) ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, আল্লাহ্র রাসূলের ছাহাবীদের মধ্যে উত্তম ব্যক্তি, যারা এই উম্মতের শীর্ষে অবস্থান করেন, তারা কুরআন হেফয করতেন না একটি সূরা বা অনুরূপ কিছু অংশ ব্যতীত। তারা কুরআনের উপর আমল করার রিযিক লাভ করেছিলেন। কিন্তু এই উম্মতের শেষ দিকের লোকেরা কুরআন তেলাওয়াত করবে। তাদের মধ্যে শিশু, অন্ধ সবাই থাকবে। কিন্তু তারা আমল করার রিযিক পাবে না'।[২৬]

(৭) একই মর্মে আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন, আমাদের জন্য কুরআনের শব্দাবলী মুখস্ত করা খুবই কঠিন। কিন্তু এর উপর আমল করা সহজ। আর আমাদের পরের লোকদের অবস্থা হবে এই যে, তাদের জন্য কুরআন হেফয করা সহজ হবে। কিন্তু তার উপর আমল করা কঠিন হবে।[২৭]

(৮) মু'আয বিন জাবাল (রাঃ) বলেন, তোমরা যতটুকু চাও ইলম অর্জন কর। মনে রেখ, আল্লাহ তোমাদেরকে কোনই পুরস্কার দিবেন না, যতক্ষণ না তোমরা তার উপরে আমল করবে'।[২৮]

কুরআন অনুধাবনের অর্থ :

কুরআন অনুধাবনের অর্থ হ'ল কোন আয়াতের যথাযথ মর্ম নির্ধারণ করা এবং আয়াতের মুখ্য উদ্দেশ্য উপলব্ধি করা এবং সেখান থেকে আহকাম নিশ্চিত করা। এটা মোটেই সহজ নয় এবং এর জন্য রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ শর্তাবলী। সেই সকল শর্ত ও নিয়ম-পদ্ধতি অনুসরণ না করে কেউ কুরআন অনুধাবনের দাবী করতে পারে না। এতদ্ব্যতীত কুরআনে রয়েছে কেবল মৌলিক বিষয়াদির বর্ণনা। অতএব মূল হ'তে শাখা-প্রশাখা বের করার যোগ্যতা থাকতে হবে।

কুরআনের মনগড়া ব্যাখ্যা দানের বিরুদ্ধে সাবধানবাণী :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ قَالَ فِى الْقُرْآنِ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ 'যে ব্যক্তি ইলম ব্যতিরেকে কুরআনের মনগড়া ব্যাখ্যা প্রদান করল, সে যেন জাহান্নামে তার ঠিকানা করে নিল'।[২৯]

---

২২. মুক্বাদ্দামা তাফসীর ইবনু কাছীর, সনদ জাইয়িদ।

২৩. আহমাদ হা/২৩৯৭; হাকেম হা/৬২৮০; ছহীহাহ হা/২৫৮৯। হাদীছের প্রথমাংশটি ছহীহ বুখারীতে রয়েছে (হা/১৪৩)।

২৪. মুক্বাদ্দামা তাফসীর কুরতুবী 'আল্লাহ্র কিতাব শিক্ষা করা ও তা অনুধাবনের পদ্ধতি' অনুচ্ছেদ, ৭৬ পৃ.; যাহাবী, তারীখুল ইসলাম (বৈরূত : দারুল কিতাবিল 'আরাবী, ১ম সংস্করণ ১৪০৭/১৯৮৭) ৩/২৬৭।

২৫. মুছান্নাফ আব্দুর রাযযাক হা/২০৩৬৮; যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ৩/৩৪৮-৪৯।

২৬. মুক্বাদ্দামা তাফসীর কুরতুবী ৭৫-৭৬ পৃ.।

২৭. মুক্বাদ্দামা তাফসীর কুরতুবী ৭৫ পৃ.।

২৮. মুক্বাদ্দামা তাফসীর কুরতুবী ৭৬ পৃ.।

২৯. তিরমিযী হা/২৯৫০; শারহুস সুন্নাহ হা/১১৭; আহমাদ হা/২০৬৯; মিশকাত হা/২৩৪। ইমাম তিরমিযী ও ইমাম বাগাবী হাদীছটিকে

Contents

ছাহেবে মির'আত বলেন, উক্ত হাদীছের অর্থ হ'ল নিজস্ব রায় অনুযায়ী ব্যাখ্যা করা। মরফূ' ও মওকূফ হাদীছ সমূহ থেকে এবং শারঈ বিধান সমূহে ও ভাষা জ্ঞানে অভিজ্ঞ শ্রেষ্ঠ বিদ্বানগণের বক্তব্য সমূহ অনুসন্ধান না করেই নিজের ধারণা মতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা।

শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলভী বলেন, ঐ ব্যক্তির জন্য কুরআনের তাফসীরে প্রবেশ করা হারাম, যে ব্যক্তি কুরআনের ভাষা জানেনা, যে ভাষায় কুরআন নাযিল হয়েছে এবং রাসূল (ছাঃ) ও তাঁর ছাহাবী ও তাবেঈগণ থেকে বর্ণিত ব্যাখ্যা সম্পর্কে অবগত নয়। যে ব্যক্তি কুরআনের সূক্ষ্ম তত্ত্ব ও আয়াত নাযিলের কারণ এবং নাসেখ-মানসূখ সম্পর্কে অবগত নয়'।

হাফেয ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন, (ক) কুরআনের তাফসীরের জন্য সর্বোত্তম পদ্ধতি হ'ল কুরআন দিয়ে কুরআনের ব্যাখ্যা করা। কেননা এক স্থানে আয়াতটি সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণিত হ'লেও, অন্য স্থানে সেটির বিস্তারিত ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। (খ) যদি তুমি এতে ব্যর্থ হও, তাহ'লে সুন্নাহতে এর ব্যাখ্যা তালাশ কর। কেননা এটি কুরআনের ব্যাখ্যা ও তার মর্ম স্পষ্টকারী। আল্লাহ বলেন, 'আমরা তোমার নিকটে নাযিল করেছি কুরআন, যাতে তুমি মানুষকে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করে দাও যা তাদের প্রতি নাযিল করা হয়েছে, যেন তারা চিন্তা-গবেষণা করে' *(নাহল ১৬/৪৪)*। আর সুন্নাহ নিজেই তাঁর উপরে অহি আকারে নাযিল হয়েছে, যেমন তাঁর উপরে কুরআন নাযিল হয়েছে। যদিও তা কুরআনের ন্যায় তেলাওয়াত করা হয় না। অতঃপর যখন আমরা কুরআনে বা সুন্নাহতে কোন তাফসীর না পাব, তখন ছাহাবীগণের বক্তব্যের দিকে প্রত্যাবর্তন করব। কেননা কোন অবস্থায় বা কোন প্রেক্ষিতে আয়াতটি নাযিল হয়েছিল, সে বিষয়ে প্রত্যক্ষদর্শী হওয়ার কারণে তাঁরা উক্ত বিষয়ে অধিক জ্ঞানী ছিলেন। আর এ বিষয়ে তাঁদের ছিল পূর্ণ বুঝ ও সঠিক জ্ঞান ও সঠিক আমল। বিশেষ করে তাঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী ও গুরুজন ব্যক্তিগণ। যেমন চার খলীফা এবং আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ, আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস প্রমুখ বিদ্বানগণ।

অতঃপর যখন তুমি কোন তাফসীর কুরআনে বা সুন্নাহতে বা ছাহাবীগণ থেকে না পাবে, তখন বহু বিদ্বান তাবেঈদের বক্তব্য সমূহের দিকে প্রত্যাবর্তন করেছেন। যেমন মুজাহিদ, আত্বা বিন আবী রাবা, সাঈদ বিন জুবায়ের প্রমুখ তাবেঈগণ। অনেকে বলেছেন, শাখা-প্রশাখাগত বিষয়ে তাবেঈদের বক্তব্য দলীল নয়। তাহ'লে কিভাবে সেটি তাফসীরের ক্ষেত্রে দলীল হবে? অর্থাৎ এটি তাদের বিরোধীদের বক্তব্যের উপরে দলীল হবে না, আর এটাই সঠিক। অতঃপর যখন তারা সবাই একটি ব্যাপারে একমত হবেন, তখন সেটার দলীল হওয়ায় কোন সন্দেহ থাকবে না। কিন্তু যদি তারা মতভেদ করেন, তাহ'লে তাদের একজনের বক্তব্য অন্যজনের উপর দলীল হবে না। যা তাদের পরবর্তীদের উপরেও হবে না। এমতাবস্থায় কুরআনের ভাষা অথবা সুন্নাহ অথবা আরবদের সার্বজনীন ভাষা রীতি অথবা উক্ত বিষয়ে ছাহাবীগণের বক্তব্যের দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। فَأَمَّا تَفْسِيرُ الْقُرْآنِ بِمُجَرَّدِ الرَّأْيِ فَحَرَامٌ 'মোটকথা কুরআনের তাফসীর স্রেফ রায়-এর মাধ্যমে করা হারাম'। এটাই হ'ল ইবনু কাছীরের বক্তব্যের সংক্ষিপ্ত সার।[30]

হযরত আবুবকর ছিদ্দীক (রাঃ) বলতেন, أَيُّ أَرْضٍ تُقِلُّنِي، وَأَيُّ سَمَاءٍ تُظِلُّنِي، إِذَا قُلْتُ فِي الْقُرْآنِ مَا لاَ أَعْلَمُ 'যদি আমি না বুঝে কুরআন সম্পর্কে কিছু বলি, তবে কোন যমীন আমাকে বহন করবে এবং কোন আকাশ আমাকে ছায়া দিবে?' *(তাফসীর ত্বাবারী ১/৭৮)*।

[চলবে]

'হাসান' বলেছেন। তাফসীরে কুরতুবীর মুহাক্কিক আব্দুর রাযযাক আল-মাহদী বলেন, তিরমিযী উক্ত হাদীছকে 'হাসান' বলেছেন, সেটাই যথার্থ। তিনি বলেন, হাদীছের সকল সূত্র বিশ্বস্ত (মুক্বাদ্দামা তাফসীর কুরতুবী হা/৭০, পৃ. ৬৬)। কিন্তু শায়খ আলবানী ও শু'আয়েব আরনাঊত্ব 'যঈফ' বলেছেন। সনদ যঈফ হ'লেও মর্ম ছহীহ।

৩০. *মির'আত হা/২৩৬-এর আলোচনা; মুক্বাদ্দামা তাফসীর ইবনু কাছীর ১/৩৫-৩৬।*

আহলেহাদীছ আন্দোলন কি?

ইহা দুনিয়ার মানুষকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের মর্মমূলে জমায়েত করার জন্য ছাহাবায়ে কেরামের যুগ হ'তে চলে আসা নির্ভেজাল ইসলামী আন্দোলনের নাম।

জান্নাতের পথ

*মূল (উর্দূ) : যুবায়ের আলী যাঈ****

*অনুবাদ : নূরুল ইসলাম*****

১. আমাদের আক্বীদা :

আমরা অন্তর, যবান ও আমল দ্বারা একথার সাক্ষ্য প্রদান করি যে, لا إله إلا الله 'আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই'। আল্লাহই প্রধান বিচারপতি, আইনপ্রণেতা, প্রয়োজন পূরণকারী, বিপদ দূরকারী এবং ফরিয়াদ শ্রবণকারী। প্রকৃতি বা স্বরূপ নির্ধারণ, সাদৃশ্য প্রদান এবং নির্গুণ সাব্যস্ত করা ছাড়াই আমরা আল্লাহ্র গুণাবলীকে মানি। তিনি সাত আসমানের উপরে স্বীয় আরশের উপরে সমুন্নত আছেন। যেমনটা তাঁর জন্য মানানসই। তাঁর জ্ঞান ও ক্ষমতা সৃষ্টিজগতের সবকিছুকে বেষ্টন করে আছে। আমরা অন্তর, যবান ও আমল দ্বারা একথার সাক্ষ্য প্রদান করি যে, محمد رسول الله 'মুহাম্মাদ (ছাঃ) আল্লাহ্র রাসূল'। তিনি সর্বশেষ নবী, সকল সৃষ্টির ইমাম, সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ, সত্য পথপ্রদর্শক এবং তাঁর অনুসরণ আবশ্যক। তাঁর নবুঅত, ইমামত (নেতৃত্ব) ও রিসালাত কিয়ামত পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। তাঁর কথা, কাজ ও স্বীকৃতি সব প্রামাণ্য দলীল। তাঁর প্রকৃত অনুসরণের মধ্যে উভয় জগতের সফলতার নিশ্চয়তা রয়েছে এবং তাঁর নাফারমানীতে উভয় জগতের ব্যর্থতা ও ধ্বংসের নিশ্চয়তা রয়েছে। আল্লাহ আমাদেরকে এখেকে রক্ষা করুন!

আমরা কুরআন ও ছহীহ হাদীছকে দলীল এবং সত্যের মানদণ্ড হিসাবে মানি। কুরআন ও হাদীছ দ্বারা যেহেতু এটা প্রমাণিত আছে যে, মুসলিম উম্মাহ পথভ্রষ্টতার উপরে একত্রিত হ'তে পারে না,[১] সেহেতু আমরা ইজমায়ে উম্মতকেও[২] হুজ্জাত (দলীল) মানি। স্মর্তব্য যে, ছহীহ হাদীছের বিপরীতে ইজমা হয়-ই না। আমরা সকল ছাহাবীকে ন্যায়পরায়ণ এবং আমাদের প্রিয়ভাজন মানি। সব ছাহাবীকে হিযবুল্লাহ (আল্লাহ্র দল) এবং আল্লাহ্র ওলী মনে করি। তাঁদের প্রতি ভালবাসা পোষণ করাকে ঈমানের অঙ্গ মনে করি। যারা তাঁদের সাথে শত্রুতা পোষণ করে, আমরা তাদের সাথে শত্রুতা পোষণ করি। আমরা তাবেঈন, তাবে তাবেঈন এবং মুসলমানদের ইমাম যেমন ইমাম মালেক, শাফেঈ, আহমাদ বিন হাম্বল, আবু হানীফা, বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, তিরমিযী, আবুদাঊদ, ইবনু মাজাহ প্রমুখকে ভালবাসি। যারা তাঁদের সাথে শত্রুতা পোষণ করে, আমরা তাদের সাথে শত্রুতা পোষণ করি।

তাওহীদ, মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর রিসালাত এবং তাকদীরের উপরে আমাদের পূর্ণ বিশ্বাস রয়েছে। আমরা আদম (আঃ) থেকে শুরু করে মুহাম্মাদ (ছাঃ) পর্যন্ত সকল নবী ও রাসূল-এর নবুঅত ও রিসালাতের স্বীকৃতি প্রদান করি। কুরআন মাজীদকে আল্লাহ তা'আলার কালাম (বাণী) মনে করি। কুরআন মাজীদ মাখলূক (সৃষ্ট) নয়। আমরা ঈমানে হ্রাস-বৃদ্ধিরও প্রবক্তা। অর্থাৎ আমাদের দৃষ্টিতে ঈমান বেশী হয় এবং কমও হয়। আমাদের পূর্বসুরি আলেমগণ আহলে সুন্নাতের যে আক্বীদা বর্ণনা করেছেন, তার প্রতি আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে। যেমন ইমাম ইবনু খুযায়মাহ, উছমান বিন সাঈদ আদ-দারেমী, বায়হাকী, ইবনু আবী আছেম, ইবনু মান্দাহ, আবু ইসমাঈল আছ-ছাবূনী, আব্দুল গণী মাকদেসী, ইবনু কুদামা, ইবনু তায়মিয়াহ, ইবনুল ক্বাইয়িম, আজুর্রী, লালকাঈ প্রমুখ। আল্লাহ তাঁদের সকলের প্রতি রহম করুন!

২. আমাদের মূলনীতি :

হাদীছ ছহীহ বা যঈফ হওয়ার ভিত্তি হচ্ছেন মুহাদ্দিছীনে কেরাম। যেই হাদীছের বিশুদ্ধতা বা বর্ণনাকারীর বিশ্বস্ততার ব্যাপারে মুহাদ্দিছগণের ঐকমত্য রয়েছে, সেই হাদীছ নিশ্চিত ও অকাট্যভাবে ছহীহ এবং বর্ণনাকারীও অবশ্যই বিশ্বস্ত। এভাবে যেই হাদীছের দুর্বলতা বা বর্ণনাকারীর ত্রুটির ব্যাপারে মুহাদ্দিছগণের ঐকমত্য রয়েছে, সেই হাদীছ নিশ্চিতভাবে ত্রুটিযুক্ত। যেই হাদীছের বিশুদ্ধতা ও দুর্বলতা এবং বর্ণনাকারীর বিশ্বস্ততা ও ত্রুটির ব্যাপারে মুহাদ্দিছগণের মধ্যে মতভেদ থাকবে (এবং সমন্বয় সাধন সম্ভব হবে না), তখন সর্বদা বিশ্বস্ত, অভিজ্ঞ ও নির্ভরযোগ্য বিশেষজ্ঞ মুহাদ্দিছগণের অধিকাংশের তাহকীক ও সাক্ষ্যকে ছহীহ বলে মেনে নিতে হবে। এ সকল মূলনীতিকে সামনে রেখে এই সংক্ষিপ্ত পুস্তিকায় কিছু মতভেদপূর্ণ মাসআলার ব্যাপারে ছহীহ তাহকীক পেশ করা হল। আল্লাহ তা'আলার কাছে প্রার্থনা তিনি যেন আমাদেরকে মুসলিম ও মুমিন হিসাবে জীবিত রাখেন এবং ইসলাম ও ঈমানের উপরেই মৃত্যু দেন। আমীন!

৩. আহলেহাদীছগণের ফযীলত :

এটা সম্পূর্ণ সঠিক যে, কুরআন মাজীদ উম্মতে মুহাম্মাদীকে মুসলিম উপাধি দিয়েছে। কিন্তু এ বাস্তবতাকেও ভুলে যাওয়া উচিৎ নয় যে, মুসলমানদের একটি বিশেষ দল, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর হাদীছের সাথে যাদের জ্ঞানগত ও আমলগত ভালবাসা ছিল, তারা নিজেদেরকে আহলেহাদীছ উপাধিতে ভূষিত করে আসছেন।[৩] মুসলমানদের জন্য আহলে সুন্নাত, আহলেহাদীছ প্রভৃতি উপাধি অসংখ্য ইমাম থেকে প্রমাণিত। যেমন মুহাম্মাদ বিন সিরীন, ইবনুল মাদীনী, বুখারী, আহমাদ বিন সিনান, ইবনুল মুবারক, তিরমিযী প্রমুখ। কোন একজন নির্ভরযোগ্য ইমাম বা আলেম থেকে এর অস্বীকৃতি বর্ণিত নেই। এজন্য উক্ত উপাধিগুলো সঠিক হওয়ার ব্যাপারে ইজমা রয়েছে। সকল নির্ভরযোগ্য আলেম 'আহলেহাদীছ' ও

** পাকিস্তানের প্রখ্যাত আহলেহাদীছ আলেম ও মুহাক্কিক।*

*** পিএইচ.ডি. গবেষক, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।*

১. *মুস্তাদরাকে হাকেম ১/১১৬, হা/৩৯৯, ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে।*

২. *এখানে উম্মত বলতে ছাহাবায়ে কেরামকে বুঝানো হয়েছে। যেমন ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (১৬৪-২৪১ হিঃ) বলেন, من ادعى الاجماع فهو كاذب 'যে ব্যক্তি (ছাহাবীগণের পরে) ইজমা-এর দাবী করে সে মিথ্যাবাদী' (ইলামুল মুওয়াক্কিঈন ১/২৪)।-অনুবাদক।*

৩. *খাতেমায়ে এখতেলাফ, পৃঃ ১০৭, ১০৮।*

'আছহাবুল হাদীছ'কে সাহায্যপ্রাপ্ত দলের হাদীছের হকদার বলে আখ্যা দিয়েছেন।[৪]

জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِى يُقَاتِلُوْنَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِيْنَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ– 'আমার উম্মতের একটি দল ক্বিয়ামত পর্যন্ত সর্বদা হক-এর উপর লড়াই করবে বিজয়ী অবস্থায়'।[৫]

এই হাদীছ সম্পর্কে আমীরুল মুমিনীন ফিল হাদীছ ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেছেন, يعني أهل الحديث অর্থাৎ এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল আহলেহাদীছ।[৬]

আছহাবুল হাদীছ ও আহলেহাদীছ দু'টিই একই জামা'আতের বৈশিষ্ট্যগত নাম। ইমাম আহমাদ বিন সিনান আল-ওয়াসেতী (মৃঃ ২৫৯ হিঃ) বলেছেন, لَيْسَ فِي الدُّنْيَا مُبْتَدِعٌ إِلاَّ وَهُوَ يَبْغَضُ أَهْلَ الْحَدِيْثِ، وَإِذَا ابْتَدَعَ الرَّجُلُ نُزِعَ حَلاَوَةُ الْحَدِيْثِ مِنْ قَلْبِه– 'দুনিয়াতে এমন কোন বিদ'আতী নেই, যে আহলেহাদীছদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে না। যখন কোন ব্যক্তি বিদ'আত করে, তখন তার অন্তর থেকে হাদীছের স্বাদ ছিনিয়ে নেওয়া হয়'।[৭]

আহলেহাদীছ ও আহলে আছারদের মর্যাদার জন্য খতীব বাগদাদীর শারফু আছহাবিল হাদীছ, যাহাবীর তাযকিরাতুল হুফফায এবং আব্দুল হাই লাক্ষ্ণৌভীর ইমামুল কালাম (পৃঃ ২১৬) প্রভৃতি অধ্যয়ন করুন।

৪. মুহাদ্দিছগণের মাসলাক :

জনৈক ব্যক্তি শায়খুল ইসলাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ)-কে জিজ্ঞাসা করেন যে, বুখারী, মুসলিম, আবুদাঊদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ, আবুদাঊদ তায়ালেসী, দারেমী, বাযযার, দারাকুৎনী, বায়হাকী, ইবনু খুযায়মাহ, আবু ইয়া'লা মুছেলী (রহঃ) মুজতাহিদগণের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, না কোন ইমামের মুক্বাল্লিদ ছিলেন? তিনি আল-হামদু লিল্লাহি রব্বিল আলামীন বলে উত্তর দেন, أَمَّا الْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ فَإِمَامَانِ فِي الْفِقْهِ مِنْ أَهْلِ الْاِجْتِهَاد. وَأَمَّا مُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَه وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَأَبُو يَعْلَى وَالْبَزَّارُ وَنَحْوُهُمْ فَهُمْ عَلَى مَذْهَبِ أَهْلِ الْحَدِيث. لَيْسُوا مُقَلِّدِينَ لِوَاحِد بِعَيْنِه مِنَ الْعُلَمَاءِ ... وَهَؤُلَاءِ كُلُّهُمْ يُعَظِّمُوْنَ السُّنَّةَ وَالْحَدِيْث– 'ইমাম বুখারী ও আবুদাঊদ দু'জনেই ফিক্বহের ইমাম ও মুজতাহিদ (মুত্বলাক্ব)। পক্ষান্তরে ইমাম মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ, ইবনু খুযায়মাহ, আবু ই'য়ালা, বাযযার প্রমুখ আহলেহাদীছ মাযহাবের উপরে ছিলেন। তারা কোন নির্দিষ্ট আলেমের মুক্বাল্লিদ ছিলেন না।... এঁরা সবাই সুন্নাহ ও হাদীছকে সম্মান করতেন'।[৮]

ইমাম বায়হাকী স্বীয় প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'আস-সুনানুল কুবরা'তে (১০/১১৩) তাক্বলীদের বিরুদ্ধে অনুচ্ছেদ রচনা করেছেন। এজন্য মুহাদ্দিছগণের উপর খামাখা মিথ্যারোপ করতে গিয়ে এবং নিজেদের নম্বর বাড়ানোর জন্য তাদেরকে মুক্বাল্লিদদের মধ্যে শামিল করা ভুল। স্মর্তব্য যে, আহলেহাদীছ দ্বারা উদ্দেশ্য মুহাদ্দিছগণ এবং তাদের অনুসারীগণ।[৯] আহলেহাদীছদের এটা অনেক বড় মর্যাদা যে, তাদের ইমামে আ'যম বা বড় ইমাম শুধু নবী (ছাঃ)।[১০]

৫. ছহীহায়েনের মর্যাদা :

এ বিষয়ে উম্মতের ইজমা রয়েছে যে, ছহীহায়েনের (ছহীহ বুখারী ও ছহীহ মুসলিম) সকল মুসনাদ[১১] মুত্তাছিল[১২] মারফূ[১৩] হাদীছ ছহীহ এবং অকাট্যভাবে বিশুদ্ধ।[১৪]

শাহ অলিউল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলভী (রহঃ) বলছেন, أما الصحيحان فقد اتفق المحدثون على أن جميع ما فيهما من المتصل المرفوع صحيح بالقطع، وأنهما متواتران إلى مصنفيهما، وأنه كل من يهون أمرهما فهو مبتدع متبع غير سبيل المؤمنين– 'ছহীহ বুখারী ও ছহীহ মুসলিমের ব্যাপারে সকল মুহাদ্দিছ ঐক্যমত পোষণ করেছেন যে, এ দু'টি গ্রন্থের সকল মুত্তাছিল ও মারফূ হাদীছ অকাট্যভাবে ছহীহ। এই গ্রন্থ দু'টি তাদের সংকলকদ্বয় পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে পৌঁছেছে। যে ব্যক্তি এ দু'টোকে সম্মান করবে না সে বিদ'আতী এবং মুমিনদের পথ ব্যতীত অন্য পথের অনুসারী'।[১৫]

---

৪. *তিরমিযী ৪/৫০৫, বৈরূত ছাপা, হা/২২২৯।*
৫. *মুসলিম হা/১৯২৩; মিশকাত হা/৫৫০৭ 'ফিৎনা সমূহ' অধ্যায়, 'ঈসার অবতরণ' অনুচ্ছেদ; খতীব বাগদাদী, মাসআলাতুল ইহতিজাজ বিশ-শাফিঈ, পৃঃ ৩৪, সনদ হাসান।*
৬. *মাসআলাতুল ইহতিজাজ বিশ-শাফেঈ, পৃঃ ৩৫, সনদ ছহীহ।*
৭. *হাকেম, মা'রিফাতু উলূমিল হাদীছ, পৃঃ ৪, সনদ ছহীহ।*
৮. *ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ' ফাতাওয়া ২০/৪০।*
৯. *ঐ ৪/৯৫।*
১০. *তাফসীর ইবনে কাছীর ৩/৫২, বণী ইসরাঈল ৭১ আয়াতের ব্যাখ্যা দ্র.। আরো দেখুন : ঐ ১/৩৭৮, আলে ইমরান ৮১ ও ৮২ নং আয়াতের ব্যাখ্যা।*
১১. *যে মারফূ বর্ণনার সনদ নবী (ছাঃ) পর্যন্ত মুত্তাছিল (অবিচ্ছিন্ন) তাকে মুসনাদ বলে (দ্র. ড. মাহমূদ আত-তহহান, তায়সীরু মুছত্বলাহিল হাদীছ (রিয়াদ : মাকতাবাতুল মা'আরিফ, ৯ম সংস্করণ, ১৪১৭ হি./১৯৯৬ খৃ.), পৃ. ১৩৫)। -অনুবাদক।*
১২. *যে বর্ণনার সনদ মুত্তাছিল চাই তা মারফূ হোক বা মাওকূফ, তাকে মুত্তাছিল বলে (দ্র. ঐ, পৃ. ১৩৬)। -অনুবাদক।*
১৩. *যে বর্ণনায় রাসূল (ছাঃ)-এর কথা, কর্ম, সমর্থন বা গুণ বর্ণিত হয়েছে তাকে মারফূ বলে (দ্র. ঐ, পৃ. ১২৮-২৯)। -অনুবাদক।*
১৪. *মুকাদ্দামা ইবনুছ ছালাহ, পৃঃ ৪১; ইবনু কাছীর, ইখতিছারু উলূমিল হাদীছ, পৃঃ ৩৫।*
১৫. *হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ, পৃঃ ২৪২।*

৬. তাক্বলীদ :

নবী নন এমন ব্যক্তির কথা বিনা দলীলে মানাকে তাক্বলীদ বলে।[১৬] এই সংজ্ঞার ব্যাপারে মুসলিম উম্মাহ্র ইজমা রয়েছে।[১৭] 'আল-ক্বামূসুল ওয়াহীদ' অভিধানে তাক্বলীদের নিম্নোক্ত অর্থ লিপিবদ্ধ রয়েছে- 'চিন্তা-ভাবনা না করে বা বিনা দলীলে অনুসরণ, অনুকরণ ও সোপর্দ করা। বিনা দলীলে অনুসরণ, চোখ বন্ধ করে কারো পিছে চলা, কারো অনুকরণ করা। যেমন- قَلَّدَ الْقِرْدُ الْإِنْسَانَ 'বানরটি লোকটির অনুকরণ করল'।[১৮]

জনাব মুফতী আহমাদ ইয়ার নাঈমী বাদায়ূনী ব্রেলভী ইমাম গাযালী থেকে উদ্ধৃত করেছেন যে, اَلتَّقْلِيْدُ هُوَ قَبُوْلُ قَوْلٍ بِلاَ حُجَّةٍ 'বিনা দলীলে কারো কোন কথা মেনে নেওয়াই হল তাক্বলীদ'।[১৯]

আশরাফ আলী থানবী দেওবন্দীকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, 'তাক্বলীদের স্বরূপ কি এবং তাক্বলীদ কাকে বলে'? তিনি জবাবে বলেন, 'বিনা দলীলে উম্মতের কারো কথা মেনে নেওয়াকে তাক্বলীদ বলে'। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হল, 'আল্লাহ ও রাসূল (ছাঃ)-এর কথা মান্য করাকেও কি তাক্বলীদ বলা হবে'? তিনি বলেন, 'আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর হুকুম মানাকে তাক্বলীদ বলা হবে না। সেটাকে ইত্তেবা (অনুসরণ) বলা হয়'।[২০] স্মর্তব্য যে, উছূলে ফিক্বহে লিখিত আছে যে, কুরআন মানা, রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছ মানা, ইজমা মানা, সাক্ষীদের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে বিচার-ফায়ছালা করা, সাধারণ মানুষের আলেমদের নিকট প্রত্যাবর্তন করা (এবং মাসআলা জিজ্ঞাসা করে আমল করা) তাক্বলীদ নয়।[২১]

মুহাম্মাদ ওবায়দুল্লাহ আস'আদী দেওবন্দী তাক্বলীদের পারিভাষিক অর্থ সম্পর্কে লিখেছেন যে, 'বিনা দলীলে কারো কথা মেনে নেওয়া। তাক্বলীদের প্রকৃত স্বরূপ এটাই। কিন্তু ...।[২২] প্রকৃত স্বরূপকে বাদ দিয়ে তথাকথিত দেওবন্দী ফকীহদের অপব্যাখ্যা কে শোনে।

আহমাদ ইয়ার নাঈমী ছাহেব লিখছেন যে, 'এই সংজ্ঞা থেকে জানা গেল যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর অনুসরণ করাকে তাক্বলীদ বলতে পারি না। কেননা তাঁর প্রত্যেকটি কথা ও কাজ শারঈ দলীল। তাক্বলীদে শারঈ দলীলকে না দেখার প্রবণতা থাকে। এজন্য আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর 'উম্মাতী' বলব, মুক্বাল্লিদ নয়। অনুরূপভাবে সাধারণ মুসলমানরা আলেমের অনুসরণ যেটা করে থাকে তাকেও তাক্বলীদ বলা যাবে না। কেননা কেউই ঐ আলেমদের কথা বা তাদের কাজকে নিজের জন্য হুজ্জাত (দলীল) বানায় না'।[২৩]

যে সম্পর্কে জানা নেই আল্লাহ সে কথার অনুসরণ করতে নিষেধ করেছেন *(বণী ইসরাঈল ১৭/৩৬)*। অর্থাৎ দলীলবিহীন কথার অনুসরণ নিষিদ্ধ। যেহেতু আল্লাহ ও রাসূল (ছাঃ)-এর কথা স্বয়ং দলীল এবং ইজমার হুজ্জাত হওয়ার ব্যাপারে দলীল কায়েম রয়েছে, সেজন্য কুরআন, হাদীছ ও ইজমাকে মানা তাক্বলীদ নয়।[২৪] আল্লাহ এবং রাসূল (ছাঃ)-এর বিপরীতে যেকোন ব্যক্তির তাক্বলীদ করা রিসালাতে শিরক (شرك فى الرسالة)। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দ্বীনের মধ্যে রায়ের আলোকে ফৎওয়া দেয়ার নিন্দা করেছেন।[২৫] ওমর (রাঃ) আহলুর রায়কে রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাতের দুশমন আখ্যা দিয়েছেন (أَصْبَحَ أَهْلُ الرَّأْيِ أَعْدَاءَ السُّنَنِ)।[২৬] ইমাম ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেছেন যে, এই আছার সমূহের সনদ অত্যন্ত বিশুদ্ধ।[২৭]

মু'আয বিন জাবাল (রাঃ) বলেছেন, وَأَمَّا زَلَّةُ عَالِمٍ، فَإِنِ اهْتَدَى فَلاَ تُقَلِّدُوْهُ دِيْنَكُمْ 'আলেমের ভুলের ব্যাপারে বক্তব্য হ'ল, যদি তিনি হেদায়াতের উপরেও থাকেন, তবুও তোমাদের দ্বীনের ব্যাপারে তার তাক্বলীদ করো না'।[২৮] উক্ত বর্ণনা সম্পর্কে ইমাম দারাকুৎনী বলেছেন, والموقوف هو الصحيح 'আর (এটি) মাওকূফ (বর্ণনা) হওয়াই ছহীহ'।[২৯]

আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাঃ)ও তাক্বলীদ থেকে নিষেধ করেছেন।[৩০] চার ইমামও (ইমাম মালেক, আবূ হানীফা, শাফেঈ ও আহমাদ বিন হাম্বল) তাদের নিজেদের এবং অন্যদের তাক্বলীদ করতে নিষেধ করেছেন।[৩১] কোন ইমাম থেকেও এ কথা অকাট্যভাবে প্রমাণিত নেই যে, তিনি বলেছেন 'আমার তাক্বলীদ করো'। এর বিপরীতে একথা প্রমাণিত রয়েছে যে, চার মাযহাবের তাক্বলীদের বিদ'আত হিজরী চতুর্থ শতকে শুরু হয়েছে।[৩২]

---

১৬. *মুসাল্লামুছ ছুবূত, পৃঃ ২৮৯।*
১৭. *ইবনু হাযম, আল-ইহকাম, পৃঃ ৮৩৬।*
১৮. *আল-ক্বামূসুল ওয়াহীদ, পৃঃ ১৩৪৬। আরো দেখুন : আল-মু'জামুল ওয়াসীত, পৃঃ ৭৫৪।*
১৯. *জাআল হক, ১/১৫, পুরাতন সংস্করণ।*
২০. *আল-ইফাযাতুল ইয়াওমিয়াহ/মালফূযাতে হাকীমুল উম্মাত ৩/১৫৯, বচন নং ২২৮।*
২১. *মুসাল্লামুছ ছুবূত, পৃঃ ২৮৯; আত-তাকরীর ওয়াত তাহবীর ৩/৪৫৩।*
২২. *উছূলুল ফিক্বহ, পৃঃ ২৬৭।*
২৩. *জাআল হক ১/১৬।*
২৪. *ইবনু হুমাম, আত-তাহরীর ৪/২৪১, ২৪২; ফাওয়াতিহুর রাহমূত ২/৪০০।*
২৫. *ছহীহ বুখারী হা/৭৩০৭, ২/১০৮৬।*
২৬. *ই'লামুল মুওয়াক্কিঈন ১/৫৫।*
২৭. *ঐ।*
২৮. *ইমাম অকী', কিতাবুয যুহদ ১/৩০০, হা/৭১, সনদ হাসান; আবুদাঊদ, কিতাবুয যুহদ, পৃঃ ১৭৭, হা/১৯৩; হিলয়াতুল আওলিয়া ৫/৯৭; ইবনু আব্দিল বার্র, জামেউ বায়ানিল ইলম ওয়া ফাযলিহি ২/১৩৬; ইবনু হাযম, আল-ইহকাম ৬/২৩৬; ইবনুল ক্বাইয়িম ই'লামুল মুওয়াক্কিঈন (২/২৩৯) গ্রন্থে একে ছহীহ বলেছেন।*
২৯. *আল-ইলালুল ওয়ারিদাহ ৬/৮১, প্রশ্ন নং ৯৯২।*
৩০. *আস-সুনানুল কুবরা ২/১০, হা/২০৭০, সনদ ছহীহ।*
৩১. *মাজমূ' ফাতাওয়া ২/১০, ২১১; ই'লামুল মুওয়াক্কিঈন ২/১৯০, ২০০, ২০৭, ২১১, ২২৮।*
৩২. *ই'লামুল মুওয়াক্কিঈন ২/২০৮।*

এ ব্যাপারে মুসলমানদের ইজমা রয়েছে যে, মূর্খতার অপর নাম তাক্বলীদ এবং মুক্বাল্লিদ জাহেল (মূর্খ) হয়ে থাকে।[৩৩] ইমামগণ তাক্বলীদের খণ্ডনে বই-পুস্তক লিখেছেন। যেমন ইমাম আবু মুহাম্মাদ কাসেম বিন মুহাম্মাদ আল-কুরতুবীর (মৃঃ ২৭৬ হিঃ) 'আল-ঈযাহ ফির-রাদ্দি আলাল মুক্বাল্লিদীন' (الإيضاح في الرد على المقلدين) গ্রন্থটি।[৩৪] পক্ষান্তরে কোন একজন নির্ভরযোগ্য ইমাম থেকে এটা অকাট্যভাবে প্রমাণিত নেই যে, তিনি তাক্বলীদের আবশ্যকতা বা বৈধতার ব্যাপারে কোন গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করেছেন। মুক্বাল্লিদরা পরস্পরের সাথে রক্তাক্ত যুদ্ধ চালিয়ে যেতে থাকে।[৩৫] একজন আরেকজনকে কাফের আখ্যা দিতে থাকে।[৩৬] তারা বায়তুল্লাহতে চার মুছাল্লা কায়েম করে মুসলিম উম্মাহকে চার ভাগে বিভক্ত করেছে। চার আযান, চার ইকামত এবং চার ইমামত! যেহেতু প্রত্যেক মুক্বাল্লিদ নিজ ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে নিজ ইমাম ও অনুসরণীয় ব্যক্তির সাথে বন্ধনযুক্ত রয়েছে, সেজন্য তাক্বলীদের কারণে মুসলিম উম্মাহ্র মাঝে কখনো ঐক্য ও শান্তি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। তাই আসুন! আমরা সবাই ঐক্যবদ্ধভাবে কুরআন ও সুন্নাহ্র রজ্জুকে আঁকড়ে ধরি। কুরআন ও সুন্নাহ্র মধ্যেই দোজাহানের সফলতার পূর্ণ নিশ্চয়তা রয়েছে।

৭. ছালাত :

আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে,

لَمَّا بَعَثَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مُعَاذًا نَحْوَ الْيَمَنِ قَالَ لَهُ إِنَّكَ تَقْدَمُ عَلَى قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَى أَنْ يُوَحِّدُوا اللهَ تَعَالَى فَإِذَا عَرَفُوا ذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ، فَإِذَا صَلُّوا...

'নবী করীম (ছাঃ) যখন মু'আয বিন জাবাল (রাঃ)-কে ইয়েমেনে প্রেরণ করেন তখন তাকে বলেন, তুমি আহলে কিতাব সম্প্রদায়ের নিকট যাচ্ছ। সুতরাং তাদেরকে সর্বপ্রথম তাওহীদের দাওয়াত দিবে। যখন তারা তাওহীদের পরিচয় লাভ করবে তখন তাদেরকে বলবে যে, আল্লাহ দিনে-রাতে তাদের উপরে পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত ফরয করেছেন। যখন তারা ছালাত আদায় করতে শুরু করবে...'।[৩৭]

ফরয ও নফল ছালাতের সংখ্যা, রাক'আত এবং সমস্ত বিস্তারিত বিবরণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বর্ণনা করে দিয়েছেন এবং স্বীয় উম্মতকে হুকুম দিয়েছেন যে, صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِى أُصَلِّى 'তোমরা যেভাবে আমাকে ছালাত আদায় করতে দেখেছ, সেভাবে ছালাত আদায় করো'।[৩৮]

ছাহাবীগণ নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট থেকে ছালাতের পদ্ধতি শিখেছেন। তাঁরা সেই বরকতময় পদ্ধতিকে হাদীছ রূপে মানুষের নিকট পৌঁছিয়েছেন। এজন্য প্রমাণিত হল যে, মুসলিম উম্মাহ হাদীছসমূহ থেকে ছালাতের পদ্ধতি শিখেছে। উম্মতের যে ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর ছালাতের পদ্ধতি ঐ হাদীছ সমূহের বিপরীত যেমন মালেকীদের হাত ছেড়ে দিয়ে ছালাত আদায় প্রভৃতি, তাদের উচিত হ'ল ছহীহ হাদীছ সমূহের আলোকে নিজেদের ছালাতকে সংশোধন করে নেয়া।

৮. ছালাতের ওয়াক্ত সমূহ[৩৯] :

(ছালাতের ওয়াক্ত সমূহের ব্যাপারে) হাদীছে জিব্রীলে আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে সূর্য ঢলে যাওয়ার পরে যোহরের ছালাত পড়ান। অতঃপর বস্তুর ছায়া একগুণ হলে আছর পড়ান... এবং দ্বিতীয় দিন বস্তুর ছায়া একগুণ হলে যোহর এবং দুইগুণ হলে আছরের ছালাত পড়ান। গতকালের মতো সূর্যাস্তের পর মাগরিব পড়ান এবং বলেন যে, يَا مُحَمَّدُ هَذَا وَقْتُ الأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِكَ. وَالْوَقْتُ فِيمَا بَيْنَ هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ– 'হে মুহাম্মাদ (ছাঃ)! এটাই হল আপনার পূর্ববর্তী নবীগণের ছালাতের ওয়াক্ত। আর ছালাতের সময় এই দুই সময়ের মধ্যবর্তী'। এ হাদীছটিকে ইমাম তিরমিযী (হা/১৪৯) প্রমুখ বর্ণনা করেছেন এবং এর সনদ হাসান।[৪০] এ জাতীয় হাদীছ সমূহ জাবের (রাঃ) প্রমুখ থেকেও উত্তম সনদ সমূহে বর্ণিত আছে। নিমবী হানাফী বলছেন, 'আমি কোন সুস্পষ্ট ছহীহ বা যঈফ হাদীছ পাইনি, যা একথার প্রতি নির্দেশ করে যে, বস্তুর ছায়া দ্বিগুণ হওয়া পর্যন্ত যোহরের ওয়াক্ত'।[৪১]

স্মর্তব্য যে, কিছু দেওবন্দী ও ব্রেলভী এ বিষয়ে অস্পষ্ট সন্দেহ পেশ করে থাকেন। অথচ উছূলে ফিক্বহে এ স্বতঃসিদ্ধ নিয়ম রয়েছে যে, মানতূক[৪২] (منطوق) মাফহূম[৪৩] (مفهوم)-এর উপর প্রাধান্য লাভ করে।[৪৪]

---

৩৩. *জামেউ বায়ানিল ইলম ২/১১৭; ই'লামুল মুওয়াক্কিঈন ২/১৮৮, ১/৭।*
৩৪. *যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ১৩/৩২৯।*
৩৫. *মু'জামুল বুলদান ১/২০৯, ৩/১১৭; ইবনুল আছীর, আল-কামিল ৮/৩০৭, ৩০৮; অফায়াতুল আ'য়ান ৩/২০৮।*
৩৬. *যাহাবী, মীযানুল ই'তিদাল ৪/৫২; আল-ফাওয়াইদুল বাহিয়াহ, পৃঃ ১৫২, ১৫৩।*
৩৭. *ছহীহ বুখারী ১/১৯৬, হা/১৪৫৮, ২/১০৯৬, হা/৭৩৭২; মুসলিম ১/৩৬, হা/১৯ শব্দ বুখারীর।*
৩৮. *ছহীহ বুখারী ১/৮৮, হা/৬৩১, ২/৮৮৮, হা/৬০০৮, ২/১০৭৬, হা/৭২৪৬।*
৩৯. *ছালাতের ওয়াক্ত সমূহের ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা দেখুন : মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), ৪র্থ সংস্করণ, ২০১১, পৃ. ৫৩-৫৫। -অনুবাদক।*
৪০. *নিমবী হানাফী, আছারুস সুনান, পৃঃ ১২২, হা/১৯৪। তিনি বলেন,* إسناده حسن *'এর সনদ হাসান'।*
৪১. *আছারুস সুনান (উর্দূ অনুবাদ), পৃঃ ১৬৮, হা/১৯৯।*
৪২. *শব্দ উচ্চারণ করা মাত্রই যদি তার মর্ম বুঝা যায় তাহলে তাকে মানতূক বলে। -অনুবাদক।*
৪৩. *শব্দ উচ্চারণ করা মাত্রই যদি তার মর্ম বুঝা না যায়, বরং ইঙ্গিতের মাধ্যমে বুঝা যায় তবে তাকে মাফহূম বলে। -অনুবাদক।*
৪৪. *ফাৎহুল বারী ২/২৪২, ২৯৭, ৪৩০, ৪/৩৮২, ৩৮৬, ৯/৩৬৯, ১২/২০৩।*

৯. নিয়তের মাসআলা :

এতে সন্দেহ নেই যে, নিয়তের উপরে আমলের ভিত্তি।[৪৫] কিন্তু মনের সংকল্প ও পরিকল্পনাকে নিয়ত বলা হয়। সংকল্প ও পরিকল্পনার স্থান মন, মুখ নয়।[৪৬] মুখে উচ্চারণ করে নিয়ত করা নাতো নবী (ছাঃ) থেকে প্রমাণিত আছে, না কোন ছাহাবী থেকে আর না কোন তাবেঈ থেকে'...।[৪৭]

১০. মোজার উপরে মাসাহ :

ইমাম আবুদাঊদ আস-সিজিস্তানী (রহঃ) বলছেন,

وَمَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ عَلِىُّ بْنُ أَبِى طَالِبٍ وَابْنُ مَسْعُودٍ وَالْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ وَأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ وَأَبُو أُمَامَةَ وَسَهْلُ بْنُ سَعْدٍ وَعَمْرُو بْنُ حُرَيْثٍ وَرُوِىَ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَابْنِ عَبَّاسٍ. 'আলী বিন আবু ত্বালেব, ইবনু মাসঊদ, বারা ইবনু আযিব, আনাস বিন মালেক, আবু উমামা, সাহল বিন সা'দ, আমর বিন হুরাইছ মোজার উপরে মাসাহ করেছেন। ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব ও ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকেও মোজার উপরে মাসাহ বর্ণিত আছে'।[৪৮]

ছাহাবায়ে কেরামের এই আছারগুলো মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বা (১/১৮৮, ১৮৯), মুছান্নাফ আব্দুর রাযযাক (১/১৯৯, ২০০), ইবনু হাযম-এর মুহাল্লা (২/৮৪), দূলাবীর আল-কুনা (১/১৮১) প্রভৃতি গ্রন্থে সনদসহ মওজুদ রয়েছে। আলী (রাঃ)-এর আছারটি ইবনুল মুনযিরের 'আল-আওসাত' গ্রন্থে (১/৪৬২) ছহীহ সনদে মওজুদ রয়েছে। যেমনটি সামনে আসছে। ইমাম ইবনু কুদামা বলছেন, وَلِأَنَّ الصَّحَابَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ مَسَحُوا عَلَى الْجَوَارِبِ، وَلَمْ يَظْهَرْ لَهُمْ مُخَالِفٌ فِي عَصْرِهِمْ، فَكَانَ إِجْمَاعًا 'যেহেতু ছাহাবীগণ মোজার উপরে মাসাহ করেছেন এবং তাদের যুগে তাদের কোন বিরোধিতাকারী পরিদৃষ্ট হয়নি, সেজন্য এ বিষয়ে ইজমা রয়েছে যে, মোজার উপরে মাসাহ করা সঠিক'।[৪৯] ছাহাবীগণের উক্ত ইজমার সমর্থনে মারফূ বর্ণনাসমূহও মওজুদ রয়েছে।[৫০]

মোজার (خفين) উপরে মাসাহ মুতাওয়াতির হাদীছ সমূহ দ্বারা প্রমাণিত রয়েছে।[৫১] জিরাবও (جراب) মোজার (خف) একটি প্রকার। যেমনটা আনাস (রাঃ), ইবরাহীম নাখঈ, নাফে প্রমুখ থেকে বর্ণিত আছে। যারা মোজার (جراب) উপরে মাসাহকে অস্বীকার করেন, তাদের নিকটে কুরআন, হাদীছ ও ইজমার একটিও সুস্পষ্ট দলীল নেই।

ইমাম ইবনুল মুনযির নায়সাপুরী (রহঃ) বলেছেন,

حدثنا محمد بن عبد الوهاب، ثنا جعفر بن عون، ثنا يزيد بن مردانبة ، ثنا الوليد بن سريع ، عن عمرو بن حريث، قال : رأيت عليا بال، ثم توضأ، ومسح على الجوربين–

মর্মার্থ :

১. আলী (রাঃ) পেশাব করলেন। অতঃপর ওযূ করলেন এবং মোজার উপরে মাসাহ করলেন।[৫২] এর সনদ ছহীহ।

২. আবু উমামা (রাঃ) মোজার উপরে মাসাহ করেছেন।[৫৩] এর সনদ হাসান।

৩. বারা ইবনু আযিব (রাঃ) মোজার উপরে মাসাহ করেছেন।[৫৪] এর সনদ ছহীহ।

৪. উকবা বিন আমর (রাঃ) মোজার উপরে মাসাহ করেছেন।[৫৫] এর সনদ ছহীহ।

৫. সাহল বিন সা'দ (রাঃ) মোজার উপরে মাসাহ করেছেন।[৫৬] এর সনদ হাসান।

ইবনুল মুনযির বলেছেন যে, ইমাম ইসহাক বিন রাহুয়াহ বলেছেন যে, 'এই মাসআলায় ছাহাবীগণের মধ্যে কোন মতভেদ নেই'।[৫৭] ইবনু হাযমও প্রায় এরূপই বলেছেন।[৫৮] ইবনু কুদামা বলেছেন, 'এ ব্যাপারে ছাহাবীগণের ইজমা রয়েছে'।[৫৯]

জানা গেল যে, মোজার উপরে মাসাহ জায়েয হওয়ার ব্যাপারে ছাহাবীগণের ইজমা রয়েছে। আর ইজমা শারঈ দলীল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, لاَ يَجْمَعُ اللهُ أُمَّتِي عَلَى الضَّلاَلَةِ أَبَدًا 'আল্লাহ আমার উম্মতকে কখনো ভ্রষ্টতার উপরে ঐক্যবদ্ধ করবেন না'।[৬০]

---

৪৫. *ছহীহ বুখারী ২/৯৯০, হা/৬৬৮৯; ছহীহ মুসলিম ২/১৪০, ১৪১, হা/১৯০৭ (১৫৫)।*
৪৬. *ইবনু তায়মিয়াহ, আল-ফাতাওয়া আল-কুবরা ১/১।*
৪৭. *যাদুল মা'আদ ১/২০১। বিস্তারিত দ্র. হাদিয়াতুল মুছল্লীন, হা/১।*
৪৮. *আবুদাঊদ ১/২৪, হা/১৫৯।*
৪৯. *আল-মুগনী ১/১৮১, মাসআলা নং ৪২৬।*
৫০. *আল-মুস্তাদরাক ১/১৬৯, হা/৬০২।*
৫১. *জুতা ব্যতীত যে বস্তু দ্বারা পুরা পায়ের পাতা টাখনুর উপর পর্যন্ত ঢেকে রাখা হয়, তাকে 'মোযা' বলা হয়। চাই সেটা চামড়ার হৌক বা সুতী হৌক বা পশমী হৌক, পাতলা হৌক বা মোটা হউক'। আশারায়ে মুবাশশারাহ সহ ৮০ জন ছাহাবী মোযার উপর মাসাহ্র হাদীছ বর্ণনা করেছেন। এ হাদীছ মুতাওয়াতির পর্যায়ভুক্ত'। নববী বলেন, সফরে বা বাড়ীতে প্রয়োজনে বা অন্য কারণে মোযার উপর মাসাহ করা বিষয়ে বিদ্বানগণের ঐক্যমত রয়েছে (ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) পৃ. ৬২। -অনুবাদক।*
৫২. *ইবনুল মুনযির, আল-আওসাত ১/৪৬২, হা/৪৫৮।*
৫৩. *মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বা ১/১৮৮, হা/১৯৭৯।*
৫৪. *ঐ, ১/১৮৯, হা/১৯৮৪।*
৫৫. *ঐ, ১/১৮৯, হা/১৯৮৭।*
৫৬. *ঐ, ১/১৮৯, হা/১৯৯০।*
৫৭. *ইবনুল মুনযির, আল-আওসাত ১/৪৬৪, ৪৬৫।*
৫৮. *আল-মুহাল্লা ২/৮৬, মাসআলা নং ২১২।*
৫৯. *আল-মুগনী ১/১৮১, মাসআলা নং ৪২৬।*
৬০. *হাকেম, আল-মুস্তাদরাক ১/১১৬, হা/৩৯৭, ৩৯৮। আরো দেখুন : সাইয়িদ নাযীর হুসাইন মুহাদ্দিছ দেহলভী (রহঃ)-এর ছাত্র হাফেয আব্দুল্লাহ গাযীপুরী (মৃঃ ১৩৩৭ হিঃ) রচিত 'ইবরাউ আহলিল হাদীছ*

অতিরিক্ত তথ্য :

১. ইবরাহীম নাখঈ (রহঃ) মোজার উপরে মাসাহ করতেন।[৬১] এর সনদ ছহীহ।

২. সাঈদ বিন জুবায়ের (রহঃ) মোজার উপরে মাসাহ করেছেন।[৬২] এর সনদ ছহীহ।

৩. আতা বিন আবী রাবাহ মোজার উপরে মাসাহ-এর প্রবক্তা ছিলেন।[৬৩]

প্রমাণিত হল যে, মোজার উপরে মাসাহ জায়েয হওয়ার ব্যাপারে তাবেঈগণেরও ইজমা রয়েছে। *আল-হামদুলিল্লাহ*।

১. কাযী আবু ইউসুফ মোজার উপরে মাসাহ-এর প্রবক্তা ছিলেন।[৬৪]

২. মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান আশ-শায়বানীও মোজার উপরে মাসাহ-এর প্রবক্তা ছিলেন।[৬৫]

৩. ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) প্রথমে মোজার উপরে মাসাহ-এর প্রবক্তা ছিলেন না। কিন্তু পরে তিনি তাঁর মত পরিবর্তন করেছিলেন। وعنه أنه رجع إلى قولهما وعليه الفتوى 'ইমাম ছাহেব থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি ছাহেবায়েনের মতের দিকে ফিরে এসেছিলেন। আর এর উপরেই ফৎওয়া'।[৬৬]

ইমাম তিরমিযী (রহঃ) বলছেন, সুফয়ান ছাওরী, ইবনুল মুবারক, শাফেঈ, আহমাদ এবং ইসহাক (বিন রাহুয়াহ) মোজার উপরে মাসাহ-এর প্রবক্তা ছিলেন (এই শর্তে যে, সেটা মোটা হবে)।[৬৭]

জাওরাব (جورب) : سوت یا اون کے موزوں کو کہتے ہیں 'সূতা বা পশমের মোজাকে জাওরাব বলা হয়'।[৬৮]

সতর্কীকরণ :

কতিপয় ব্যক্তি সাইয়িদ নাযীর হুসাইন দেহলভী (রহঃ)-এর ফৎওয়া দ্বারা মোজার উপরে মাসাহ জায়েয না হওয়া প্রমাণ করার চেষ্টা করেন। অথচ স্বয়ং সাইয়িদ নাযীর হুসাইন মুহাদ্দিছ দেহলভী (রহঃ) বলেছেন যে, 'বাকী থাকল ছাহাবীগণের আমল। তাঁদের থেকে তো মোজার উপরে মাসাহ প্রমাণিত রয়েছে এবং ১৩ জন ছাহাবীর নাম সুস্পষ্টভাবে জানা যায় যে, তাঁরা মোজার উপরে মাসাহ করতেন'।[৬৯] এজন্য ইজমায়ে ছাহাবার বিপরীত হওয়ার কারণে সাইয়িদ নাযীর হুসাইন মুহাদ্দিছ দেহলভী (রহঃ)-এর মোজার উপরে মাসাহ বিরোধী ফৎওয়া অগ্রহণযোগ্য।

১১. ছালাতে বুকের উপরে হাত বাঁধা[৭০] :

হুল্ব আত-তাঈ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, وَرَأَيْتُهُ يَضَعُ هَذِهِ عَلَى صَدْرِهِ 'আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে দেখেছি যে, তিনি তাঁর এই (হাত) তাঁর বুকের উপরে রাখতেন'।[৭১] এর সনদ হাসান। ছহীহ বুখারীতে (১/১০২, হা/৭৪০, 'আযান' অধ্যায়) সাহল বিন সা'দ (রাঃ) বর্ণিত হাদীছের ব্যাপকতাও (عموم) এর সমর্থক। নবী (ছাঃ) এবং কোন একজন ছাহাবী থেকে নাভির নিচে হাত বাঁধা অকাট্যভাবে প্রমাণিত নেই। পুরুষদের নাভির নিচে এবং মহিলাদের বুকের উপরে হাত বাঁধা কোন ছহীহ তো দূরের কথা যঈফ হাদীছ দ্বারাও প্রমাণিত নেই।

১২. ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পাঠ[৭২] :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ 'ঐ ব্যক্তির ছালাত সিদ্ধ নয়, যে ব্যক্তি সূরা ফাতিহা পড়ে না'।[৭৩] এই হাদীছটি মুতাওয়াতির।[৭৪] এই হাদীছের রাবী (বর্ণনাকারী) উবাদা (রাঃ) ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পড়ার প্রবক্তা ও বাস্তবায়নকারী ছিলেন।[৭৫] অসংখ্য ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মুক্তাদীকে ইমামের পিছনে জেহরী ও সের্রী উভয় ছালাতে সূরা ফাতিহা পড়ার হুকুম দিয়েছেন। যেমন প্রসিদ্ধ তাবেঈ নাফে বিন মাহমূদ আল-আনছারী প্রসিদ্ধ বদরী ছাহাবী উবাদা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, فَلاَ تَقْرَءُوا بِشَىْءٍ مِنَ الْقُرْآنِ إِذَا جَهَرْتُ إِلاَّ بِأُمِّ الْقُرْآنِ 'যখন আমি স্বশব্দে কুরআন পড়ব, তখন তোমরা সূরা ফাতিহা ব্যতীত কুরআন থেকে অন্য কিছু পড়বে না'।[৭৬] এই হাদীছ সম্পর্কে ইমাম বায়হাকী বলেছেন, وهذا إسناد صحيح ورواته ثقات 'এর সনদ ছহীহ এবং বর্ণনাকারীগণ বিশ্বস্ত'।[৭৭] ইমাম দারাকুৎনী বলেছেন, هَذَا إِسْنَادٌ حَسَنٌ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ

ওয়াল কুরআন মিম্মা ফিশ-শাওয়াহিদ মিনাত তুহমাতি ওয়াল বুহতান', পৃঃ ৩২।

৬১. *মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বা ১/১৮৮, হা/১৯৭৭।*

৬২. *ঐ ১/১৮৯, হা/১৯৮৯।*

৬৩. *আল-মুহাল্লা ২/৮৬।*

৬৪. *আল-হেদায়া ১/৬১।*

৬৫. *ঐ ১/৬১, 'মোজার উপরে মাসাহ' অনুচ্ছেদ।*

৬৬. *ঐ।*

৬৭. *তিরমিযী হা/৯৯।*

৬৮. *মুহাম্মাদ তাকী উছমানী দেওবন্দী, দরসে তিরমিযী ১/৩৩৪। আরো দেখুন : আয়নী, আল-বিনায়াহ ফী শারহিল হেদায়া ১/৫৯৭।*

৬৯. *ফাতাওয়া নাযীরিয়া ১/৩৩২।*

৭০. *ছালাতে বুকের উপরে হাত বাঁধা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা দ্রষ্টব্য : ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), পৃ. ৮৩-৮৬। -অনুবাদক।*

৭১. *মুসনাদে আহমাদ ৫/২২৬, হা/২২০১৭।*

৭২. ***সর্বাবস্থায় ছালাতে সূরা ফাতিহা পাঠ করা** এবং **বিরোধীদের দলীলসমূহ ও তার জওয়াব**-এর জন্য দেখুন : ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), পৃ. ৮৮-৯৬। -অনুবাদক।*

৭৩. *ছহীহ বুখারী ১/১০৪, হা/৭৫৬; ছহীহ মুসলিম ১/১৬৯, হা/৩৯৪ (৩৪)।*

৭৪. *ইমাম বুখারী, জুযউল কিরাআহ, হা/১৯।*

৭৫. *বায়হাকী, কিতাবুল কিরাআত, পৃঃ ৬৯, হা/১৩৩, সনদ ছহীহ। আরো দেখুন : আহসানুল কালাম ২/১৪২।*

৭৬. *আবুদাউদ ১/১২৬, হা/৮২৪; নাসাঈ ১/১৪৬, হা/৯২০;* মিশকাত *হা/৮৫৪।*

৭৭. *কিতাবুল কিরাআত, পৃঃ ৬৭, হা/১২১।*

كُلُّهُمْ 'এর সনদ হাসান এবং এর সকল বর্ণনাকারী বিশ্বস্ত'।[৭৮] এ জাতীয় অন্যান্য হাদীছগুলোকে আমি আমার 'আল-কাওয়াকিবুদ দুর্রিয়াহ ফী ওজূবিল ফাতিহা খালফাল ইমাম ফিল-জাহরিয়াহ' (الكواكب الدرية فى وجوب الفاتحة خلف الامام فى الجهرية) গ্রন্থে একত্রিত করে দিয়েছি।

অসংখ্য ছাহাবী ইমামের পিছনে জেহরী ও সের্রী উভয় ছালাতে সূরা ফাতিহা পড়ার প্রবক্তা ও বাস্তবায়নকারী ছিলেন। যেমন আবু হুরায়রা, আবু সাঈদ খুদরী, আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস, উবাদা বিন ছামিত, আনাস বিন মালেক, জাবের, আব্দুল্লাহ বিন আমর ইবনুল আছ, উবাই ইবনু কা'ব, আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাঃ) প্রমুখ। ছাহাবীগণের এ আছারগুলোকে আমি আমার 'কান্ধলবী ছাহেব আওর ফাতেহা খালফাল ইমাম' (আল-কাওয়াকিবুদ দুর্রিয়াহ) গ্রন্থে বিস্তারিতভাবে সংকলন করেছি এবং মুহাদ্দিছীনে কেরাম থেকে সেগুলোর ছহীহ বা হাসান হওয়া প্রমাণ করেছি। আবু হুরায়রা (রাঃ) জেহরী ও সের্রী উভয় ছালাতে ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পড়ার হুকুম দিয়েছেন।[৭৯] তিনি বলেছেন যে, 'যখন ইমাম সূরা ফাতিহা পড়ে তখন তোমরাও পড়ো এবং ইমামের পূর্বেই তা পড়া শেষ করো'।[৮০]

তাবেঈ ইয়াযীদ বিন শারীক (রহঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে,

أنه سأل عمر عن القراءة خلف الإمام فقال : اقرأ بفاتحة الكتاب قلت : وإن كنتَ أنت؟ قال : وإن كنتُ أنا، قلت : وإن جهرتَ؟ قال : وإن جهرتُ–

'তিনি ইমামের পিছনে কিরাআত সম্পর্কে ওমর (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, সূরা ফাতিহা পড়ো। আমি বললাম, যদি আপনি (ইমাম) হন তবুও? তিনি বললেন, যদি আমি (ইমাম) হই তবুও। আমি বললাম, যদি আপনি সশব্দে কিরাআত পাঠ করেন? তিনি বললেন, যদি আমি স্বশব্দে কিরাআত পাঠ করি (তবুও ফাতিহা পড়ো)'।[৮১]

ইমাম হাকেম ও ইমাম যাহাবী একে ছহীহ বলেছেন। ইমাম দারাকুৎনী বলছেন, هذا اسناد صحيح 'এই সনদ ছহীহ'।[৮২] এর সকল রাবী বিশ্বস্ত ও সত্যবাদী। কুরআন ও হাদীছে এমন একটি দলীলও নেই, যেখানে সুস্পষ্টভাবে মুক্তাদীকে ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পড়তে নিষেধ করা হয়েছে। তাক্বলীদপন্থীদের নির্ভরযোগ্য আলেম মৌলভী আব্দুল হাই লাক্ষ্ণৌভী দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা করছেন যে, لم يرد في حديث مرفوع صحيح النهى عن قراءة الفاتحة خلف الإمام وكل ما ذكروه مرفوعا فيه إما لا أصل له وإما لا يصح. 'কোন মারফূ ছহীহ হাদীছে ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পড়ার নিষেধাজ্ঞা বর্ণিত হয়নি এবং এ ব্যাপারে (তারা) যেসকল মারফূ হাদীছ উল্লেখ করে থাকেন সেগুলো হয় ছহীহ নয় বা তার কোন অস্তিত্বই নেই'।[৮৩]

কোন ছাহাবী থেকেও ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পড়ার নিষিদ্ধতা প্রমাণিত নেই। ইমাম ইবনু আব্দিল বার্র এ বিষয়ে আলেমদের ইজমা উল্লেখ করেছেন যে, 'যে ব্যক্তি ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পড়ল তার ছালাত পরিপূর্ণ হ'ল এবং তাকে পুনরায় ছালাত ঘুরিয়ে পড়ার প্রয়োজন নেই'।[৮৪] ইমাম ইবনু হিব্বানও উক্ত ইজমারই সাক্ষ্য প্রদান করেছেন।[৮৫] ইমাম বাগাবী বলছেন যে, 'ছাহাবায়ে কেরামের একটি জামা'আত জেহরী ও সের্রী ছালাত সমূহে ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পড়া ফরয হওয়ার প্রবক্তা। একথাই ওমর, উছমান, আলী, ইবনু আব্বাস, মু'আয, উবাই ইবনু কা'ব (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে'।[৮৬]

ইমাম তিরমিযী (রহঃ) বলছেন যে,

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ فِى الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الإِمَامِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم وَالتَّابِعِينَ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ وَابْنِ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِىِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ يَرَوْنَ الْقِرَاءَةَ خَلْفَ الإِمَامِ–

'এই হাদীছের ভিত্তিতে ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পাঠ করার ব্যাপারে অধিকাংশ ছাহাবী ও তাবেঈর আমল চালু আছে। আর এটাই মালেক বিন আনাস, ইবনুল মুবারক, শাফেঈ, আহমাদ ও ইসহাক বিন রাহুয়াহ-এর মত। এঁরা ইমামের পিছনে ফাতিহা পড়ার প্রবক্তা'।[৮৭]

[চলবে]

---

৭৮. *দারাকুৎনী ১/৩২০, হা/১২৩৩।*
৭৯. *ছহীহ মুসলিম ১/১৬৯, হা/৩৯৫ (৩৮); মুসনাদে হুমায়দী হা/৯৮০; ছহীহ আবু আওয়ানা ২/১২৮।*
৮০. *বুখারী, জুযউল কিরাআহ হা/২৩৭, ২৮৩। এর সনদ হাসান। আছারুস সুনান হা/৩৫৮।*
৮১. *আল-মুস্তাদরাক আলাছ ছহীহায়েন ১/২৩৯, হা/৮৭৩।*
৮২. *দারাকুৎনী ১/৩১৭, হা/১১৯৮।*
৮৩. *আত-তা'লীকুল মুমাজ্জাদ, পৃঃ ১০১।*
৮৪. *ফাতাওয়াস সুবকী ১/১৩৮।*
৮৫. *আল-মাজরূহীন ২/১৩।*
৮৬. *শারহুস সুন্নাহ ৩/৮৪, ৮৫, হা/৬০৭।*
৮৭. *তিরমিযী ১/৭০, ৭১, হা/৩১১।*

মানুষের সার্বিক জীবনকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে পরিচালনার গভীর প্রেরণাই হ'ল আহলেহাদীছ আন্দোলনের নৈতিক ভিত্তি।

আল্লাহ্র উপর ভরসা

*মূল (আরবী) : মুহাম্মাদ ছালেহ আল-মুনাজ্জিদ**

*অনুবাদ : আব্দুল মালেক***

ভূমিকা :

সকল প্রশংসা আল্লাহ্র, যিনি সৃষ্টিকুলের প্রতিপালনকারী। ছালাত ও সালাম আমাদের নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর উপর, যিনি নবী ও রাসূলকুলের শ্রেষ্ঠ। সেই সঙ্গে ছালাত ও সালাম তাঁর পরিবার ও ছাহাবীগণের উপর।

অতঃপর আমাদের এই 'তাওয়াক্কুল' (আল্লাহ্র উপরে ভরসা) পুস্তিকাটি 'অন্তরের আমল সমূহ' সিরিজের দ্বিতীয় রচনা। কোন এক জ্ঞান-গবেষণা মজলিসে আল্লাহ তা'আলা আমাকে এটি উপস্থাপনের সুযোগ করে দিয়েছিলেন। এটি তৈরীতে একদল নিবেদিতপ্রাণ বিদ্যানুরাগী আমাকে সহায়তা করেছেন। এখন আল্লাহ্র রহমতে এটি পুস্তক আকারে মুদ্রিত হ'তে যাচ্ছে।

আল্লাহ্র উপর ভরসা মানব জীবনে একটি অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ স্তর। এর প্রভাব-প্রতিপত্তিও সুদূরপ্রসারী। ঈমানের যেসব বিষয় ফরয বা আবশ্যকীয়, এটি তন্মধ্যে শ্রেষ্ঠ। দয়াময় আল্লাহ্র সান্নিধ্য লাভে যে সকল আমল ও ইবাদত রয়েছে তন্মধ্যে এটি উত্তম। আল্লাহ্র একত্ববাদের স্বীকৃতিদানে তাওয়াক্কুলের মত উঁচু স্তর দ্বিতীয়টি মেলে না। কেননা যাবতীয় কাজ আল্লাহ্র উপর ভরসা ও তাঁর সাহায্য ছাড়া অর্জন করা সম্ভব নয়।

এই ছোট্ট পুস্তিকায় আমরা চেষ্টা করব তাওয়াক্কুলের অর্থ ও তাৎপর্য বর্ণনা করতে এবং তাওয়াক্কুল ও তাওয়াকুলের (ভানের) পার্থক্য তুলে ধরতে। তারপর আমরা আলোচনা করব তাওয়াক্কুলের উপকারিতা, তাওয়াক্কুল পরিপন্থী কাজকর্ম এবং শেষ করব আল্লাহ্র উপর ভরসাকারী কিছু লোকের ঘটনার বিবরণ দিয়ে।

আমরা এ কাজে মহান আল্লাহ্র সাহায্য-সহযোগিতা প্রার্থনা করছি আর ছালাত ও সালাম পেশ করছি আমাদের নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ), তাঁর পরিবার-পরিজন ও তাঁর সঙ্গী-সাথী মহান ছাহাবীগণের উপর।

তাওয়াক্কুলের পরিচয় :

অভিধানে তাওয়াক্কুল : 'তাওয়াক্কুল' শব্দটি যখন আল্লাহ্র সঙ্গে যোগ করে বলা হবে তখন তার অর্থ হবে আল্লাহতে সম্পূর্ণ ভরসা করা। আরবীতে এ শব্দ سَمِعَ (সামি'আ), تَفَعُّلٌ (তাফা'উল) ও اِفْتِعَالٌ (ইফতি'আল) বাব থেকে উক্ত একই অর্থে আসে। বলা হয়, وَكِلَ بالله، وتوكَّل عليه، واتَّكل সবগুলো শব্দের অর্থ 'সে আল্লাহ্র নিকট দায়িত্ব অর্পণ করল'। কোন কাজের সাথে তাওয়াক্কুল যোগ করলে তা সম্পন্ন করার দায়িত্ব নেওয়া অর্থে আসে। যেমন تَوَكَّلَ بِالْأَمْرِ অর্থাৎ 'সে কাজটা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত করার দায়িত্ব নিয়েছে'।

তাওয়াক্কুল (توكل)-এর অনুসর্গ إلى হরফ হ'লে অর্থ হয় কোন কাজে অন্যের উপর নির্ভর করা। যেমন وَكَّلْتُ أَمْرِيْ إِلَى فُلَانٍ 'আমার কাজটিতে আমি অমুকের উপর ভরসা করেছি'। যদি অনুসর্গ (حرف جر) ছাড়াই সরাসরি কর্মকারকের সাথে তাওয়াক্কুল যোগ হয় তাহ'লে তার অর্থ হবে নিজের কাজ নিজে করতে অক্ষম হয়ে অন্যকে তা করার দায়িত্ব দেওয়া তথা উকিল (Agent) বা প্রতিনিধি নিয়োগ দেওয়া। সে কাজটা করে দিবে বলে তার উপর ভরসা করা।[১] সুতরাং 'তাওয়াক্কুল' শব্দের অর্থ هو إظهار العجز والاعتماد على الغير 'নিজের অক্ষমতা যাহির করা এবং অন্যের উপর ভরসা করা'।

পারিভাষিক অর্থে তাওয়াক্কুল :

বিদ্বানগণ তাওয়াক্কুলের নানা সংজ্ঞা দিয়েছেন।

১. ইবনু রজব (রহঃ) বলেছেন, هو صدق اعتماد القلب على الله عز وجل في استجلاب المصالح ودفع المضار من أمور الدنيا والآخرة 'দুনিয়া ও আখিরাতের সকল কাজে মঙ্গল লাভ ও অমঙ্গল প্রতিহত করতে আন্তরিকভাবে আল্লাহ্র উপর ভরসা করাকে তাওয়াক্কুল বলে'।[২]

২. হাসান (রহঃ) বলেছেন, إن توكل العبد على ربه أن يعلم أن الله هو ثقته 'মালিকের উপর বান্দার তাওয়াক্কুলের অর্থ, আল্লাহই তার নির্ভরতার স্থান- একথা সে মনে রাখবে'।[৩]

৩. আয্-যুবায়দী (রহঃ) বলেন, التوكل : الثقة بما عند الله واليأس مما في أيدي الناس 'আল্লাহ তা'আলার নিকট যা আছে তার উপর নির্ভর করা এবং মানুষের হাতে যা আছে তার প্রতি আশাহত থাকাকে তাওয়াক্কুল বলে'।[৪]

৪. ইবনু উছায়মীন (রহঃ) বলেন, التوكل هو صدق الاعتماد على الله عز وجل في جلب المنافع ودفع المضار مع فعل الأسباب التي أمر الله بها– 'কল্যাণ অর্জনে ও অকল্যাণ

---

* সঊদী আরবের প্রখ্যাত আলেম ও দাঈ।

** ঝিনাইদহ।

১. ইবনু মানযূর, লিসানুল আরব ১১/৭৩৪।
২. ইবনু রজব, জামেউল উলূম ওয়াল হিকাম, পৃঃ ৪৩৬।
৩. ঐ, পৃঃ ৪৩৭।
৪. মুরতাযা আয্-যুবায়দী, তাজুল 'আরূস শীর্ষ শব্দ (وكل)।

Contents

দূরীকরণে সত্যিকারভাবে আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করা এবং এতদসঙ্গে আল্লাহ যে সকল উপায়-উপকরণ অবলম্বন করতে বলেছেন তা অবলম্বন করাকে তাওয়াক্কুল বলে'।[৫] এই সংজ্ঞাটি তাওয়াক্কুলের উৎকৃষ্ট সংজ্ঞা, যার মধ্যে সব দিকই শামিল রয়েছে। (এতে একদিকে আল্লাহ্‌র রহমতের উপর ভরসা এবং অন্যদিকে আল্লাহ্‌র নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করার কথা রয়েছে)।

বিষয়ের গুরুত্ব :

সাঈদ ইবনু জুবায়ের (রহঃ) বলেছেন, التوكل على الله جماع الإيمان 'আল্লাহ্‌র উপর ভরসা ঈমানের সামষ্টিক রূপ'।[৬]

ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেছেন, التوكل نصف الدين والنصف الثاني الإنابة 'তাওয়াক্কুল দ্বীনের অর্ধেক; বাকী অর্ধেক হ'ল ইনাবা'। কেননা দ্বীন হ'ল সাহায্য কামনা ও ইবাদতের নাম। এই সাহায্য কামনা হ'ল তাওয়াক্কুল এবং ইবাদত-বন্দেগী হ'ল ইনাবা। আরবী 'ইনাবা' (الإنابة) অর্থ আল্লাহ্‌র দিকে মনোনিবেশ ও তওবা করে ফিরে আসা।

আল্লাহ্‌র উপর ভরসার মর্যাদা ও গুরুত্ব ব্যাপক জায়গা জুড়ে রয়েছে। তাওয়াক্কুল সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ব্যাপকতা এবং বিশ্ববাসীর প্রয়োজনের আধিক্যের ফলে তাওয়াক্কুলকারীদের দ্বারা এর আঙিনা সদাই ভরপুর থাকে।[৭]

সুতরাং তাওয়াক্কুল জড়িয়ে আছে ওয়াজিব (ফরয), মুস্তাহাব, মুবাহ সবকিছুরই সাথে। এমনকি যেসব নাস্তিক আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব অস্বীকার করে ক্ষেত্রবিশেষে তারাও নিজেদের লক্ষ্য পূরণে আল্লাহ তা'আলার উপর ভরসা করে। আসলে মানুষের প্রয়োজনের কোন সীমা-পরিসীমা নেই। কাজেই প্রয়োজন পূরণার্থে তাদেরকে অবশ্যই আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর করতে হয়।

ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, বান্দা যদি কোন পাহাড় সরাতে আদিষ্ট হয় আর যদি সে কাজে সে আল্লাহ তা'আলার উপর যথার্থভাবে ভরসা করতে পারে, তবে সে পাহাড়ও সরিয়ে দিতে পারবে।[৮]

সুতরাং একজন মুসলিম তার যাবতীয় কাজে আল্লাহ্‌র উপর ভরসাকে একটা মুস্তাহাব বিষয় ভাবতে পারে না; বরং সে তাওয়াক্কুলকে একটি দ্বীনী দায়িত্ব বা আবশ্যিক কর্তব্য বলে মনে করবে।

শায়খ সুলায়মান বিন আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব (রহঃ) বলেন, যে মূল থেকে ইবাদতের নানা শাখা-প্রশাখা উদগত হয়েছে তা হ'ল : আল্লাহ্‌র উপর ভরসা, তাঁর নিকট সত্য দিলে আশ্রয় নেওয়া এবং আন্তরিকভাবে তাঁর উপর নির্ভর করা। তাওয়াক্কুলই আল্লাহ্‌র একত্ববাদের স্বীকারোক্তির সারকথা। এর মাধ্যমেই তাওহীদের চূড়ান্তরূপ নিশ্চিত হয়। আল্লাহ তা'আলার প্রতি ভালবাসা, ভয়, রব ও উপাস্য হিসাবে তাঁর নিকট আশা-ভরসা এবং তাঁর নির্ধারিত তাকদীর বা ফায়ছালায় সন্তুষ্ট থাকার মত মহতী বিষয়গুলো তাওয়াক্কুল থেকেই উৎপত্তি লাভ করে। এমনকি অনেক ক্ষেত্রে তাওয়াক্কুল বান্দার নিকট বালা-মুছীবতকে পর্যন্ত উপভোগ্য বিষয় করে তোলে, সে তখন বালা-মুছীবতকে আল্লাহ্‌র দেওয়া নে'মত মনে করতে থাকে। বস্তুতঃ পবিত্র সেই মহান সত্তা তিনি যাকে যা দিয়ে ইচ্ছে অনুগ্রহ করেন। তিনি মহা অনুগ্রহশীল।[৯]

আল্লাহ্‌র উপর ভরসার তাৎপর্য :

তাওয়াক্কুলের হাকীকত বা মূল কথা হ'ল অন্তর থেকে আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করা, সেই সাথে পার্থিব নানা উপায়-উপকরণ ব্যবহার করা এবং পরিপূর্ণ বিশ্বাস রাখা যে, আল্লাহই রিযিকদাতা, তিনিই একমাত্র স্রষ্টা, জীবন ও মৃত্যু দাতা। তিনি ছাড়া যেমন কোন ইলাহ বা উপাস্য নেই, তেমনি তিনি ছাড়া কোন প্রতিপালক নেই।

তাওয়াক্কুল শব্দটি ইসতি'আনাহ (الاستعانة) থেকে ব্যাপক অর্থবোধক। কেননা ইসতি'আনাহ (সাহায্য প্রার্থনা) হ'ল, যে কোন কাজে আল্লাহ তা'আলা যাতে বান্দাকে সাহায্য করেন সেজন্য তাঁর দরবারে সাহায্যের আবেদন-নিবেদন করা।

পক্ষান্তরে তাওয়াক্কুলের মধ্যে যেমন আমাদের যাবতীয় কাজে আল্লাহ্‌র সাহায্য প্রার্থনা শামিল আছে, তদ্রূপ সব রকম কল্যাণ লাভ ও অকল্যাণ প্রতিহত করতে আল্লাহ্‌র উপর ভরসাও শামিল আছে। অন্যান্য বিষয়ও তাওয়াক্কুলের আওতাভুক্ত।

ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, যে কাজ করতে আল্লাহ হুকুম করেছেন তাতে আল্লাহ্‌র সাহায্য চাওয়া তাওয়াক্কুল। আবার যে কাজ বান্দার সামর্থ্যের বাইরে আল্লাহ যাতে তা যুগিয়ে দেন সে নিবেদনও তাওয়াক্কুল। সুতরাং ইসতি'আনাহ বা সাহায্য প্রার্থনা বান্দার নানা আমলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কিন্তু তাওয়াক্কুল তার থেকেও কিছু বেশী। মানুষ যাতে কল্যাণ লাভ করতে পারে এবং ক্ষতি থেকে বাঁচতে পারে সেজন্যও আল্লাহ্‌র উপর তাওয়াক্কুল করতে হয়। আল্লাহ বলেন, وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوْا مَا آتَاهُمُ اللهُ وَرَسُوْلُهُ وَقَالُوْا حَسْبُنَا اللهُ سَيُؤْتِينَا اللهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُوْلُهُ إِنَّا إِلَى اللهِ رَاغِبُوْنَ– 'কতই না ভাল হ'ত যদি তারা সন্তুষ্ট হ'ত আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তাদের যা দিয়েছেন তার উপরে এবং বলত, আল্লাহ আমাদের জন্য যথেষ্ট। সত্বর আল্লাহ ও তাঁর রাসূল আমাদেরকে তাঁর অনুগ্রহ থেকে দান করবেন। আর আমরা আল্লাহ্‌র প্রতি নিরত হ'লাম' *(তওবা ৯/৫৯)*।[১০]

---

৫. মাজমূ' ফাতাওয়া ও রাসাইলু ইবনে উছায়মীন ১/৬৩।
৬. মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বা ৭/২০২।
৭. ইবনুল ক্বাইয়িম, মাদারিজুস সালিকীন ২/১১৩।
৮. ঐ, ১/৮১।
৯. শায়খ সুলায়মান বিন আব্দুল্লাহ, তায়সীরুল আযীযিল হামীদ, পৃঃ ৮৬।
১০. ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ' ফাতাওয়া ৭/১৭৭।

সুতরাং কল্যাণ লাভ এবং ক্ষতি দূরীকরণের জন্য তাওয়াক্কুল এবং ইবাদত-বন্দেগীর জন্য ইসতি'আনাহ (সাহায্য প্রার্থনা)। তবে তাওয়াক্কুলের পরিধি ইসতি'আনাহ থেকে বেশী। এই দু'টি মূল বিষয়কে আল্লাহ তা'আলা সূরা ফাতিহার পাঁচ নং আয়াতে একত্রিত করেছেন- إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ 'আমরা একমাত্র আপনারই ইবাদত করি এবং একমাত্র আপনারই সাহায্য প্রার্থনা করি' *(ফাতিহা ১/৫)*।

সুতরাং ইবাদতও তাঁর করতে হবে, সাহায্যও তাঁর কাছে চাইতে হবে এবং তাওয়াক্কুল বা ভরসাও তাঁর উপর করতে হবে। তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই।

কবি শরীফ মুরতাযা বলেন :

إذا ما حَذرتَ الأمرَ فاجعَلْ إزاءَه + رجوعاً إلى ربٍّ يقيك الْمَحَاذِرَا

ولا تخشَ أمرًا أنت فيه مُفَوِّضٌ + إلى الله غاياتٍ له ومصادرا

وكُنْ للذي يقضي به اللهُ وحدَه + وإنْ لم توافقه الأمانيُّ شاكرا

وإني كفيلٌ بالنجاء من الأذى + لمن لم يبتْ يدعو سوى الله ناصرا

'ভয় যদি পাও কোন কিছুর সামনে রাখ রবকে তোমার,
দূর হবে যে সকল বাধা, বিপত্তি কভু থাকবে না আর।
সমর্পিত যে আল্লাহতে তার তরে নেই কোন ডর
উপায় একটা হবেই হবে চিন্তা কভু করো না আর।
আল্লাহ্‌র যা ফায়ছালা হয় তাতে থাক শোকরগুযার
যদিও তাতে কখনও কখনও পূরণ না হয় আরয তোমার।
কষ্ট থেকে মুক্তি লাভের আমি (কবি) হব যামিন তার,
আল্লাহ ছেড়ে অন্যেরে যেচে কখনই রাত কাটে না যার'।

সুতরাং অনাকাঙ্ক্ষিত কিছু ঘটে গেলে তাতেও আল্লাহ্‌র প্রতি কৃতজ্ঞ থাকতে হবে, অন্য কাউকে ভয় করা চলবে না। তোমার যে কোন কাজ যখন তুমি আল্লাহ্‌র নিকট ন্যস্ত করবে এবং আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করে তাঁর দিকে ফিরে যাবে তখন আল্লাহ্‌র মর্যি মোতাবেক তিনি তোমাকে সাহায্য-সহযোগিতার হাত প্রসারিত করবেন।

উপায়-উপকরণ বা মাধ্যম গ্রহণ :

যে কোন চাহিদা পূরণে উপায়-উপকরণ ও মাধ্যম গ্রহণ না করা কোন অবস্থাতেই আল্লাহ্‌র উপর তাওয়াক্কুল বা ভরসার মর্মার্থ নয়। তাওয়াক্কুলের বরং দু'টি দিক রয়েছে। এক. আল্লাহ্‌র উপর ভরসা ও নির্ভরতা। দুই. তাঁর সাথে কাজের উপকরণ অবলম্বন করা।

আসলে লক্ষণীয় যা তা হ'ল- শুধুই উপায়-উপকরণের উপর নির্ভর না করা। বান্দাকে জানতে ও বুঝতে হবে যে, উপায়-উপকরণ গ্রহণ করে চাহিদা পূরণ ও সমস্যা সমাধান কেবল জাগতিক নিয়ম মাত্র। উপকারকারী ও অপকারকারী কেবলই আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা।

ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, سر التوكل وحقيقته هو اعتماد القلب على الله وحده، فلا يضره مباشرة الأسباب مع خلو القلب من الاعتماد عليها والركون إليها– 'তাওয়াক্কুলের রহস্য ও তাৎপর্য হ'ল- বান্দার অন্তর এক আল্লাহ্‌র উপর নির্ভরশীল হওয়া; জাগতিক উপায়-উপকরণের প্রতি অন্তরের মোহশূন্য থাকা, তার প্রতি আকৃষ্ট না হওয়া। এসব উপায়-উপকরণের সরাসরি ক্ষতি কিংবা উপকার করার কোনই ক্ষমতা নেই'।[১১]

আল্লাহ্‌র উপর প্রকৃত তাওয়াক্কুলকারী এবং তাওয়াক্কুলের মৌখিক দাবীদারদের মধ্যে এটাই বুনিয়াদী পার্থক্য। কেননা প্রকৃত তাওয়াক্কুলকারীর উপায়-উপকরণ যদি হাতছাড়া হয়েও যায় তবুও তার কিছু যায় আসে না, সে তো ভাল করেই জানে, যে আল্লাহ্‌র উপর সে নির্ভর করে তিনি নিত্য ও চিরস্থায়ী। কিন্তু তাওয়াক্কুলের মৌখিক দাবীদারের জাগতিক উপায়-উপকরণ হাতছাড়া হওয়ার সাথে সাথে সে ভেঙ্গে পড়ে। আল্লাহ্‌র উপর ভরসার মাত্রা দুর্বল হওয়ার কারণেই তার এমনটা হয়।

নবী করীম (ছাঃ)-এর উপায়-উপকরণ গ্রহণ :

নবী করীম (ছাঃ) ছিলেন আল্লাহ্‌র উপর সবচেয়ে বড় তাওয়াক্কুলকারী। তা সত্ত্বেও তিনি বহুক্ষেত্রে জাগতিক উপায়-উপকরণ অবলম্বন করেছেন তাঁর উম্মতকে একথা বুঝানোর জন্য যে, উপায়-উকরণ গ্রহণ তাওয়াক্কুলের পরিপন্থী নয়।

ওহোদ যুদ্ধে তিনি একটার পর একটা করে দু'টো বর্ম গায়ে দিয়েছিলেন। সায়েব ইবনু ইয়াযীদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ظَاهَرَ بَيْنَ دِرْعَيْنِ يَوْمَ أُحُدٍ– 'ওহোদ যুদ্ধের দিনে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দু'টি বর্ম পরে জনসমক্ষে এসেছিলেন'।[১২] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর উম্মতের জন্যও যুদ্ধের পোশাকের ব্যবস্থা করেছেন।[১৩]

মক্কা বিজয়ের দিনে তিনি শিরস্ত্রাণ ব্যবহার করেছিলেন। আনাস বিন মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত, أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ مَكَّةَ يَوْمَ الْفَتْحِ وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِغْفَرُ 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মক্কা বিজয় দিবসে যখন মক্কায় প্রবেশ করেন তখন তাঁর মাথায় শিরস্ত্রাণ ছিল'।[১৪]

হিজরতের সময় তিনি একজন পথপ্রদর্শক সাথে নিয়েছিলেন, যে তাঁকে পথ দেখিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। তাঁর যাত্রাপথে কোন পদচিহ্ন যাতে না থাকে তিনি সে ব্যবস্থাও নিয়েছিলেন। তিনি যাত্রার জন্য এমন সময় বেছে নিয়েছিলেন যখন লোকজন সাধারণতঃ সজাগ থাকে না। আবার জনগণ সচরাচর যে পথে চলাচল করে তিনি তা বাদ দিয়ে অন্য রাস্তা ধরেছিলেন।

এসব কিছুই উপায় ও মাধ্যম অবলম্বনের অন্তর্গত। তিনি তাঁর উম্মতকে এই শিক্ষাই দিয়েছেন যে, উপায়-উপকরণ গ্রহণ

১১. *ইবনুল ক্বাইয়িম, আল-ফাওয়ায়েদ, পৃঃ ৮৭।*
১২. *আহমাদ হা/১৫৭৬০, শু'আইব আল-আরনাউত হাদীছটিকে ছহীহ গণ্য করেছেন।*
১৩. *ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৭০২৮।*
১৪. *বুখারী হা/৪২৮৬; মুসলিম হা/১৩৫৭; মিশকাত হা/২৭১৮।*

অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আল্লাহ্র উপর ভরসাকারী কোন মুসলিমই উপায়-উপকরণ গ্রহণ থেকে দূরে থাকতে পারে না।

ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَوَكَّلُوْنَ عَلَى اللهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرُزِقْتُمْ كَمَا تُرْزَقُ الطَّيْرُ تَغْدُو خِمَاصًا وَتَرُوْحُ بِطَانًا-

'তোমরা যদি আল্লাহ্র উপর যথার্থভাবে ভরসা করতে তাহ'লে পাখ-পাখালির মতই তোমরা জীবিকা পেতে। তারা ভোর বেলায় ওঠে ক্ষুধার্ত অবস্থায় আর সন্ধ্যায় ভরাপেটে নীড়ে ফেরে'।[১৫]

এ হাদীছে উপায়-উপকরণ গ্রহণের গুরুত্ব ফুটে উঠেছে। যে পাখির খাবার যোগাড়ের দায়িত্ব আল্লাহ নিয়েছেন সে তো তার কাছে খাবার আপনা থেকে আসবে সেই আশায় তার বাসায় বসে থাকে না। বরং খুব ভোরে ক্ষুধার্ত অবস্থায় খাবারের সন্ধানে বেরিয়ে পড়ে। আল্লাহ তার ইচ্ছে পূরণ করে দেন। ফলে সে যখন বাসায় ফিরে তখন তার পেট ভরা ও পরিতৃপ্ত থাকে।

অবশ্য মুসলমানকে জাগতিক কোন উপকরণ ও পন্থা অবলম্বন করতে হ'লে প্রথমেই তাকে দেখতে হবে শরী'আতের নিরিখে তা বৈধ কি-না। আমরা কিছু লোককে দেখি, তারা তাদের উদ্দেশ্য হাছিলের জন্য কর্মচারীদের ঘুষ প্রদান করে আর বলে, এটা তাওয়াক্কুলের অংশ। শিক্ষার্থীরা পরীক্ষায় নকল করে অথচ বলে এটাও তাওয়াক্কুল। অথচ এর কোনটাই আদৌ তাওয়াক্কুল নয়। বরং এগুলো তাওয়াক্কুলের সম্পূর্ণ বিপরীত ও বিরোধী। এহেন মুসলিম যদি আল্লাহ্র উপর প্রকৃতই ভরসা করত তাহ'লে তারা কখনই শরী'আত গর্হিত কোন কাজ করত না।

তাওয়াক্কুল ও তাওয়াকুলের (ভানের) মধ্যে পার্থক্য :

পূর্বেই বলা হয়েছে তাওয়াক্কুলের জন্য বিভিন্ন উপায়-উপকরণ ও কাজের পথ অবলম্বন অপরিহার্য। কিন্তু কোন কিছু না করে নিশ্চেষ্ট বসে থাকার নাম তাওয়াক্কুল নয়; বরং তা তাওয়াক্কুলের ভান। আরবীতে একে 'তাওয়াকুল' (تواكل) বলে। তাওয়াকুল বা নিশ্চেষ্ট বসে থেকে আল্লাহ্র উপর ভরসা যাহির করা আল্লাহ্র দ্বীনের কোন কিছুতেই পড়ে না।

বলা হয়ে থাকে, যে তাওয়াক্কুল ছেড়ে দেয় তার তাওহীদে খুঁত তৈরী হয়, আর যে জাগতিক উপায়-উপকরণ বা কাজকর্ম ছেড়ে দেয় তার বিবেক-বুদ্ধি বিনষ্ট হয়ে যায়। মুসলিম জাতির দুর্বলতার অন্যতম কারণ এই তাওয়াকুল বা নিশ্চেষ্ট বসে থেকে সময় পার করা। লোকে বাড়ি বসে থেকে জীবিকা লাভের আশা করে, একটু নড়েচড়ে দেখে না; আবার দাবী করে আমি আল্লাহ্র উপর ভরসা করে আছি। লোকেরা আশায় থাকে যে, আল্লাহ তাদেরকে তাদের শত্রুর বিরুদ্ধে সাহায্য করবেন অথচ সেজন্য তাদের বিজ্ঞান-প্রযুক্তি, যুদ্ধের প্রস্তুতিজনিত অস্ত্র-শস্ত্র এবং আনুষঙ্গিক জিনিসের কোনই ব্যবস্থা ও উদ্যোগ নেই।

ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, كَانَ أَهْلُ الْيَمَنِ يَحُجُّوْنَ وَلاَ يَتَزَوَّدُوْنَ وَيَقُوْلُوْنَ نَحْنُ الْمُتَوَكِّلُوْنَ، فَإِذَا قَدِمُوْا مَكَّةَ سَأَلُوْا النَّاسَ 'ইয়ামানবাসীরা হজ্জ করতে আসত কিন্তু পথখরচ আনত না। তারা বলত, আমরা আল্লাহ্র উপর ভরসাকারী। তারপর যখন তারা মক্কায় পৌঁছত তখন মানুষের কাছে হাত পাতত'। এতদপ্রেক্ষিতে আল্লাহ নাযিল করেন, وَتَزَوَّدُوْا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى 'আর (হজ্জের জন্য) তোমরা পাথেয় সাথে নাও। নিশ্চয়ই সর্বোত্তম পাথেয় হ'ল আল্লাহভীতি' *(বাক্বারাহ ২/১৯৭)*।[১৬]

দেখুন, কিভাবে আল্লাহ তা'আলা তাদের তাওয়াক্কুলের দাবীকে প্রত্যাখ্যান করেছেন; অথচ তারা তো হজ্জের কাজে লাগতে পারে এমন কোন পাথেয়ই সাথে না এনে কেবলই আল্লাহ্র উপর তাওয়াক্কুল করেছিল। আবার তাওয়াক্কুলের ঈপ্সিত লক্ষ্য এটাও নয় যে, বান্দা উপকরণের পেছনে তার জীবনপাত করবে এবং সাধ্যাতীত কাজে নিজেকে নিয়োজিত করবে। বরং কখনো কখনো তার জন্য সহজ ও লঘু উপকরণও যথেষ্ট হ'তে পারে। তার প্রমাণ মারইয়াম (আঃ)-এর ঘটনা। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে খেজুর গাছ ধরে ঝাঁকি দিতে বলেছিলেন, যাতে তাঁর সামনে খেজুর ঝরে পড়ে। আল্লাহ বলেন, وَهُزِّيْ إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا 'আর তুমি তোমার দিকে খেজুর গাছের কাণ্ড ধরে নাড়া দাও। সেটি তোমার উপর পাকা খেজুর নিক্ষেপ করবে' *(মারিয়াম ১৯/২৫)*।

অনেকের মনে বিস্ময় জাগে- এহেন দুর্বল গর্ভবতী মহিলা কিভাবে মযবূত ও শক্ত খেজুর গাছ ধরে এমনভাবে ঝাঁকি দিল যে টপটপ করে খেজুর ঝড়ে পড়ল? আমরা বলি, হ্যাঁ, এই মহীয়সী মহিলার ঘটনা দ্বারা আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে উপকরণ গ্রহণের গুরুত্ব শিক্ষা দিয়েছেন- চাই সেসব উপকরণ লঘু ও দুর্বল হৌক। কেননা এই সতী-সাধ্বী মহিলার সেই মুহূর্তে এরূপ দুর্বল ধরনের কাজ করা ছাড়া অন্য কোন উপায় ছিল না।

আল্লাহ তা'আলার জন্য কোন মাধ্যম ছাড়াই খেজুর নীচে ফেলানো অবশ্যই সম্ভব ছিল। কিন্তু যেহেতু কোন কিছু পেতে হ'লে মাধ্যম একটি জাগতিক নিয়ম হিসাবে রয়েছে, সেহেতু আল্লাহ মারিয়াম (আঃ)-কে কাণ্ড ধরে ঝাঁকি দিতে বলেছিলেন। কিন্তু যখন তিনি আল্লাহ্র উপর যথাযথভাবে ভরসা করেছিলেন এবং তাঁর দুর্বল পদ্ধতি কাজে লাগিয়েছিলেন তখন আল্লাহ তাঁর ইচ্ছা ফলবতী করেছিলেন

---

১৫. তিরমিযী হা/২৩৪৪; ইবনু মাজাহ হা/৪১৬৪; হাকেম হা/৭৮৯৪, ৪/৩৫৪; মিশকাত হা/৫২৯৯।

১৬. বুখারী হা/১৫২৩; মিশকাত হা/২৫৩৩।

Contents

এবং ফলগুলোকে তাঁর নাগালের মধ্যে এনে দিয়েছিলেন। কবি বলেছেন,

توكَّل على الرَّحمن في كلِّ حاجةٍ + ولا تؤثرنَّ العجز يوماً على الطَّلبْ

ألم تر أن الله قال لمريم + إليك فهزِّي الجذع يسَّاقط الرُّطبْ

ولو شاء أن تجنيه من غير هزِّها + جنته ولكن كلُّ شيءٍ له سببْ

ভরসা কর সকল কাজে আল্লাহ দয়াময়ের পরে
প্রাধান্য দিও না অক্ষমতাকে চেষ্টার পরে মুহূর্ত তরে।
তুমি কি দেখনি, বলেছেন আল্লাহ মারিয়ামকে
খেজুর পেতে নাড়া দাও তুমি খেজুর গাছের কাণ্ডটাকে
চাইলে তিনি দিতেন খেজুর ঝাঁকি ছাড়াই
কিন্তু কিছু পাইতে হ'লে উপকরণ বিনে উপায় নাই।[১৭]

যখন মানুষ সম্ভাব্য সব উপকরণ হারিয়ে ফেলে তখন যেন সে সবচেয়ে মহান ও শক্তিশালী উপকরণের কথা ভুলে না যায়। তাহ'ল মহান আল্লাহ্র সমীপে দো'আ ও ফরিয়াদ।

তাওয়াক্কুলের হুকুম :

নিশ্চয়ই আল্লাহ্র উপর ভরসা করা শীর্ষস্তরের ফরযসমূহের অন্তর্গত একটি বড় ফরয। ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, فإن التوكل على الله واجب من أعظم الواجبات كما أن الإخلاص لله واجب وقد أمر الله بالتوكل في غير آية أعظم مما أمر بالوضوء وغسل الجنابة، ونهى عن التوكل على غيره سبحانه- 'আল্লাহ্র উপর ভরসা করা ফরয। এটি উচ্চাঙ্গের ফরয সমূহের অন্তর্ভুক্ত। যেমন আল্লাহ্র জন্য ইখলাছ বা বিশুদ্ধচিত্তে কাজ করা ফরয। ওযূ ও অপবিত্রতা থেকে পবিত্রতার জন্য গোসলের ব্যাপারে যেখানে আল্লাহ তা'আলা একটি আয়াতে একবার বলে তা ফরয সাব্যস্ত করেছেন, সেখানে একাধিক আয়াতে তিনি তাঁর উপর ভরসা করার আদেশ দিয়েছেন এবং তাঁকে ছাড়া অন্যের উপর ভরসা করতে নিষেধ করেছেন'।[১৮]

বরং তাওয়াক্কুল ঈমানের শর্ত। এজন্য আল্লাহ্র বাণী وَعَلَى اللهِ فَتَوَكَّلُوْا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ 'আর আল্লাহ্র উপরে তোমরা ভরসা কর, যদি তোমরা বিশ্বাসী হও' *(মায়েদাহ ৫/২৩)* এই আয়াতের মর্মার্থ এই দাঁড়াচ্ছে যে, বান্দার থেকে তাওয়াক্কুল দূর হয়ে গেলে সাথে সাথে ঈমানও দূর হয়ে যাবে।

তাওয়াক্কুল তাওহীদে উলূহিয়্যা বা উপাস্যের একত্ববাদের যেসব ভিত্তি রয়েছে তন্মধ্যে একটি। সূরা ফাতিহার পাঁচ নং আয়াত একথার প্রমাণ বহন করে। আল্লাহ বলেন, إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ 'আমরা একমাত্র আপনারই ইবাদত করি এবং একমাত্র আপনারই সাহায্য প্রার্থনা করি' *(ফাতিহা ১/৫)*।

তাওয়াক্কুলের মাহাত্ম্য ও তার প্রতি উদ্বুদ্ধকরণমূলক আয়াত সমূহ :

তাওয়াক্কুল শব্দটি কুরআন মাজীদে ৪২ জায়গায় এসেছে। কখনো তা একবচনে, কখনো বহুবচনে, কখনো অতীতকালের শব্দে, কখনো বর্তমান ও ভবিষ্যত কালের শব্দে, কখনোবা আদেশবাচক শব্দে। সবগুলো শব্দই আল্লাহ্র উপর ভরসা ও নির্ভরতা এবং তাঁর নিকট কার্যভার অর্পণ অর্থে এসেছে।

তাওয়াক্কুলের মাহাত্ম্য ও তার প্রতি উদ্বুদ্ধ করতে কুরআন মাজীদের বর্ণনাভঙ্গি নানারূপ ধারণ করেছে। এখানে তার কিছু তুলে ধরা হ'ল।

(ক) আল্লাহ কর্তৃক তাঁর নবীকে তাওয়াক্কুলের আদেশ :

কুরআনের বহু আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বিশেষভাবে তাঁর নবীকে তাঁর উপর তাওয়াক্কুল করার আদেশ দিয়েছেন। যেমন : فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِيْنِ 'অতএব তুমি আল্লাহ্র উপর ভরসা কর। তুমি তো স্পষ্ট সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত' *(নামল ২৭/৭৯)*।

আল্লাহ বলেন, فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ 'অতএব তুমি তাঁর ইবাদত কর ও তাঁর উপরেই ভরসা কর' *(হূদ ১১/১২৩)*। আল্লাহ আরও বলেন, وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِيْ لاَ يَمُوْتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوْبِ عِبَادِهِ خَبِيْرًا- 'আর তুমি ভরসা কর সেই চিরঞ্জীব সত্তার উপর, যাঁর মৃত্যু নেই এবং তুমি তাঁর প্রশংসাসহ পবিত্রতা বর্ণনা কর। বস্তুতঃ জান্নাতী বান্দাদের পাপসমূহের খবর রাখার ব্যাপারে তিনিই যথেষ্ট' *(ফুরক্বান ২৫/৫৮)*।

আল্লাহ বলেন, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ- 'আর আল্লাহ্র রহমতের কারণেই তুমি তাদের প্রতি (অর্থাৎ স্বীয় উম্মতের প্রতি) কোমলহৃদয় হয়েছ। যদি তুমি কর্কশভাষী কঠোর হৃদয়ের হ'তে তাহ'লে তারা তোমার পাশ থেকে সরে যেত। কাজেই তুমি তাদের ক্ষমা করে দাও ও তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং যরূরী বিষয়ে তাদের সাথে পরামর্শ কর। অতঃপর যখন তুমি সংকল্পবদ্ধ হবে, তখন আল্লাহ্র উপর ভরসা কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর উপর ভরসাকারীদের ভালবাসেন' *(আলে ইমরান ৩/১৫৯)*।

মহান আল্লাহ বলেন, فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ- 'এতদসত্ত্বেও যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে বলে দাও, আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তাঁর উপরেই আমি ভরসা করি। আর তিনিই হচ্ছেন মহান আরশের মালিক' *(তওবা ৯/১২৯)*।

১৭. *ইবনু আব্দিল বার্র, বাহজাতুল মাজালিস ওয়া উনসুল মাজালিস, ১/২৬ পৃঃ।*
১৮. *মাজমূ' ফাতাওয়া ৭/১৬।*

Contents

আল্লাহ আরো বলেন, قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ– 'তুমি বল, তিনি তো সেই দয়াময় (আল্লাহ)। আমরা তাঁর উপর ঈমান এনেছি এবং ভরসা করেছি। অতঃপর কারা সুস্পষ্ট ভ্রান্তির মধ্যে ছিল তা অচিরেই তোমরা জানতে পারবে' *(মুলক ৬৭/২৯)*।

আর আল্লাহ কর্তৃক তাঁর নবীকে তাওয়াক্কুল করার হুকুম দেওয়ার অর্থ তাঁর উম্মতকে হুকুম দেওয়া।

(খ) আল্লাহ কর্তৃক তাঁর মুমিন বান্দাদেরকে তাঁর উপর ভরসা করার আদেশ : আল্লাহ তা'আলা তার মুমিন বান্দাদেরকে তাঁর উপর ভরসা করতে আদেশ দিয়েছেন। যেমন তিনি বলেছেন, وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ 'আর আল্লাহ্র উপরেই মুমিনদের ভরসা করা উচিত' *(আলে ইমরান ৩/১২২)*।

(গ) মুমিনরা তাদের রবের উপর 'তাওয়াক্কুলকারী' বিশেষণে বিশেষিত : আল্লাহ্র উপর ভরসা করা দয়াময় আল্লাহ্র বান্দাদের একটি বড় গুণ। এটি তাদের এমন একটি প্রতীক, যা দ্বারা অন্যদের থেকে তাদের পৃথক করা যায়। মুমিনদের জন্য এটি একটি সুস্পষ্ট চিহ্ন। আল্লাহ বলেন, إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ– 'নিশ্চয়ই মুমিন তারাই, যখন তাদের নিকট আল্লাহকে স্মরণ করা হয়, তখন তাদের অন্তর সমূহ ভয়ে কেঁপে ওঠে। আর যখন তাদের উপর তাঁর আয়াতসমূহ পাঠ করা হয়, তখন তাদের ঈমান বৃদ্ধি পায় এবং তারা তাদের প্রতিপালকের উপর ভরসা করে' *(আনফাল ৮/২)*।

'তারা তাদের মালিকের উপরই ভরসা করে'- বাক্যটির মর্মার্থ হ'ল- তারা আল্লাহকে ছাড়া কাউকে আকাঙ্ক্ষা করে না; তিনি ছাড়া কেউ তাদের উদ্দেশ্য নয়; তারা তাঁর নিকট ছাড়া কোথাও আশ্রয় নেয় না; তারা কেবলই তাঁর নিকট তাদের প্রয়োজন পূরণের আবেদন জানায়; তারা তাকে ছাড়া আর কারো প্রতি আকর্ষণ বোধ করে না। তারা জানে যে, তিনি যা চান তাই হয় এবং তিনি যা চান না তা হয় না। তিনিই ক্ষমতার একচ্ছত্র প্রয়োগকারী, তাঁর কোন শরীক নেই, তাঁর হুকুম রদ করার শক্তিও কারো নেই এবং তিনি দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী। আয়াতের এরূপ ব্যাখ্যাই দিয়েছেন হাফেয ইবনু কাছীর (রহঃ)।[১৯]

(ঘ) নবীগণের তাওয়াক্কুলের কতিপয় উদাহরণ :

আল্লাহ তা'আলা ইবরাহীম (আঃ) ও তাঁর সাথীদেরকে আদর্শ ও অনুসরণীয় ব্যক্তিত্ব হিসাবে গ্রহণের জন্য আমাদেরকে আদেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন, قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِيْ إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ 'নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য ইবরাহীম ও তার সাথীদের মধ্যে রয়েছে সুন্দরতম আদর্শ' *(মুমতাহিনা ৬০/৪)*।

আল্লাহ জাল্লা শানুহু আমাদের নিকট তাদের সম্পর্কে বলেছেন যে, তারা তাদের ঈমানী শক্তির কারণে বলেছিল, رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ 'হে আমাদের মালিক! আমরা তোমারই উপর ভরসা করেছি, তোমার দিকে প্রত্যাবর্তন করছি। আর তোমার নিকটেই তো প্রত্যাবর্তন স্থল' *(মুমতাহিনা ৬০/৪)*। অর্থাৎ আমাদের যাবতীয় কাজে আমরা তোমারই উপর ভরসা করি এবং তোমারই নিকট সব কাজ সমর্পণ ও সোপর্দ করেছি। এমনিভাবে তারা আল্লাহ্র উপর ভরসা করেছিলেন এবং যাবতীয় কাজ আল্লাহ্র কাছে নিঃশর্তভাবে সমর্পণ করেছিলেন। জীবনের সকল ক্ষেত্রে তারা তাওয়াক্কুলকে সাথী করে নিয়েছিলেন। দয়াময় আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে তারা তাদের সকল প্রচেষ্টা ব্যয় করেছিলেন।

ইবরাহীম (আঃ)-কে তো তাঁর জাতি পুড়িয়ে মারার ব্যবস্থা করেছিল। এজন্য তারা প্রচুর জ্বালানী কাঠ যোগাড় করেছিল। সুদ্দী বলেন, সে সময় একজন মহিলা অসুস্থ হ'লে সে মানত করত যদি সে সুস্থ হয়ে ওঠে তাহ'লে ইবরাহীমকে পোড়ানোর জন্য এক বোঝা কাঠ সে বয়ে দিয়ে আসবে।[২০]

তারপর তারা ইবরাহীম (আঃ)-কে পোড়ানোর জন্য বড় একটা গর্ত খুঁড়ে তাতে কাঠ জমা করে আগুন ধরিয়ে দেয়। আগুন যখন খুব উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এবং তার লেলিহান শিখা বিস্তার করতে থাকে, তখন মিনজানীক নামক এক ধরনের যন্ত্রে করে তারা ইবরাহীম (আঃ)-কে ঐ আগুনে ফেলে দেয়। ফেলে দেওয়ার সময় ইবরাহীম (আঃ) বলেছিলেন, حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ 'আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। তিনি কতই না সুন্দর তত্ত্বাবধায়ক'! *(আলে ইমরান ৩/১৭৩)*। যেমন ইবনু আব্বাস (রাঃ) বর্ণিত হাদীছে এসেছে তিনি বলেন, 'ইবরাহীম (আঃ)-কে যখন আগুনে ফেলা হয় তখন তিনি বলেছিলেন حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ 'আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। তিনি কতই না উত্তম কর্মবিধায়ক'।[২১]

মূসা (আঃ)-কে দেখুন, কিভাবে তিনি আল্লাহ্র উপর ভরসা করেছিলেন এবং তাঁর জাতিকে তার উপর ভরসা করতে হুকুম দিয়েছিলেন। আল্লাহ বলেন, وَقَالَ مُوسَى يَا قَوْمِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوْا إِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِيْنَ– 'আর মূসা (তার নির্যাতিত কওমকে সান্ত্বনা দিয়ে) বলল, হে আমার কওম! যদি তোমরা (সত্যিকার অর্থে) আল্লাহ্র উপর ঈমান এনে থাক, তাহ'লে তাঁর উপরেই তোমরা ভরসা কর। যদি তোমরা আত্মসমর্পণকারী হয়ে থাক' *(ইউনুস ১০/৮৪)*।

শায়খ সুলায়মান বিন আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব (রহঃ) বলেন, আয়াতের অর্থ এই যে, মূসা (আঃ) তাঁর উম্মাতকে আল্লাহ কর্তৃক তাদের জন্য নির্ধারিত পবিত্র ভূমিতে প্রবেশের আদেশ দিয়েছিলেন। তিনি তাদের বলেছিলেন, তারা যেন স্বৈরাচারীদের ভয়ে পিছটান না দেয়; বরং সামনে এগিয়ে যায়, তাদের ভয় না করে, তাদের দেখে তটস্থ ও সন্ত্রস্ত না হয়। প্রতিপক্ষকে পরাজিত করতে তারা

১৯. *তাফসীর ইবনে কাছীর ২/৩৭৯।*

২০. *ঐ, ৩/২৭৪।*
২১. *ছহীহ বুখারী হা/৪৫৬৩।*

Contents

যেন আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করে। তারা যেন বিশ্বাস রাখে যে, আল্লাহ তাদের সাথে কৃত অঙ্গীকার সত্যি-সত্যিই বাস্তবায়ন করবেন, যদি তারা মুমিন হয়।[22]

উম্মতে মুহাম্মাদীর জন্য নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) ও তাঁর ছাহাবীগণের মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে। ওহোদ যুদ্ধের প্রাক্কালের ঘটনা সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, اَلَّذِيْنَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوْا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيْمَانًا وَقَالُوْا حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ– 'যাদেরকে লোকেরা বলেছিল, নিশ্চয়ই তারা (কুরায়েশ বাহিনী) তোমাদের বিরুদ্ধে সমবেত হয়েছে। অতএব তোমরা তাদের থেকে ভীত হও। একথা শুনে তাদের ঈমান আরও বৃদ্ধি পায় এবং তারা বলে 'আমাদের জন্য আল্লাহ যথেষ্ট। তিনি কতই না উত্তম তত্ত্বাবধায়ক'! *(আলে ইমরান ৩/১৭৩)*।

ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ 'আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট। তিনি কতই না উত্তম কর্ম বিধায়ক'- বাক্যটি ইবরাহীম (আঃ)-কে যখন আগুনে নিক্ষেপ করা হয়েছিল তখন তিনি বলেছিলেন, আর মুহাম্মাদ (ছাঃ) এটি বলেছিলেন যখন কাফিররা বলেছিল, 'যাদেরকে লোকেরা বলেছিল, নিশ্চয়ই তারা (কুরায়েশ বাহিনী) তোমাদের বিরুদ্ধে সমবেত হয়েছে। অতএব তোমরা তাদের থেকে ভীত হও। একথা শুনে তাদের ঈমান আরও বৃদ্ধি পায় এবং তারা বলে, 'আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। তিনি কতই না উত্তম তত্ত্বাবধায়ক'! *(আলে ইমরান ৩/১৭৩)*।[23]

সুতরাং যখন ইসলাম বিরোধীরা মুসলমানদের হুমকি দেয় এবং শত্রুপক্ষের জনশক্তি ও অস্ত্র শক্তির ভয় দেখায়, তখন এই তাওয়াক্কুলই মুমিনদের একমাত্র অস্ত্র হয়ে দাঁড়ায়। কবি বলেন,

هو القريب المجيب المستغاث به + قل حسبي الله معبودي ومتّكلي

খুব নিকটে আছেন, তিনি দো'আ কবুলকারী,
সুখে-দুঃখে তাঁরই কাছে এস আরয করি।
বল সবে আমার তরে আল্লাহ যথেষ্ট,
মা'বূদ আমার, ভরসা আমার সকলের ইষ্ট। *[চলবে]*

২২. *তায়সীরুল আযীযিল হামীদ, পৃঃ ৪৩৮।*

২৩. *বুখারী হা/৪৫৬৩।*

আশূরায়ে মুহাররম

আত-তাহরীক ডেস্ক

ফযীলত :

১. আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللهِ الْمُحَرَّمُ وَأَفْضَلُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الْفَرِيْضَةِ صَلاَةُ اللَّيْلِ– 'রামাযানের পরে সর্বোত্তম ছিয়াম হ'ল মুহাররম মাসের ছিয়াম অর্থাৎ আশূরার ছিয়াম এবং ফরয ছালাতের পরে সর্বোত্তম ছালাত হ'ল রাতের নফল ছালাত' অর্থাৎ তাহাজ্জুদের ছালাত।[১]

২. আবু ক্বাতাদাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, وَصِيَامُ يَوْمِ عَاشُوْرَاءَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُّكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِىْ قَبْلَهُ، 'আশূরা বা ১০ই মুহাররমের ছিয়াম আমি আশা করি আল্লাহ্‌র নিকটে বান্দার বিগত এক বছরের (ছগীরা) গোনাহের কাফফারা হিসাবে গণ্য হবে'।[২]

৩. আয়েশা (রাঃ) বলেন, 'জাহেলী যুগে কুরায়েশগণ আশূরার ছিয়াম পালন করত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)ও তা পালন করতেন। মদীনায় হিজরতের পরেও তিনি পালন করেছেন এবং লোকদেরকে তা পালন করতে বলেছেন। কিন্তু (২য় হিজরী সনে) যখন রামাযান মাসের ছিয়াম ফরয হ'ল, তখন তিনি বললেন, যে ব্যক্তি ইচ্ছা কর আশূরার ছিয়াম পালন কর এবং যে ব্যক্তি ইচ্ছা কর তা পরিত্যাগ কর'।[৩]

৪. মু'আবিয়া বিন আবু সুফিয়ান (রাঃ) মদীনার মসজিদে নববীতে খুৎবা দানকালে বলেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, إِنَّ هَذَا يَوْمُ عَاشُوْرَاءَ وَلَمْ يَكْتُبِ اللهُ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ وَأَنَا صَائِمٌ فَمَنْ شَاءَ فَلْيَصُمْ وَمَنْ شَآءَ فَلْيُفْطِرْ– 'আজ আশূরার দিন। এদিনের ছিয়াম তোমাদের উপরে আল্লাহ ফরয করেননি। তবে আমি ছিয়াম রেখেছি। এক্ষণে তোমাদের মধ্যে যে ইচ্ছা কর ছিয়াম পালন কর, যে ইচ্ছা কর পরিত্যাগ কর'।[৪]

৫. (ক) আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মদীনায় হিজরত করে ইহুদীদেরকে আশূরার ছিয়াম রাখতে দেখে কারণ জিজ্ঞেস করলে তারা বলেন, 'এটি একটি মহান দিন। এদিনে আল্লাহ পাক মূসা (আঃ) ও তাঁর কওমকে নাজাত দিয়েছিলেন এবং ফেরা'আউন ও তার লোকদের ডুবিয়ে মেরেছিলেন। তার শুকরিয়া হিসাবে মূসা (আঃ) এ দিন ছিয়াম পালন করেছেন। অতএব আমরাও এ দিন ছিয়াম পালন করি। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তোমাদের চাইতে আমরাই মূসা (আঃ)-এর (আদর্শের) অধিক হকদার ও অধিক দাবীদার। অতঃপর তিনি ছিয়াম রাখেন ও সকলকে রাখতে বলেন' (যা পূর্ব থেকেই তাঁর রাখার অভ্যাস ছিল)।[৫]

(খ) আবু মূসা আশ'আরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত হয়েছে যে, আশূরার দিনকে ইহুদীরা ঈদের দিন হিসাবে মান্য করত। এ দিন তারা তাদের স্ত্রীদের অলংকার ও উত্তম পোষাকাদি পরিধান করাতো'।[৬]

(গ) ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে অন্য বর্ণনায় এসেছে যে, লোকেরা বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! ইহুদী ও নাছারাগণ ১০ই মুহাররম আশূরার দিনটিকে সম্মান করে। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, 'আগামী বছর বেঁচে থাকলে ইনশাআল্লাহ আমরা ৯ই মুহাররম সহ ছিয়াম রাখব'। রাবী বলেন, কিন্তু পরের বছর মুহাররম আসার আগেই তাঁর মৃত্যু হয়ে যায়।[৭]

৬. আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত অন্য এক হাদীছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, صُوْمُوْا يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ وَخَالِفُوا الْيَهُوْدَ وَصُوْمُوْا قَبْلَهُ يَوْمًا أَوْ بَعْدَهُ يَوْمًا– 'তোমরা আশূরার দিন ছিয়াম রাখ এবং ইহুদীদের খেলাফ কর। তোমরা আশূরার সাথে তার পূর্বে একদিন বা পরে একদিন ছিয়াম পালন কর'।[৮]

উপরোক্ত হাদীছ সমূহ পর্যালোচনা করলে কয়েকটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে উঠে। যেমন-

(১) আশূরার ছিয়াম ফের'আউনের কবল থেকে নাজাতে মূসার (আঃ) শুকরিয়া হিসাবে পালিত হয়।

(২) এই ছিয়াম মূসা, ঈসা ও মুহাম্মাদী শরী'আতে চালু ছিল। আইয়ামে জাহেলিয়াতেও আশূরার ছিয়াম পালিত হ'ত।

(৩) ২য় হিজরীতে রামাযানের ছিয়াম ফরয হওয়ার আগ পর্যন্ত এই ছিয়াম সকল মুসলমানের জন্য পালিত নিয়মিত ছিয়াম হিসাবে গণ্য হ'ত।

(৪) রামাযানের ছিয়াম ফরয হওয়ার পরে এই ছিয়াম ঐচ্ছিক ছিয়ামে পরিণত হয়। তবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিয়মিত এই ছিয়াম ঐচ্ছিক হিসাবেই পালন করতেন। এমনকি মৃত্যুর বছরেও পালন করতে চেয়েছিলেন।

(৫) এই ছিয়ামের ফযীলত হিসাবে বিগত এক বছরের গোনাহ মাফের কথা বলা হয়েছে। এত বেশী নেকী আরাফার দিনের নফল ছিয়াম ব্যতীত অন্য কোন নফল ছিয়ামে নেই।

---

১. *মুসলিম, মিশকাত হা/২০৩৯ 'নফল ছিয়াম' অনুচ্ছেদ; ঐ, বঙ্গানুবাদ হা/১৯৪১।*
২. *মুসলিম, মিশকাত হা/২০৪৪; ঐ, বঙ্গানুবাদ হা/১৯৪৬।*
৩. বুখারী ফাৎহুল বারী সহ (কায়রোঃ ১৪০৭/১৯৮৭), হা/২০০২ 'ছাওম' অধ্যায়।
৪. *বুখারী, ফাৎহসহ হা/২০০৩; মুসলিম, হা/১১২৯ 'ছিয়াম' অধ্যায়।*
৫. *মুসলিম হা/১১৩০।*
৬. *মুসলিম হা/১১৩১; বুখারী ফাৎহ সহ হা/২০০৪।*
৭. *মুসলিম হা/১১৩৪।*
৮. *বায়হাক্বী ৪র্থ খণ্ড ২৮৭ পৃঃ। বর্ণিত অত্র রেওয়ায়াতটি 'মারফূ' হিসাবে ছহীহ নয়, তবে 'মাওকূফ' হিসাবে 'ছহীহ'। দ্রঃ হাশিয়া ছহীহ ইবনু খুযায়মা হা/২০৯৫, ২/২৯০ পৃঃ। অতএব ৯, ১০ বা ১০, ১১ দু'দিন ছিয়াম রাখা উচিত। তবে ৯, ১০ দু'দিন রাখাই সর্বোত্তম।*

(৬) আশূরার ছিয়ামের সাথে হুসায়েন বিন আলী (রাঃ)-এর জন্ম বা মৃত্যুর কোন সম্পর্ক নেই। হুসায়েন (রাঃ)-এর জন্ম মদীনায় ৪র্থ হিজরীতে এবং মৃত্যু ইরাকের কূফা নগরীর নিকটবর্তী কারবালায় ৬১ হিজরীতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মৃত্যুর ৫০ বছর পরে হয়।[৯] মোটকথা আশূরায়ে মুহাররমে এক বা দু'দিন স্রেফ নফল ছিয়াম ব্যতীত আর কিছুই করার নেই। শাহাদতে হুসায়েনের নিয়তে ছিয়াম পালন করলে ছওয়াব পাওয়া যাবে না। কারণ কারবালার ঘটনার ৫০ বছর পূর্বেই ইসলাম পরিপূর্ণতা লাভ করেছে এবং অহি-র আগমন বন্ধ হয়ে গেছে।

আশূরার বিদ'আত সমূহ :

আশূরায়ে মুহাররম আমাদের দেশে শোকের মাস হিসাবে পালিত হয়। শী'আ, সুন্নী সকলে মিলে অগণিত শিরক ও বিদ'আতে লিপ্ত হয়। কোটি কোটি টাকার অপচয় হয় বিভিন্ন অনুষ্ঠানের নামে। সরকারী ছুটি ঘোষিত হয় ও সরকারীভাবে বিভিন্ন অনুষ্ঠানাদি পালিত হয়। হুসায়েনের ভূয়া কবর তৈরী করে রাস্তায় তা'যিয়া বা শোক মিছিল করা হয়। ঐ ভূয়া কবরে হুসায়েনের রূহ হাযির হয় ধারণা করে তাকে সালাম করা হয়। তার সামনে মাথা ঝুকানো হয়। সেখানে সিজদা করা হয়, মনোবাঞ্ছা পূরণ করার জন্য প্রার্থনা করা হয়। মিথ্যা শোক প্রদর্শন করে বুক চাপড়ানো হয়, বুকের কাপড় ছিঁড়ে ফেলা হয়। 'হায় হোসেন' 'হায় হোসেন' বলে মাতম করা হয়। রক্তের নামে লাল রং ছিটানো হয়। রাস্তা-ঘাট রং-বেরং সাজে সাজানো হয়। লাঠি-তীর-বলম নিয়ে যুদ্ধের মহড়া দেওয়া হয়। হুসায়েনের নামে কেক ও পাউরুটি বানিয়ে 'বরকতের পিঠা' বলে বেশী দামে বিক্রি করা হয়। হুসায়েনের নামে 'মোরগ' পুকুরে ছুঁড়ে ফেলে যুবক-যুবতীরা পুকুরে ঝাঁপিয়ে পড়ে ঐ 'বরকতের মোরগ' ধরার প্রতিযোগিতায় মেতে ওঠে। সুসজ্জিত অশ্বারোহী দল মিছিল করে কারবালা যুদ্ধের মহড়া দেয়। কালো পোষাক পরিধান বা কালো ব্যাজ ধারণ করা হয় ইত্যাদি। এমনকি অনেকে শোকের মাস ভেবে এই মাসে বিবাহ-শাদী করা অন্যায় মনে করে থাকেন। ঐ দিন অনেকে পানি পান করা এমনকি শিশুকে দুধ পান করানোও অন্যায় ভাবেন।

অপরদিকে উগ্র শী'আরা কোন কোন 'ইমাম বাড়া'তে আয়েশা (রাঃ)-এর নামে বেঁধে রাখা একটি বকরীকে লাঠিপেটা করে ও অস্ত্রাঘাতে রক্তাক্ত করে বদলা নেয় ও উলাসে ফেটে পড়ে। তাদের ধারণা মতে আয়েশা (রাঃ)-এর পরামর্শক্রমেই আবুবকর (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর অসুখের সময় জামা'আতে ইমামতি করেছিলেন ও পরে খলীফা নির্বাচিত হয়েছিলেন। সেকারণ আলী (রাঃ) খলীফা হ'তে পারেননি (নাঊযুবিল্লাহ)। ওমর, ওছমান, মু'আবিয়া, মুগীরা বিন শো'বা (রাঃ) প্রমুখ জলীলুল ক্বদর ছাহাবীকে এ সময় বিভিন্নভাবে গালি দেওয়া হয়। এ ছাড়াও রেডিও-টিভি, পত্র-পত্রিকা, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় সমূহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে একথা বুঝাতে চেষ্টা করে যে, আশূরায়ে মুহাররমের মূল বিষয় হ'ল শাহাদাতে হুসায়েন (রাঃ) বা কারবালার মর্মান্তিক ঘটনা। চেষ্টা করা হয় এটাকে 'হক্ব ও বাতিলের' লড়াই হিসাবে প্রমাণ করতে। চেষ্টা করা হয় হুসায়েনকে 'মা'ছূম' ও ইয়াযীদকে 'মাল'ঊন' প্রমাণ করতে। অথচ প্রকৃত সত্য এসব থেকে অনেক দূরে।

আশূরা উপলক্ষে প্রচলিত উপরোক্ত বিদ'আতী অনুষ্ঠানাদির কোন অস্তিত্ব এবং অশুদ্ধ আক্বীদা সমূহের কোন প্রমাণ ছাহাবায়ে কেরামের যুগে পাওয়া যায় না।

এতদ্ব্যতীত কোনরূপ শোকগাথা বা মর্সিয়া অনুষ্ঠান বা শোক মিছিল ইসলামী শরী'আতের পরিপন্থী। কোন কবর বা সমাধিসৌধ, শহীদ মিনার বা স্মৃতি সৌধ, শিখা অনির্বাণ বা শিখা চিরন্তন ইত্যাদিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করাও একই পর্যায়ে পড়ে।

অনুরূপভাবে সবচেয়ে বড় কবীরা গোনাহ হ'ল ছাহাবায়ে কেরামকে গালি দেওয়া। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, لاَتَسُبُّوا أَصْحَابِى فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلاَنَصِيْفَهُ، 'তোমরা আমার ছাহাবীগণকে গালি দিয়ো না। কেননা (তাঁরা এমন উচ্চ মর্যাদার অধিকারী যে,) তোমাদের কেউ যদি ওহোদ পাহাড় পরিমাণ সোনাও আল্লাহ্‌র রাস্তায় ব্যয় করে, তবুও তাঁদের এক মুদ বা অর্ধ মুদ অর্থাৎ সিকি ছা' বা তার অর্ধেক পরিমাণ (যব খরচ)-এর সমান ছওয়াব পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে না'।[১০]

শোকের নামে দিবস পালন করা, বুক চাপড়ানো ও মাতম করা ইসলামী রীতি নয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُوْدَ وَشَقَّ الْجُيُوْبَ وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ– 'ঐ ব্যক্তি আমাদের দলভুক্ত নয়, যে ব্যক্তি শোকে নিজ মুখে মারে, কাপড় ছিঁড়ে ও জাহেলী যুগের ন্যায় মাতম করে'।[১১]

অন্য হাদীছে এসেছে যে, 'আমি ঐ ব্যক্তি হ'তে দায়িত্ব মুক্ত, যে ব্যক্তি শোকে মাথা মুণ্ডন করে, উচ্চৈঃস্বরে কাঁদে ও কাপড় ছিঁড়ে'।[১২]

অধিকন্তু ঐসব শোক সভা বা শোক মিছিলে বাড়াবাড়ি করে সৃষ্টি ও সৃষ্টিকর্তার পার্থক্য মিটিয়ে দিয়ে হুসায়েনের কবরে রূহের আগমন কল্পনা করা, সেখানে সিজদা করা, মাথা ঝুঁকানো, প্রার্থনা নিবেদন করা ইত্যাদি পরিষ্কার শিরক। আল্লাহ আমাদের হেফাযত করুন- আমীন!!

৯. *ইবনু হাজার, আল-ইছাবাহ আল-ইস্তী'আব সহ (কায়রোঃ মাকতাবা ইবনে তায়মিয়াহ, ১ম সংস্করণ, ১৩৮৯/১৯৬৯), ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৪৮, ২৫৩।*

১০. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৯৯৮ 'ছাহাবীগণের মর্যাদা' অনুচ্ছেদ; ঐ, বঙ্গানুবাদ হা/৫৭৫৪।

১১. *বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/১৭২৫ 'জানাযা' অধ্যায়।*

১২. *বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/১৭২৬।*

বিজ্ঞান ও ধর্মের কি একে অপরকে প্রয়োজন?

*প্রকৌশলী মুহাম্মাদ আরীফুল ইসলাম**

প্রারম্ভিকা :

বিজ্ঞান ও ধর্ম এ দু'টি কি পরস্পর বিরোধী, না-কি একে অপরের পরিপূরক? এটা একটা কঠিন প্রশ্ন, তাই নয় কি? তবে হ্যাঁ, শুরুটাই হ্যাঁ দিয়ে করা যাক। ইসলাম একটি বিজ্ঞানসম্মত ধর্ম এবং এ ধর্মের মহাগ্রন্থ আল-কুরআনও বিজ্ঞানময়। ইসলাম শুধু কিছু আচারসর্বস্ব ধর্ম নয়, বরং একটি পরিপূর্ণ জীবন বিধান (Complete code of Life)। এ জীবনের পালনীয়/নিষিদ্ধ যাবতীয় বিষয়াদি সর্বশক্তিমান, সৃষ্টিকর্তা, সকল বিজ্ঞানীর উর্ধ্বে মহাবিজ্ঞানী মহান আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত ও শেখানো এবং তাঁর প্রেরিত রাসূল মুহাম্মাদ (ছাঃ) কর্তৃক শেখানো ও প্রচারকৃত। আধুনিক শিক্ষিত নাস্তিক্যবাদী বা অন্যান্য মতবাদের যেকোন ব্যক্তি বিজ্ঞানের সাথে ধর্মের প্রয়োজনীয়তা যতই অস্বীকার করুক না কেন, ইসলাম ধর্মের বিধান অনুযায়ী আমাদের দৈনন্দিন জীবনে পালনীয় ওযূ-গোসল, পোশাক-পরিচ্ছদ, খাদ্য-পানীয়, আচার-ব্যবহার, কেনা-বেচা ইত্যাদির সবকিছুই বিজ্ঞানসম্মত এবং বৈজ্ঞানিকভাবে এসবের উপকারিতা প্রমাণিত। যেকোন শিক্ষিত ব্যক্তি কুরআন মাজীদ ও কুতুবে সিত্তাহ (বুখারী, মুসলিম, আবুদাঊদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ) খুলে উল্লিখিত বিষয়গুলি অধ্যায় ও বিষয়বস্তু অনুসারে বিশ্লেষণ করে দেখতে পারেন।

জীবনের অন্যান্য গণ্ডী তথা পরিবার-সমাজ-রাষ্ট্র, আন্তর্জাতিকতা ইত্যাদিও মহান আল্লাহ্র আইন অনুযায়ী এবং নবী করীম (ছাঃ)-এর বিদায় হজ্জের ভাষণ অনুযায়ী বৈজ্ঞানিকভাবে বিধিবদ্ধ এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গাণিতিক। আমরা স্বীকার করি বা না-ই করি, এসব গণ্ডীর যেকোনটির (পরিবার, সমাজ...) যেকোন উপাদান নিয়ে উদ্ভাবনী চিন্তাশীলগণ গাণিতিক আরোহ (Mathematical Induction) পদ্ধতিতে চিন্তা ও বিশ্লেষণ করে দেখতে পারেন যে, আল্লাহ্র নির্ধারিত আইনের বাইরে গেলে ঐ উপাদানটা আর বিজ্ঞানসম্মত থাকে কি-না?

আরোহের ভিত্তি কি তাও বিশ্লেষণ করে দেখতে হবে। শুধু গাণিতিক প্রতীক নয়, ভাষা দিয়ে চিন্তা করতে বলছি এজন্য যে, স্বয়ং মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআন নিয়ে চিন্তা করতে বলেছেন। কারণ এর মধ্যে চিন্তাশীলদের জন্য উপাদান-উপকরণ রয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন, أَفَلاَ يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللهِ لَوَجَدُوْا فِيْهِ اخْتِلاَفًا كَثِيْرًا– 'তারা কেন কুরআন নিয়ে গবেষণা করে না? যদি এটা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারু নিকট থেকে আসত, তাহ'লে তারা এর মধ্যে বহু গরমিল দেখতে পেত' *(নিসা ৪/৮২)*। এর সাথে দেখুন সূরা ইউনুস ১০১ (১ম অংশ)। কুরআন জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা দেয়ার জন্য *(জুম'আ ২)*, এটি জ্ঞানীদের জন্য সুস্পষ্ট নিদর্শন স্বরূপ *(আনকাবূত ২৯/৪৯)* এবং কুরআন বুদ্ধিমানদের জন্য উপদেশস্বরূপ *(গাফির/মুমিন ৪০/৫৪; ছোয়াদ ৩৮/২৯)*।

বিজ্ঞান কি ও কেন?

সাদামাটা উত্তর হ'ল- বিজ্ঞান হচ্ছে এমনই কিছু যার সাহায্যে একরকম Generalized বা 'সর্বক্ষেত্রে সত্যি আর সত্যি হ'তে বাধ্য' জ্ঞান পাওয়া যায়। একে সাদামাটা জবাব বলছি কেন? কেননা শুধু এটুকু বললেই বিজ্ঞানের স্বরূপকে পুরোপুরি বুঝানো হয় না, আরো অনেক কথা বাকী থাকে।

প্রথমত : বিজ্ঞান জ্ঞান দিচ্ছে এবং সে জ্ঞানটা সত্যি, নির্ভুল। কার জ্ঞান? কী সম্বন্ধে জ্ঞান? দুনিয়ার জ্ঞান। দুনিয়া সম্বন্ধে জ্ঞান। দুনিয়া ছাড়া আমরা আর কী সম্বন্ধে জ্ঞান পেতে পারি? যাকিছু জানতে চাই, বুঝতে চাই, তা সবই তো এই দুনিয়ার জিনিস, সবই দুনিয়ায় রয়েছে। মহাকাশের মধ্যে ছড়ানো গ্রহ-নক্ষত্র, নীহারিকা থেকে শুরু করে পৃথিবীর এতটুকু ধূলিকণা পর্যন্ত সবকিছুই এই দুনিয়ার জিনিস, দুনিয়ার মধ্যে রয়েছে।

'বিজ্ঞান' শব্দের 'বি' উপসর্গ বাদ দিলে আসে জ্ঞানের কথা। মানুষ ইন্দ্রিয় (চোখ, কান, নাক...) ছাড়াও অনুমানের সাহায্যে (মস্তিষ্ক) জ্ঞান পেয়ে থাকে এবং অনুমানের আসল ভিত্তি হ'ল এমন কোন জ্ঞান যা সব ক্ষেত্রে সত্যি এবং সত্যি হ'তে বাধ্য। যেমন Mathematics- এ কোন থিওরি Generalized করতে হ'লে প্রথমে সরলতম (Simplest) ক্ষেত্রে তা প্রমাণ করতে বা সত্য দেখাতে হয় এবং পরে ধারাবাহিকভাবে n শক্তির জন্য, $n=1, 2, 3...$ এভাবে সত্য পাওয়া গেলে তাকে Generalized Method of Induction বলা হয়।

জ্ঞানের সর্বশ্রেষ্ঠ মাধ্যম অহী :

এই মাটির পৃথিবীতে মানবীয় জ্ঞান ব্যতীত আরও একটি জ্ঞানের মাধ্যম আছে। যার নাম অহী। অহী হচ্ছে আল্লাহ প্রদত্ত। অহী মানবীয় জ্ঞান নয়, এটা আল্লাহ প্রদত্ত বলেই এতে কোন ভুল, কোন বিভ্রান্তি, কোন অসঙ্গতি, কোন প্রকার পক্ষপাতিত্ব ও সীমাবদ্ধতা নেই। এ জ্ঞান সর্বপ্রকারের মানবিক দুর্বলতা থেকে মুক্ত *(বাক্বারাহ ২/২)*। এ জ্ঞান একদেশদর্শিতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। এ জ্ঞান অভ্রান্ত, অখণ্ডনীয়, সর্বকালীন ও সার্বজনীন, সর্বদেশের গণমানুষের মানবিক মুক্তি ও কল্যাণের একমাত্র সঠিক পথ। স্থান, কাল, পাত্র, পরিবেশ এবং পরিস্থিতি বদলে গেলেও এ জ্ঞান কখনো অচল হয় না।

চিন্তা করার জন্য তা-ই সবচেয়ে ভালটার রেফারেন্স দেয়া হয়েছে। আবার যদি অন্য ধর্মের কোন ব্যক্তি তার গ্রন্থকে অহী হিসাবে দাবী করে? তখনও কুরআনের শ্রেষ্ঠত্বের জন্য যাচাই (Scientific Way) করে দেখতে হবে *(নিসা ৪/৮২)*।

মানবীয় জ্ঞানের উৎস :

মানবীয় জ্ঞানের উৎস হচ্ছে তিনটি- অভিজ্ঞতা, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য শক্তি। অভিজ্ঞতা হ'ল মানবীয় জ্ঞানের অন্যতম উৎস। বলা হয়ে থাকে, অভিজ্ঞতাই জ্ঞান। আজকের বিস্ময়কর মানব সভ্যতা বহুলাংশে অভিজ্ঞতারই ফসল। এ অভিজ্ঞতা প্রসূত জ্ঞানের একটি সীমাবদ্ধতা আছে। মানবীয় অভিজ্ঞতা কোন একক সত্যের দাবী করতে পারে না। স্থান, কাল, পাত্রভেদে এর ভিন্ন ভিন্ন রূপ হয়ে থাকে। মানবীয় অভিজ্ঞতায় অনেক সময় ভুল-ভ্রান্তি থাকে। এছাড়া দেশ, কাল ও পরিবেশ-পরিস্থিতি বদলে যাবার সাথে সাথে মানবীয় জ্ঞান অচল মুদ্রায় পরিণত হয়। সে অভিজ্ঞতা ব্যক্তি, দল, জাতি বা জাতীয় সংসদের যারই হোক না কেন। যার ফলে জাতীয় সংসদে রচিত আইন ও সংবিধানের সংশোধনী আনতে হয়। কাজেই অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান চূড়ান্ত ও অভ্রান্ত নয়।

মানবীয় জ্ঞানের দ্বিতীয় উৎস হ'ল ইন্দ্রিয়শক্তি। এর মাধ্যমে মানুষ অনেক জ্ঞান লাভ করতে পারে। এই ইন্দ্রিয় শক্তির পরিধি ও ক্ষমতার মাঝে একটা সীমাবদ্ধতা আছে। এছাড়া অনিবার্য কোন কারণেও মাধ্যমটির বিকৃতি ঘটতে পারে। যেমন- দেহে জ্বর উঠলে মিষ্টি লাগে তেতো, সর্দি হ'লে নাকে কোন গন্ধ পাওয়া যায় না, জণ্ডিস হ'লে রোগী চারিদিক হলুদ দেখে (চোখ)। কাজেই ইন্দ্রিয় শক্তিও নির্ভুল জ্ঞানের মাধ্যম নয়।

মানবীয় জ্ঞানের তৃতীয় উৎস হ'ল মানুষের বুদ্ধি। তবে এ মাধ্যমটিরও সীমাবদ্ধতা আছে। সীমার বাইরে এর কোন ক্ষমতা নেই। মানবীয় বুদ্ধি সবার সমান নয়। আর মানবীয় বুদ্ধি কোন একক সত্যের দাবী করতে পারে না। এছাড়া অনেক কারণে মানবীয় বুদ্ধি লোপ পেতে পারে (শরীর বৃত্তীয় কারণ, বয়স... ইত্যাদি)।

* *টাঙ্গাইল।*

বস্তুতঃ মানবীয় জ্ঞানের প্রতিটি মাধ্যমে দুর্বলতা ও সীমাবদ্ধতা আছে। অভিজ্ঞতার দ্বারা যে জ্ঞান অর্জন করা যায়, তা ইন্দ্রিয় শক্তির দ্বারা অর্জন করা যায় না। বুদ্ধি দিয়ে যে জ্ঞান অর্জন করা যায়, তা ইন্দ্রিয় শক্তি ও অভিজ্ঞতা দিয়ে অর্জন করা যায় না। যেমন একটি আম মিষ্টি না টক, তা বুদ্ধি বা অভিজ্ঞতা দিয়ে জানা যায় না। এ জ্ঞান দান করে ইন্দ্রিয় শক্তি। কোনটা ভাল, কোনটি মন্দ, কি করণীয়, কি বর্জনীয় তা দান করতে পারে মানবীয় বুদ্ধি। এটা ইন্দ্রিয় শক্তি দিয়ে পারে না। অতীত সম্পর্কে কোন ধারণা বা বুদ্ধি ইন্দ্রিয় শক্তি দিতে পারে না। তা দিতে পারে মানবীয় অভিজ্ঞতা।

আসলে মানবীয় জ্ঞানে রয়েছে অনেক ভুল, বিভ্রান্তি ও সীমাবদ্ধতা। এর মাধ্যমে যে জ্ঞান অর্জিত হয় তাতে আছে বস্তুজগতের সম্পর্ক, স্থান-কাল-পাত্রের প্রভাব। এ জ্ঞান বস্তুজগতের বাইরের কোন মহাসত্যের সন্ধান দিতে পারে না। ফলে দৃশ্যমান বস্তুজগতই মানুষের কাছে একমাত্র সত্য বলে মনে হয়। এর ঊর্ধ্বে অধার্মিক ব্যক্তি মনে করে, কোন শক্তি নেই, সত্য নেই... এভাবে বিশ্বজগতের মাঝে মানুষ নিজেকে স্বাধীন সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী মনে করে। এই চিন্তা চেতনায় মানুষের মনে ভোগবাদের সৃষ্টি হয়। কোন কোন মানুষ বিশ্বাস করে যে, মরণের পর আর কোন জগৎ ও জীবন নেই, এই ইহকালীন জীবনই একমাত্র চরম ও পরম সত্য। এ বিশ্বের বস্তুসামগ্রীর ওপর রয়েছে তার জন্মগত অধিকার। সে স্বীয় শক্তি, মেধা ও বুদ্ধি দ্বারা যত পারবে ভোগ করবে। পৃথিবীটা ভোগের চারণভূমি। সর্বগ্রাসী ভোগের নেশায় মানুষ হয়ে যায় খুনী, ডাকাত, চোর, হাইজ্যাকার, ঘুষখোর, দুর্নীতিবাজ, ধর্ষণকারী, যুদ্ধবাজ, মাতাল, জুয়াড়ী ইত্যাদি। মাটির পৃথিবী মানুষের রক্তের বন্যায় ভেসে যায়, চলে নিহত মানুষের লাশের মিছিল। আর্তমানবতার আর্তনাদে কেঁদে ওঠে আকাশ-বাতাস।

বিজ্ঞানের ধর্মীয় ভিত্তি :

আধুনিক বিজ্ঞানের ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন যারা তাদের মধ্যে বিজ্ঞানী নিউটন ও বয়েল অন্যতম মানবীয় অভিজ্ঞতা এবং আরও নির্দিষ্টভাবে আধুনিক ভৌত বিজ্ঞানসমূহের পরীক্ষামূলক পদ্ধতির মধ্য দিয়ে। যারা তাদের আবিষ্কারের কাহিনীগুলো পড়েছেন, তারা সবাই জানেন। বিজ্ঞানকে জ্ঞানের ভিত্তি ধরে ধর্মীয় বিশ্বাসকে যদি আমরা দর্শন বলি, তবে এদের সম্পর্ক হ'ল বিজ্ঞান এজেণ্ডা নির্ধারণ করে এবং আবিষ্কার করে সেখানে দর্শন ঐ বিজ্ঞানের ফলাফল সমূহকে স্পষ্ট (Clarify) ও ব্যাখ্যা করে। এই অর্থে দর্শন epistemology বা জ্ঞানতত্ত্বের সাথে সম্পর্কিত। এটা অনুসন্ধান করে আমরা কী জানি তা কিভাবে জানব (যাচাই করব)। (এজন্য এতক্ষণ ধরে জ্ঞানের বিভিন্ন উৎস ও অহি-র নির্ভুলতার বর্ণনা দেয়া হ'ল)। এটা (জ্ঞানতত্ত্ব) নিজে কোন আবিষ্কার করবে না। এমনকি নতুন কোন জ্ঞানও উৎপাদন করে না। এটা বিজ্ঞানকে অনুসরণ করে। কিন্তু এর ওপর বিচার করতে বসে না। মেটাফিজিক্স (অধিভৌতবিদ্যা) যা কিনা সার্বিকভাবে বিজ্ঞান এবং নির্দিষ্টভাবে পদার্থ বিজ্ঞানের গণ্ডীর বাইরে কোন বাস্তবতার ধারণা পরিহার করতে হবে। Wittgenstein দেখিয়েছেন, মেটাফিজিক্সের প্রতি অসহিষ্ণুতা এবং মানুষের জীবনযাপনের উপায়গুলোতে (বিভিন্ন ধর্মের লাইফস্টাইল) ধর্মীয় বিশ্বাস কি পার্থক্য সৃষ্টি করে সে বিষয়ে প্রশ্ন রেখেছেন। ধর্মীয় ভাষার অর্থ এই অন্তর্নিহিত তাৎপর্যের ওপর নির্ভর করে না; বরং এটা জনসাধারণের চর্চা/অভ্যাসের ওপর কি ভূমিকা রাখে তারই ওপর নির্ভরশীল। ধর্মের কাজই হ'ল তাদের জীবনপদ্ধতির ওপর যা ধর্মকে গুরুত্ববহ বা তাৎপর্যপূর্ণ করেছে।

আধুনিক যুগে বিজ্ঞান শূন্যের মধ্যে আবির্ভূত হয়নি। কেন অনুমাননির্ভর যুক্তির প্রতি ঝোঁক বা রুচিকে প্রতিস্থাপিত করে আধুনিক পরীক্ষণীয় যুক্তির প্রতি জোর দেয়া হয়েছিল? পৃথিবীর কেমন থাকার কথা/থাকতে হবে- এর ভিত্তিতে কাজ করার চাইতে বিজ্ঞানীগণ অনুসন্ধান শুরু করলেন প্রকৃতপক্ষে এটি (পৃথিবী) কি? তখনই ভৌতজগতের অনিশ্চিত সম্ভাবনার স্বীকৃতি বাড়তে লাগল। ভাবা হ'ল, কোন নির্দিষ্ট উপায়ে বিশ্বসৃষ্টির প্রয়োজন নেই। উদাহরণস্বরূপ, বয়েল বিশ্বাস করতেন (এখানে ভাবার্থ দেয়া হচ্ছে, ...বয়েল 'গড' বলতেন, আমি (লেখক) মুসলিম হিসাবে 'আল্লাহ লিখছি)- প্রকৃতির নিয়ম বা আইনগুলো সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্‌র ইচ্ছার ওপর নির্ভরশীল। তাঁর (আল্লাহ্‌র) নিজস্ব সত্তার বাইরে তিনি কোনকিছু দ্বারা সীমাবদ্ধ বা বাধ্য ছিলেন না। এর অর্থ বাস্তবিকপক্ষে বিশ্ব কিভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে তা দেখার জন্য মানবীয় যুক্তি ব্যবহার করতে হবে। তদুপরি এটি সৃষ্ট হয়েছে একটি স্বর্গীয় মানস/সত্তা দ্বারা, যার মধ্যে সুশৃংখল ক্রম ও ডিজাইন (নকশা) বিদ্যমান। ভৌতজগৎ আচরণ করে আল্লাহ্‌র ইচ্ছার মধ্য দিয়ে একটি নিয়মিত এবং এজন্য স্বাভাবিকভাবেই পূর্বনির্ধারিত বা ভবিষ্যৎবাচ্য নিয়মে। এখানে দু'টি কথা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ : (i) আল্লাহ্‌র ইচ্ছা (ii) পূর্বনির্ধারিত/ভবিষ্যৎ বাচ্য (... এই ঘটবে, ... এরকম করব, ... এরকম হবে)। ঠিক এভাবেই আল্লাহ্‌র অধিকাংশ নে'মত (জান্নাতের) ও জাহান্নামের শাস্তির কথা বর্ণিত আছে পবিত্র কুরআন মাজীদে। আবার আসমান-যমীন, গ্রহ-নক্ষত্রের সমস্ত বিষয়ই যে পূর্বনির্ধারিত তাও ঘোষিত হয়েছে : কক্ষপথ, পরিক্রমণকাল, সৃষ্টির শুরু, ধ্বংস/ক্বিয়ামত সবই আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নির্ধারণ করে রেখেছেন। অহী-র মাধ্যমে সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলা নিজের সে যাত-ছিফাতের বর্ণনা দিয়েছেন, তাঁর মহান একক শক্তি সর্ববিষয়ে ও সৃষ্টিকুশলতার বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে, মূলতঃ সেসবের মাধ্যমেই বিশ্বসৃষ্টির প্রক্রিয়া সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভের ব্যাপারে মানুষকে উৎসাহিত করা হয়েছে। এসব বর্ণনার সাথে এমন সব ঘটনার উদাহরণ তুলে ধরা হয়েছে যা মানুষের চোখে সব সময় দৃশ্যমান।

কোন কোন বর্ণনায় আল্লাহ পাকের নির্ধারিত এমন সব নিয়ম-রীতির উল্লেখ করা হয়েছে, যেসব বিজ্ঞানভিত্তিক প্রাকৃতিক নিয়মের মাধ্যমে আল্লাহ পাক বিশ্বজগৎ নিয়ন্ত্রণ এবং পরিচালনা করছেন। এইসব নিয়ম-রীতির অন্তরালে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম যে পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া চালু রয়েছে, পর্যাপ্ত বৈজ্ঞানিক তথ্য-জ্ঞানের মাধ্যমেই তা অনুধাবন করা সম্ভব। যেহেতু আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে যুক্তি বুদ্ধি দিয়েছেন, আমরা পৃথিবীকে বোধগম্য বা বুদ্ধিগ্রাহ্যভাবে খুঁজে দেখার আশা করতে পারি। এজন্যই আল্লাহ বলেছেন, 'তারা কি দেখে না/লক্ষ্য করে না, ... তোমরা কি লক্ষ্য কর না? ... নিশ্চয়ই এতে নিদর্শন রয়েছে চিন্তাশীলদের/জ্ঞানীদের/বুদ্ধিমানদের জন্য..'। এরকম নির্দিষ্টভাবে ইঙ্গিত করা বা প্রশ্ন করা কখন সম্ভব? যখন উদ্দিষ্ট কার্যকারণ বিশ্লেষণ করার মতো, উপলব্ধির মতো, দেখার মতো System বা ব্যবস্থা মানুষের মধ্যে থাকে, যা মহান আল্লাহ দিয়ে পাঠিয়েছেন।

চলুন বিজ্ঞ পাঠক! দেখা যাক মহান রাব্বুল আলামীন যেসব বিজ্ঞানভিত্তিক প্রাকৃতিক নিয়ম, ঘটনাবলী, সৃষ্টিকুশলতার বিবরণ দিয়েছেন পবিত্র কুরআন মাজীদে, সেগুলোর আমরা সারমর্ম বোঝার চেষ্টা করি।

আকাশ ও আকাশমণ্ডলীর সৃষ্টি ও বিন্যাস সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ– 'যিনি তোমাদের জন্য ভূপৃষ্ঠকে বিছানা স্বরূপ ও আকাশকে ছাদ স্বরূপ করেছেন এবং যিনি আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেন, অতঃপর তা দিয়ে তোমাদের জীবিকার জন্য ফল-শস্যাদি উৎপাদন করেন। অতএব তোমরা জেনে শুনে কাউকে

Contents

আল্লাহ্‌র সাথে সমকক্ষ নির্ধারণ করো না' *(বাক্বারাহ ২/২২)।*[১]

দুনিয়ার আকাশকে প্রদীপমালায় সজ্জিতকরণ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ 'আমরা নিকটবর্তী আকাশকে সুশোভিত করেছি প্রদীপমালা দ্বারা এবং এদের করেছি শয়তানের প্রতি নিক্ষেপের উপকরণ এবং তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছি জ্বলন্ত অগ্নির শাস্তি' *(মুলক ৬৭/৫)।*

গ্রহসমূহ, নক্ষত্র-তারকারাজি সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوْا بِهَا فِيْ ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ- 'তিনি তোমাদের জন্য নক্ষত্ররাজি সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা এর মাধ্যমে স্থলভাগে ও সমুদ্রভাগে অন্ধকার পথের দিশা পাও। আমরা জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন সমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করে দিয়েছি' *(আন'আম ৬/৯৭)।*[২]

সূর্য-চন্দ্রের কক্ষপথ, গতিপথ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে এসেছে, 'তিনিই সেই সত্তা, যিনি সূর্যকে করেছেন কিরণময় ও চন্দ্রকে করেছেন জ্যোতির্ময় এবং ওর গতির জন্য মনযিল সমূহ নির্ধারণ করেছেন। যাতে তোমরা বছরের গণনা ও সময়ের হিসাব করতে পার। আল্লাহ এগুলিকে সত্য সহকারে সৃষ্টি করেছেন। তিনি নিদর্শন সমূহ সবিস্তারে ব্যাখ্যা করেন বিজ্ঞ সম্প্রদায়ের জন্য' *(ইউনুস ১০/৫)।*[৩]

দিন-রাত্রির ধারা সম্পর্কে এসেছে, تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ- 'তুমি রাতকে দিনের মধ্যে প্রবেশ করাও এবং দিনকে রাতের মধ্যে প্রবেশ করাও। তুমি জীবিতকে মৃত থেকে বের কর এবং মৃতকে জীবিত থেকে বের কর। আর তুমি যাকে খুশী বেহিসাব রিযিক দান করে থাক' *(আলে ইমরান ৩/২৭)।*[৪]

দিবা-রাত্রির পরিবর্তনের ধারা সম্পর্কে এসেছে, 'তুমি কি দেখ না আল্লাহ রাত্রিকে দিবসে এবং দিবসকে রাত্রিতে পরিণত করেন? তিনি চন্দ্র-সূর্যকে করেছেন নিয়মাধীন, প্রত্যেকটি বিচরণ করে নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত; তোমরা যা কর আল্লাহ সে সম্পর্কে অবহিত' *(লোকমান ৩১/২৯)।*[৫]

বীজ থেকে উদ্ভিদ উদ্গত করা সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, إِنَّ اللهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ذَلِكُمُ اللهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُوْنَ- 'নিশ্চয়ই আল্লাহ দানা ও বীজ উৎপাদনকারী। তিনি জীবিতকে মৃত হ'তে বের করেন এবং মৃতকে জীবিত হ'তে বের করেন। তিনিই আল্লাহ। অতএব তোমরা কোথায় ঘুরছ? *(আন'আম ৬/৯০)।*

প্রভাতের উন্মেষ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ- 'তিনি প্রভাতরশ্মির উন্মেষকারী। তিনি রাত্রিকে বিশ্রামকাল এবং সূর্য ও চন্দ্রকে সময় নিরূপক হিসাবে নির্ধারণ করেছেন। এটি হ'ল মহাপরাক্রান্ত ও মহাজ্ঞানী (আল্লাহ্‌র) নির্ধারণ' *(আন'আম ৬/৯৬)।*

বায়ু সঞ্চালন সম্পর্কে কুরআনে এসেছে, 'তিনিই বৃষ্টির পূর্বে সুসংবাদবাহী হিসাবে বায়ু প্রবাহ প্রেরণ করেন। অবশেষে যখন ঐ বায়ুরাশি পানিপূর্ণ মেঘমালাকে বহন করে আনে, তখন আমরা তাকে কোন নির্জীব ভূখণ্ডের দিকে হাঁকিয়ে নেই। অতঃপর ওটা থেকে বারি বর্ষণ করি। অতঃপর তার মাধ্যমে সকল প্রকার ফল-ফলাদি উৎপন্ন করি। এভাবেই আমরা (ক্বিয়ামতের দিন) মৃতদের জীবিত করব। এ থেকে সম্ভবতঃ তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে' *(আ'রাফ ৭/৫৭)।*

এছাড়াও প্রাণী জগতের প্রজনন, গবাদিপশুর দুধের উৎস, উদ্ভিদ জগৎ, উদ্ভিদ জগতের প্রজনন, জন্তুজগতের সামাজিক বন্ধন, নানা প্রকার খাদ্য, খাদ্যচক্র, মৌমাছি, মাকড়সা, পাখি প্রভৃতি সম্পর্কে কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় সবিস্তর বিবরণ এসেছে।

উপরে উল্লিখিত আয়াতগুলো গভীরভাবে বিশ্লেষণ করে আমরা যে বিশেষ তথ্য পাই তা নিম্নরূপ-

১. মহান আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টি কৌশলের বর্ণনা Mechanism, Strategy -আকাশ, পৃথিবী, গ্রহ-নক্ষত্র, সমুদ্র, উদ্ভিদ, প্রাণী ইত্যাদির সৃষ্টির বর্ণনা।

২. প্রশ্ন আকারে বান্দার দৃষ্টি আকর্ষণ- এসব সৃষ্টি/নে'মত থেকে বিস্ময় প্রকাশ, মহান আল্লাহ্‌র বড়ত্ব (আল্লাহু আকবার) স্মরণ করা এবং সামগ্রিকভাবে তাঁর প্রতি ঈমান আনা।

৩. চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে যে, আর কে আছে এসব সৃষ্টি করতে পারে বা এরকম বিস্ময়কর নে'মত তোমাদেরকে দিতে পারে?[৬]

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, বিজ্ঞানের ভিত্তি হ'ল : ১. মানবীয় অভিজ্ঞতা ২. পরীক্ষামূলক পদ্ধতি।

১. মানবীয় অভিজ্ঞতা কি বলে? : (১) জীবন-যাপন ও জীবনের উপকরণের জন্য প্রকৃতির উপর নির্ভরতা : যেমন- আলো, বাতাস (বায়ুমণ্ডল), পানি (বৃষ্টি), নৌযান, গাছপালা, উদ্ভিদ প্রাণী ইত্যাদি।

২. প্রকৃতির নিয়ম, আইন, আদেশ (Order), নিয়ন্ত্রণ (Regulation) সব আল্লাহ্‌র। তিনি কারও মুখাপেক্ষী ও নির্ভরশীল নন, সীমাবদ্ধ নন। তাঁকে কারো কাছে জবাবদিহি করতে হবে না।

সুতরাং বান্দা যদি এসব দৃষ্টান্ত থেকে উপলব্ধি করতে পারে :

১। একমাত্র সর্বশক্তিমান, রাব্বুল আলামীন আল্লাহ ছাড়া কেউ এগুলো সৃষ্টি করতে, পুনর্জীবিত করতে, তাদের হিসাব ও কক্ষপথ নির্ধারণ, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ করতে পারে না।

২। সম্পূর্ণ তাঁরই ইচ্ছায় চলে, তাঁর ইচ্ছার জন্য তিনি কারও কাছে জবাবদিহি করবেন না, তাঁকে কোন প্রশ্ন করা হবে না *(আম্বিয়া)।*

৩। মানুষ কত বেশী অসহায়, কত অপরিহার্যভাবে এসবের উপর নির্ভরশীল! তবে তার (বান্দার) জন্য আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনা অপরিহার্য হয়ে যায়।

বিজ্ঞান ও ধর্ম :

আমরা ইতিমধ্যেই দেখেছি যে, কিভাবে সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস সত্যিকারভাবে বিজ্ঞানের ভিত্তি নির্মাণ করে। জগতের ক্রমব্যবস্থার প্রতি পূর্ণবিশ্বাস ছাড়া এটা বিচার করা সব সময়ই অসম্ভব হয়ে পড়বে। প্রকৃত নিয়মতান্ত্রিকতা/বিধিবদ্ধতা ও বাস্তব মহাজাগতিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে বিজ্ঞান নির্মিত হয়েছে, না-কি একটি ধারাবাহিক সমস্থানিকতার মধ্য দিয়ে। যেটা আমাদেরকে

---

১. *এ সম্পর্কে আরো এসেছে, রা'দ ১৩/২; আম্বিয়া ২১/৩২; হজ্জ ২২/৬৫; লোকমান ৩১/১০; জাছিয়া ৪৫/১৩; ক্বাফ ৫০/৬; আর-রহমান ৫৫/৭।*

২. *এ সম্পর্কে আরো এসেছে, নাহল ১৬/১২, ১৬; ফুরক্বান ২৫/৬১।*

৩. *এ সম্পর্কে আরো এসেছে, আন'আম ৬/৯৬; ইবরাহীম ১৪/৩৩; আম্বিয়া ২১/৩৩; ইয়াসীন ৩৬/৪০; আর-রহমান ৫৫/৫।*

৪. *এ সম্পর্কে আরো এসেছে, আ'রাফ ৭/৫৪; ইয়াসীন ৩৬/৩৭; যুমার ৩৯/৫; জাছিয়া ৪৫/৫; ক্বাছাছ ২৮/৭১-৭৩।*

৫. *এ সম্পর্কে আরো এসেছে, ফাতির ৩৫/১৩; ইয়াসীন ৩৬/৩৮।*

৬. *বিভিন্ন আয়াতে আল্লাহ চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছেন, নামল ২য় ২৭/৬০-৬৪; ক্বাছাছ ২৮/৭১-৭৩; মুলক ৬৭/৩০।*

Contents

বিন্যাস এবং নিয়মানুবর্তিতার একটি বিভ্রান্তিকর অবয়ব দেয় (মুরগী আগে না ডিম আগে)। একইভাবে, এক সৃষ্টিকর্তার প্রতি একটি ধর্মীয় বিশ্বাস, যিনি যুক্তি এবং জ্ঞানের উৎস, বিজ্ঞানের আবিষ্কারসমূহকে আলিঙ্গন করায়। যদি প্রকৃতির বিভিন্ন বৈচিত্র্য- আকাশ, পৃথিবী, গ্রহ-নক্ষত্র, মেঘমালা, বৃষ্টি, বায়ু প্রবাহ, নৌযান সমূহ, উদ্ভিদ, গবাদি পশু ইত্যাদি সত্যিই কোন জ্ঞানের উদ্রেক করে বা বিস্ময়কর তথ্য দেয় এদের সৃষ্টিকৌশল ও কুশলতা/নিপূণতা, পরিচালন-রক্ষণাবেক্ষণের ব্যাপারে; তবে তা নাযিলকৃত কিতাবের সাথে সাংঘর্ষিক হ'তে পারে না। একারণেই বিজ্ঞানের সাথে মহান আল্লাহ্‌র নাযিলকৃত কুরআন মাজীদের কোন বিরোধ নেই।

পরবর্তীতে যুক্তি ও বিজ্ঞানের বিকাশ এলো এটা বোঝাতে যে, যুক্তি হ'ল ধর্মের শত্রু। যুক্তি সংযুক্ত হ'ল আধুনিক বিজ্ঞানের সাথে, এর সবচে বড় আদর্শ হিসাবে এবং ধর্মীয় বিশ্বাসকে সম্পূর্ণ ত্রুটিপূর্ণভাবে, কোন উপায়ে দেখা হ'ল যৌক্তিকতার কাছে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হিসাবে। বিশ্বাস ভাসে বিনা যুক্তিতে বা যুক্তিহীনতায়। তবুও বিশ্বাস সব সময়ই স্বয়ং কোন কিছুতে বা কারও ওপর বিশ্বাস। যুক্তি ছাড়া আমরা সংজ্ঞায়িত করতে পারি না আমরা কিসে বিশ্বাস করি। যুক্তির সংযোগ ঘটাতে হবে এক বিশ্বের সাথে যেখানে আমরা সবাই বাস করি। বিজ্ঞানের জগৎ ধর্মের জগৎ থেকে পৃথক কিছু নয়। তবুও এখন পর্যন্ত এসব পূর্ব অনুমান বিজ্ঞান ও ধর্মের মধ্যে একটি দ্বিমুখী চলাচল (টু-ওয়ে ট্রাফিক)। উভয়টিতেই যৌক্তিকতা আদর্শায়িত এবং উভয়টিই বাস্ত বতার সাথে সংশ্লিষ্ট। তাদের রয়েছে পৃথক পদ্ধতি এবং বিষয়বস্তু। কিন্তু তার অর্থ এই নয় য, একটিকে অপরটি থেকে বাক্সবন্দী করে রাখা যেতে পারে। স্রষ্টার অস্তিত্ব আমাদেরকে ভৌতজগতের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে কিছু বলতে পারবে। তেমনি ভৌতজগতের বৈশিষ্ট্য আমাদেরকে স্রষ্টার মহিমা সম্পর্কে কিছু শিক্ষা দিতে পারে। এই পরস্পর নির্ভরতা এবং পরস্পর থেকে শেখার ইচ্ছা সামগ্রিকভাবে সমকালীন চিন্তাধারার অংশ নয়। কিছু বিজ্ঞানী আক্রমণাত্মকভাবে বৈজ্ঞানিক যুক্তি ব্যবহার করেন কোন ধর্মীয় বুঝকে বাদ দেওয়ার জন্য, বিবেচনার অযোগ্য বলে ঘোষণা করার জন্য। আবার কেউ কেউ সহনশীল হ'তে এবং ধর্মকে এর নিজস্ব গণ্ডীর মধ্যে থাকতে দিতেই খুশি থাকেন। ইতিবাচক দৃষ্টিতে, ধর্মকে পরিস্কারভাবে যুক্তির প্রভাবের বাইরে রাখা আছে। বিজ্ঞান তার ওপর (যুক্তির) একচেটিয়া প্রভাব বিস্তার করতে চায়।

নগণ্য সংখ্যক বিজ্ঞানীর কথা বাদ দিলে বেশির ভাগ বস্তুবাদী মনোভাব সম্পন্ন বিজ্ঞানীকে দেখা যায়, তাঁরা যখন প্রচলিত কোন কাহিনী কিংবা উপকথায় ধর্মীয় কোন প্রশ্ন দেখতে পান কিংবা পাশ্চাত্য জগতে ধর্ম আর বিজ্ঞানের সম্পর্ক নিয়ে যখন কোন আলোচনা চলে, তখন সবাই ধর্ম বলতে সাধারণভাবে ইহুদী ও খৃষ্টধর্মের কথা বলে থাকেন। ঘুর্ণাক্ষরেও কেউ ইসলামের কথা ভাবেন না বা বলেন না। কাজেই অহী বা ইলাহীবাণীর সাথে বিজ্ঞানের কোন বিরোধ আছে কি নেই সে সম্বন্ধে কিছু জানতে হ'লে আগে ইসলাম ধর্মের রূপরেখা সম্পর্কে জানতে হবে। ধর্ম ও বিজ্ঞানের পারস্পরিক সম্পর্ক দেশে দেশে যুগে যুগে কোন সময়ই এক রকম ছিল না। একথা সত্য যে, একত্ববাদী কোন ধর্ম গ্রন্থে বিজ্ঞানের বিরোধিতা কিংবা নিন্দাসূচক কোন বক্তব্য নেই। কিন্তু বাস্তবে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে কোন কোন ধর্মের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের দ্বারা বিজ্ঞানীগণ যে নিদারুণভাবে বাধাগ্রস্ত হয়েছিলেন, তা অস্বীকার করা যায় না। (৮ম থেকে ১২শ শতাব্দী)। কিন্তু ইসলামী বিশ্বের ধর্মীয় ভাবধারা একই সঙ্গে ধর্মের বিশ্বাসী ও বিজ্ঞানী হওয়ার ব্যাপারে কোন মানুষের জন্যে কোন রকম বাঁধার সৃষ্টি করেনি। ইহুদী ও খ্রিষ্টানদের ধর্মীয় কিতাবেও বৈজ্ঞানিক গবেষণার প্রতি কোন অনীহা ছিল না।

বিজ্ঞান ও বস্তুবাদ :

স্রষ্টার অস্তিত্ব বা তাঁর সৃষ্টির ব্যাপারে উপরোক্ত ধরনের আস্তিক্যবাদী কথাবার্তা নাস্তিক, অভিজ্ঞতাবাদী ও প্রগতিবাদীদের অনেকের কাছে ঘৃণিত বা অভিশপ্ত বস্তু। 'বাস্তবতার বিভিন্ন স্তর' এর ধারণা অবজ্ঞা বা তাচ্ছিল্য করা হবে। তাদের মতে, কেবলমাত্র একটিই বাস্তবতা আছে, আমাদেরকে বলা হবে এবং সেটা হ'ল বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির মাধ্যমে মানবীয় যুক্তিতে যা সহজলভ্য। যা বিজ্ঞানের মাধ্যমে প্রমাণ করা যায় না তার অস্তিত্ব থাকতে পারে না। যার অস্তিত্ব আছে তাকে মানুষের ধারণা ও যুক্তিতে প্রবেশযোগ্য থাকতে হবে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির মধ্য দিয়ে এই ধারণাটিই পরিস্কারভাবে বাস্তবতার বৈশিষ্ট্যকে সীমায়িত বা সীমাবদ্ধ করে। আত্মা (স্পিরিট) এবং অন্যান্য ঘটনা যা বৈজ্ঞানিক গবেষণাগারে প্রমাণ করা যায় না সেগুলো অস্তিত্বহীন হিসাবে বিবেচিত। বস্তুই কাজ করে, আত্মা নয় (Matter does and Spirits donot) এই মতবাদ বস্তুবাদের একটি রূপ। আস্তিকতার দৃষ্টিকোণ থেকে এর সমস্যা হ'ল অদৈহিক বা অভৌত ব্যাখ্যার বিষয়ে অত্যধিক বিশ্বাসপ্রবণ না হওয়াটা যখন হয়ত বিজ্ঞোচিত হ'তে পারে, তখন এদেরকে একেবারে বাদ দেওয়াটাও আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের কোন সম্ভাবনাকেও অবশ্যই মুছে ফেলে।

যুক্তি ও বিজ্ঞানের বিকাশের কাল যতই উন্নত হ'ল, মানবীয় যৌক্তিকতা এর আস্তিকতার শিকড় ভুলে যাওয়ার প্রবণতার দিকে গড়াল, এমনকি যদিও সেগুলো আমাদের বুঝ/উপলব্ধির আংশিক নির্ভরযোগ্যতা বা গ্রহণযোগ্যতার ন্যূনতম নিশ্চয়তা দিত তবুও। 'আমরা কিভাবে জানি' এর উপর গভীর মনোযোগ দিল এবং হয়ে পড়ল নৃতত্ত্ব কেন্দ্রীক। আমরা সত্যের ধারণার প্রতি দৃঢ়তা হারাতে শুরু করলাম এবং আপেক্ষিকতাবাদে জড়িয়ে পড়লাম। প্রতিক্রিয়াশীলতা এখন সামাজিক প্রেক্ষাপটের উপর জোর দিচ্ছে বিশ্বাসের গঠনাত্মক উপাদান হিসাবে। আমরা বিশ্বাস করতে পারি আমরা কি চাই এবং সেটা আমাদের কোন কিছুতে বিশ্বাস করার জন্য কোন যুক্তি দেয় না। দীর্ঘদিন বিজ্ঞানকে চালিয়ে নেয়া হয়েছিল এর নিজস্ব সুস্পষ্ট সফলতার দ্বারা এটা ধর্ম বিশ্বাস সমূহকে ছুঁড়ে ফেলেছে যা তাকে প্রথম স্থান অর্জন সম্ভব করেছিল। এটা মানবীয় যুক্তির ক্ষমতা ও অর্জন সমূহকে গৌরবান্বিত করেছে।

মানুষের এই বস্তুবাদী ধ্যান-ধারণা ভোগবিলাসে এতদূর অন্ধ করে ফেলেছে যে, বিনা কারণে অন্যান্য মানুষের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক সংগ্রামে লিপ্ত হয়। যেসব জাতি এই বস্তুবাদ/জড়বাদকে অনুসরণ করছে তারা এক সার্বক্ষণিক দ্বন্দ্ব ও গৃহবিবাদের করুণ শিকারে পরিণত হয়েছে। ফলে তাদের জীবনের সকল প্রকার ব্যবস্থাপনা ও রূপ-কাঠামো চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাচ্ছে এবং বিজ্ঞান ও তার আবিস্কৃত মারণাস্ত্রগুলো মানবজাতিকে শান্তি দেয়ার পরিবর্তে ধ্বংস করার কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে।

পরিশেষে আমরা বলতে পারি যে, মানবতার কল্যাণে অবতারিত মহাগ্রন্থ আল-কুরআন বিজ্ঞানের উৎস। যাকে গবেষণা করে পৃথিবী বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ জিনিস উদ্ভাবন করা হয়েছে। আবার কুরআনের বিভিন্ন বর্ণনা ও তথ্য সহজে উপলব্ধির জন্য বিজ্ঞান সহায়ক। তাই বিজ্ঞান ও ধর্ম পরস্পরের বিরোধী নয়। যদিও অনেকে স্রেফ বিরোধিতার কারণে এতদুভয়ের মাঝে বিভিন্ন কৃত্রিম দ্বন্দ্ব মানুষের সামনে উপস্থাপন করে। আল্লাহ আমাদের সকলকে সঠিক বুঝ দান করুন-আমীন!

Contents

ফারাক্কা-রামপাল : বাংলাদেশ ও ভারত সম্পর্কের বাধা

*আনু মুহাম্মদ**

রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্রের কারণে সুন্দরবনের যে ক্ষতি হবে, তা মানুষকে কঠিন বিপদের মধ্যে নিক্ষেপ করবে, যে ক্ষতি পূরণ করা কখনোই সম্ভব নয়, যে ক্ষতি বহন করা মানুষের পক্ষে দুঃসাধ্য, সেই ক্ষতি নিয়েও ক্ষমতাবান ব্যক্তিদের হাসি-ঠাট্টামিশ্রিত কোন ক্ষতি হয়নি, কিংবা হবে না শুনে শুনে আমরা অভ্যস্ত। তারা তাদের দিক থেকে যে খুব অসত্য বলছেন তা-ও নয়। কেননা ক্ষতি তো তাদের হয়নি, হবেও না কোন দিন। কেননা তারা মানুষ ও জনপদের অপরিসীম ক্ষতি করেন, লাভবান হন এবং তারপর চলে যান ধরাছোঁয়ার বাইরে।

প্রথমে একটি বাঁধের কথা বলি। গত শতকের ষাটের দশকে গঙ্গা-পদ্মা নদীর ওপর যখন ফারাক্কা বাঁধ নির্মাণ চলছিল, তখনই এ নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। ভারতের কয়েকজন বিশিষ্ট বিশেষজ্ঞও দীর্ঘ মেয়াদে এই বাঁধের ক্ষতিকর প্রভাব নিয়ে উচ্চকণ্ঠ ছিলেন। কিন্তু এর প্রতি কোন গুরুত্ব না দিয়ে এই বাঁধ নির্মাণ শেষ করা হয় এবং ১৯৭৫ সালে তা চালু হয়। এই বাঁধের কারণে এত বছরে, বিশেষত শুষ্ক মৌসুমে বাংলাদেশের প্রধান একটি নদীর পানিপ্রবাহ ভয়াবহ মাত্রায় বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে। যার ফলে এর সঙ্গে সংযুক্ত আরও ছোট-বড় নদীর পানিপ্রবাহ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ফলাফল বহুমাত্রিক বিপর্যয়, শুধু যে এসব নদীর অববাহিকায় জীবন, জীবিকা, ফসল উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তা-ই নয়, প্রিরিবেশগত ভারসাম্য বিপর্যস্ত হয়ে জীবনমান, স্বাস্থ্য, প্রাণবৈচিত্র্যও বিপদাপন্ন হয়েছে। এর আর্থিক মূল্য বের করা কঠিন।

এই ফারাক্কা বাঁধের পর বাংলাদেশে নেমে আসা আরও নদীর ওপর বাঁধ নির্মাণ করেছে ভারত, আরও পরিকল্পনাধীন আছে। এর ওপর নদী-সংযোগ পরিকল্পনা নামে যে ভয়াবহ প্রকল্প নিয়ে অগ্রসর হচ্ছে ভারত তা পুরো অঞ্চলে নদী ও নদীনির্ভর জীবন ও অর্থনীতির ওপর মরণ আঘাত হানবে। আন্তর্জাতিক পানি কনভেনশন অনুযায়ী ভারত একতরফাভাবে কিছু করতে পারে না এবং ক্ষয়ক্ষতির দায় ভারতের ওপরই বর্তাবে। কিন্তু বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষ এর সুরাহা করবে কি, তার নিজের উন্নয়ন মডেলেই যথেচ্ছাচার বাঁধ নির্মাণ, নদী দখল ও দূষণ দিয়ে নদীর বাকী অস্তিত্বের ক্ষতিসাধন করে চলেছে।

নদীর ওপর যথেচ্ছাচার বাঁধ নির্মাণের সুবিধাভোগী বিশ্বজোড়া নির্মাণ কোম্পানী, কনসালট্যান্ট, প্রকৌশলী, রাজনীতিবিদ-ব্যবসায়ীদের জোট গত শতকের শেষ কয়েক দশকে বিশ্বের বহু দেশে বন্যানিয়ন্ত্রণ, সেচ ও সবুজ বিপ্লবের নামে নদীপ্রবাহ নিয়ন্ত্রণের এসব কর্মসূচী হাতে নিয়েছে। এর বিরূপ ফলাফল এখন পাওয়া যাচ্ছে। ভাটার দেশগুলো যে বড় বিপর্যয়ের সামনে পতিত হচ্ছে, তার দৃষ্টান্ত বিশ্বজোড়া।

উজানের দেশগুলোতেও এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া ক্রমেই স্পষ্ট হচ্ছে। সে কারণে নিজের মতো করে ভারত যে ফারাক্কা বাঁধ নির্মাণ করেছে, বাংলাদেশের মতামত ও অধিকারের তোয়াক্কা না করে যে বাঁধ চালু করেছে, শুকনো মৌসুমে পানি আটকে বর্ষা মৌসুমে পানি ছেড়ে ভেবেছে এতে ভাটির দেশের ক্ষতি হ'লে কী, ভারতের ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঠিকই ঘটবে, ঘটনা কিন্তু তা ঘটেনি। বরং ভারতের দিকে নতুন নতুন সমস্যা ক্রমে জমে এখন ভয়াল আকার ধারণ করেছে। এর শিকার হচ্ছে সে দেশেরই অনেক এলাকা। বিহার তার অন্যতম। এই বাঁধের কারণে নদীর গভীরতা কমে যাচ্ছে, বন্যায় প্লাবিত হচ্ছে গ্রামের পর গ্রাম। বিহারে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি এমন মাত্রায় পৌঁছেছে যে এই বছরে বিহারের মুখ্যমন্ত্রী ভারতের প্রধানমন্ত্রীর কাছে দাবী জানিয়েছেন ফারাক্কা বাঁধ ভেঙে ফেলতে (বাংলাদেশের মানুষের মনের কথাও তাই। কিন্তু কখনো সরকার বা প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দল তা বলেনি)। কিন্তু ভারতপন্থী ও ভারত বিরোধিতার নামে পরিচালিত রাজনীতির দুষ্টচক্রের কারণে বাংলাদেশে এ নিয়ে সুস্থ আলোচনা হয় না কখনো। যদিও সর্বসাধারণের মনের মধ্যেই এ বিষয়ে ক্ষোভ আছে। বরাবর ভারত এটি উপেক্ষা করতে চেয়েছে। এগুলো নিছক ভারতবিদ্বেষী রাজনীতি, এই আওয়াজ দিয়ে।

ফারাক্কার জন্য ক্ষতি কত দূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে তার প্রমাণ সুন্দরবন। সুন্দরবন যেসব নদী ও শাখা নদীর পানিপ্রবাহের ওপর নির্ভরশীল, সেই নদীগুলো আবার গঙ্গা-পদ্মার পানিপ্রবাহের সঙ্গে সংযুক্ত। ফারাক্কা কাজ শুরুর পর থেকে নদীগুলোর রুগ্নতাপ্রাপ্তিতে তাই সুন্দরবনে মিঠাপানির প্রবাহ দুর্বল হয়ে যায়, ফলে সুন্দরবনে বিপরীত থেকে সমুদ্রের নোনাপানির প্রবাহ ভারসাম্যহীনভাবে বেড়ে যায়। এক গবেষণার ফলাফলে তাই দেখা যায়, গঙ্গা নদীর মিঠাপানি গড়াই হয়ে পশুর নদ ও শিবসা নদীর মাধ্যমে সুন্দরবনে প্রবাহিত হয়। ফারাক্কা বাঁধের পর পানিপ্রবাহ কমে গেছে। ...মিঠাপানির প্রবাহ কম থাকায় লবণাক্ত পানি ঢুকে পড়ছে বনের মধ্যে। এ কারণে ম্যানগ্রোভ উদ্ভিদ বেঁচে থাকতে পারছে না। ...বাঁধ চালুর পর শুষ্ক মৌসুমে সুন্দরবন প্রতি সেকেন্ডে শূন্য থেকে ১৭০ ঘনমিটার পলিযুক্ত মিঠাপানি গ্রহণ করেছে। সেখানে লবণাক্ততার পরিমাণ ঠিক রাখার জন্য কমপক্ষে ১৯৪ দশমিক ৪ ঘনমিটার পানিপ্রবাহ প্রয়োজন। কম পানিপ্রবাহ থাকায় সাগরের লবণাক্ত পানি বনের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে। যদিও ১ শতাংশের বেশি লবণাক্ততা থাকলে সুন্দরীগাছের বেঁচে থাকা কঠিন *(প্রথম আলো, ৩ সেপ্টেম্বর ২০১৬)*। বছরের পর বছর এই পরিস্থিতি সুন্দরবনকে অনেক দিক থেকে দুর্বল করেছে।

বাংলাদেশের জন্য শুধু নয়, ভারত বাংলাদেশের বিভিন্ন নদীপ্রবাহ এবং বিস্তীর্ণ উপকূলীয় অঞ্চলের জন্য সুন্দরবনের গুরুত্ব বোঝার ক্ষমতা বা দায়বদ্ধতা যদি দুই দেশের সরকারের থাকত, তাহ'লেও ফারাক্কা নিয়ে গভীর পর্যালোচনা ও নতুন চিন্তা দেখা যেত।

** অর্থনীতিবিদ ও অধ্যাপক, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।*

Contents

কিন্তু তা না থাকার ফলে দশকের পর দশক ফারাক্কা প্রাণ, প্রকৃতি, পরিবেশের ক্ষতি করে যাচ্ছে। সুন্দরবনকে এই বিপর্যয় থেকে উদ্ধার করার চেষ্টা না করে একই দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ ঘটিয়ে সুন্দরবনবিনাশী প্রকল্প হাযির করা হয়েছে, সেটি হ'ল রামপাল কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্প। এর প্রধান উদ্যোক্তা এবং পরিচালক ভারতের এনটিপিসি। এই কেন্দ্র নির্মাণ করবে ভারতের একটি কোম্পানি, এর জন্য ঋণ জোগান দিবে ভারতের রাষ্ট্রীয় ব্যাংক (এর জন্য সার্বভৌম গ্যারান্টি দিবে বাংলাদেশ সরকার) এবং সব লক্ষণ বলছে কয়লা জোগান দিবে ভারতের কয়লা কোম্পানী। তার মানে কাগজপত্রে ৫০: ৫০ মালিকানা ও মুনাফা দেখানো হ'লেও বিনিয়োগ, নানা কিছু বিক্রি, কর্মসংস্থান ও মুনাফা সবকিছুতেই ভারতের বিভিন্ন কোম্পানীরই সুবিধা।

বিপরীতে বাংলাদেশের শুধুই ক্ষতি, সুন্দরবন হারানোর মতো অপূরণীয় অচিন্তনীয় ক্ষতি, বহু মানুষের জীবন-জীবিকার ক্ষতি, কয়েক কোটি মানুষের জীবন নিরাপত্তার ঝুঁকি, তারপরও ঘাড়ে ঋণ আর আর্থিক বোঝা। কিন্তু ক্ষতি কি শুধু বাংলাদেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে? না। প্রকৃতি অবিচ্ছিন্ন, সীমান্তে কাঁটাতার দিয়ে তার সর্বনাশ ঠেকানো যায় না। সে জন্য সুন্দরবন বাংলাদেশ অংশে বিপর্যস্ত হ'লে ভারতের অংশের সুন্দরবনও তা থেকে বাঁচবে না। তাই কলকাতায় সুন্দরবনবিনাশী প্রকল্পের বিরুদ্ধে এক সমাবেশে সংহতি জানাতে এসেছিলেন সেই এলাকার কয়েকজন অধিবাসী। তাঁদের একজন আমাকে বললেন, আমরা ঐ এলাকায় ৫০ লাখ মানুষ বসবাস করি। সুন্দরবনের ক্ষতি হ'লে আমাদের সর্বনাশ। তাই আমরাও এই লড়াইয়ে আছি।

মুক্তিযুদ্ধে ভারতের ভূমিকায় বাংলাদেশের মানুষ একটি বড় আশ্রয় পেয়েছিল, তার কারণে বাংলাদেশের মানুষের মনে সব সময়ই একটা কৃতজ্ঞতাবোধ আছে। কিন্তু আবার ভারতের শাসকদের গৃহীত কোন কোন নীতি নিয়ে বাংলাদেশের জনগণের ক্ষোভও আছে। এগুলো মানুষ ভুলে যেতে চাইলেও পারে না। ফারাক্কা এর একটি, তারপর আরও বাঁধ, তারপর নদী-সংযোগ পরিকল্পনা, সীমান্তে মানুষ হত্যা, বাণিজ্যে প্রতিবন্ধকতা, ট্রানজিটের নামে পুরো যোগাযোগব্যবস্থার ওপর সুবিধা আদায় ইত্যাদি। সর্বশেষ সুন্দরবনবিনাশী রামপাল বিদ্যুৎ প্রকল্প। আগেরগুলো সম্পর্কে মানুষের মধ্যে ক্ষোভ আছে, তারপরও মানুষ আশা নিয়ে থাকে হয়তো এসবের সমাধান একদিন পাওয়া যাবে।

পুরোনো উন্নয়ন মডেলে নদীসহ প্রকৃতির ওপর কর্তৃত্বকেই মানুষের ক্ষমতা আর উন্নয়নের প্রদর্শনী ভাবা হ'ত, এখন তার পরিণাম যত স্পষ্ট হচ্ছে ততই ভুল সংশোধনের পথ খুঁজছে মানুষ। এমনকি বাঁধ ভেঙে হ'লেও নদীকে স্বাভাবিক প্রবাহের মধ্যে নিয়ে যাওয়া, প্রকৃতির সঙ্গে সমন্বয় করে উন্নয়ন চিন্তা ক্রমে শক্তিশালী হচ্ছে। ভারত-বাংলাদেশকেও সেই পথই ধরতে হবে।

কিন্তু রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্রের কারণে যখন সুন্দরবনের বিনাশ ঘটবে, সেই ভুল সংশোধনের সুযোগ থাকবে না, সুন্দরবনের এই ক্ষতি আর কোন কিছু দিয়েই পূরণ করা যাবে না। ফলে তখন মানুষের তীব্র ক্ষোভ দীর্ঘস্থায়ী হবে।

আমরা চাই না এ রকম একটি পরিস্থিতি তৈরী হোক। 'কোন ক্ষতি হয়নি, কোন ক্ষতি হবে না' আপ্তবাক্য উচ্চারণ আওড়িয়ে সত্য আড়াল করা যাবে না। সেজন্য আমরা চাই, দুই দেশের দীর্ঘমেয়াদী বন্ধুত্বের স্বার্থেই বাংলাদেশ ও ভারতের সরকার দ্রুত এই প্রকল্প থেকে সরে আসবে। আমরা এখনো আশা করি, সমমর্যাদার ভিত্তিতে দুই দেশের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নিশ্চিত হবে, বন্ধুত্ব হবে প্রকৃতই বিকাশমুখী এবং উভয়ের জন্য কল্যাণকর। দুই দেশের সজাগ মানুষ জনপন্থী উন্নয়নের ধারার জন্য যৌথ চিন্তা ও লড়াই শক্তিশালী করলে নিশ্চয়ই দুই দেশের মানুষের প্রকৃত বন্ধুত্বের ভিত মযবূত হবে।

॥ সংকলিত ॥

Contents

তাতারদের আদ্যোপান্ত

*মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম**

তাতারদের বিজয়াভিযান ও ধ্বংসলীলা :

লোকেরা তাতারদের বাগদাদ ধ্বংসের কথা জানলেও এর পূর্বে লক্ষ লক্ষ মানুষকে হত্যা ও বহু শহরকে ধ্বংস করার ঘটনা অনেকে জানে না। তারা বহু শহর ধ্বংস ও দখল করে। অতঃপর তৎকালীন মুসলিম বিশ্বের প্রাণকেন্দ্র বাগদাদ দখল করে। বাগদাদে পৌঁছার পূর্বে তারা যে ধ্বংসলীলা চালিয়েছিল তার ভয়াবহতা সম্পর্কে ইবনুল আছীর (রহঃ) আক্ষেপ করে বলেছিলেন, فَيَا لَيْتَ أُمِّي لَمْ تَلِدْنِي، وَيَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ حُدُوثِهَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا 'হায়! আমার মা যদি আমাকে জন্ম না দিতেন! হায়! আমি যদি এই ঘটনার পূর্বে মৃত্যুবরণ করতাম এবং একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতাম'।[১] বিশ্ববিজেতা আলেকজান্ডারও এত দ্রুত বিশ্ব জয় করতে পারেননি। তিনি বিশ্ব জয় করেন প্রায় দশ বছরে। এতে তিনি কাউকে হত্যা করেননি। লোকেরা তার আনুগত্য স্বীকার করে নিয়েছিল। আর তাতাররা পৃথিবীর অধিকাংশ রাষ্ট্রকে মাত্র এক বছরে দখল করে নেয়।[২]

ইবনুল হাদীদ বলেন, তাতারদের ব্যাপারে রাসূল (ছাঃ) যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন আমরা তা স্বচক্ষে দেখেছি এবং আমাদের সময়ে তা ঘটেছে। ইসলামের প্রথম যুগ থেকেই লোকেরা এরূপ পরিস্থিতির জন্য অপেক্ষা করছিল। অবশেষে এটি আমাদের যুগে এসে বাস্তবায়িত হ'ল।[৩] তাতার বাহিনী যে ধ্বংসলীলা চালিয়েছিল তা মানব ইতিহাসে বিরল। তারা প্রথমে মুসলিম বিশ্বের প্রতি কোন ভ্রুক্ষেপ করেনি। কিন্তু কতিপয় মুসলিম নেতার অতিলোভ ও ভুল সিদ্ধান্তের কারণে তারা মুসলিম বিশ্বের প্রতি হিংসাপরায়ণ হয়ে উঠে। তাতাররা পূর্ব চীন সীমান্তের কাছে ত্বামগাজা পাহাড়ের পাদদেশে বসবাস করত। তাদের ও মুসলিম বিশ্বের মাঝে ছয় মাস পথের দূরত্ব ছিল।[৪] খোয়ারিযম শাহ মুহাম্মাদ বিন তুকুস মা-ওয়ারাউন নাহার (বর্তমান আফগানিস্তান ও কাযাকিস্তান) রাজ্যের ক্ষমতায় আসীন হয়েই আশ-পাশের শহরগুলো দখল করে নেন এবং এর নেতাদের হত্যা করেন। শহরগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'ল- বুখারা, সামারকান্দ[৫], বালাসাগুন[৬], কাশগড়[৭] প্রভৃতি। এ শহরগুলো মূলতঃ মুসলমান ও তাতারদের মধ্যে একটি বড় প্রতিবন্ধক ছিল। কিন্তু এর শাসকদের হত্যা করা হ'লে পুরো এলাকার নিরাপত্তার দায়িত্ব চলে আসে খোয়ারিযম শাহের উপর। যা সামাল দেওয়া তার পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ে। কাশগড় ও বালাসাগুনের নেতারা খোয়ারিযম শাহের ব্যবসা-বাণিজ্যের সকল পথ বন্ধ করে দেয়। তাদের বিশ হাযারের একটি দল সমবেত হয়। যারা বিভিন্ন উপদলে বিভক্ত ছিল। যারা একে অপরের প্রতি নির্ভরশীল ছিল। তারা তুর্কিস্তানে চলে যায়। সেখানে খোয়ারিযম শাহের সৈন্য ও কর্মকর্তার সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয় এবং বহু শহর দখল করে নেয়। খোয়ারিযম শাহের অবশিষ্ট সৈন্যরা ফিরে আসে এবং তারা তাতারদের হাত থেকে রক্ষা পায়। এক্ষেত্রে তিনি ধৈর্যধারণ করেন। তাছাড়া তিনি দেখলেন যে, সরাসরি যুদ্ধের মাধ্যমে তার রাজ্য বিস্তার সম্ভব নয়। এজন্য তিনি তুর্কিস্তানকে তাদের জন্য ছেড়ে দেন। তিনি দৃঢ়ভাবে এটি স্থির করে নেন যে, তুর্কিস্তান তাদের জন্যই। আর এটা ব্যতীত মা-ওয়ারাউন নাহারের অন্যান্য রাজ্য যেমন সামারকান্দ, বুখারা এবং অন্যান্য রাজ্যসমূহ খোয়ারিযম শাহের জন্য। এভাবে চার চারটি বছর অতিক্রান্ত হ'ল। অপরদিকে চেঙ্গীস খান চিন্তা করে দেখলেন যে, তাতারদের একটি অংশের নির্দিষ্ট কোন ভূখণ্ড নেই। তিনি রাজ্য বিস্তারে মনোযোগী হ'লেন। তিনি সকলের নেতা হওয়ার মনস্কামনা করলেন। শুরু হ'ল বিজয়াভিযান। চীন সীমান্তে বসবাসরত সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে অভিযানে নেমে পড়লেন। অবশেষে তারা তুর্কিস্তানের সীমান্তে পৌঁছে যান এবং তথাকার সীমান্ত রক্ষীদের সাথে যুদ্ধ করে বিজয় লাভ করেন।[৮]

তাতার ব্যবসায়ীদের হত্যা :

তাতার নেতা চেঙ্গীস খান নিজ এলাকা ছেড়ে তুর্কিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চলে অভিযানে বেরিয়ে পড়েন। অন্য দিকে ব্যবসায়ী ও তুর্কীদের একটি দল স্বর্ণ-রৌপ্যসহ পরিধেয় বস্ত্র ক্রয়ের জন্য সামারকান্দ ও বুখারার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়। কোন বর্ণনায় রয়েছে, চেঙ্গীস খান তার নিজের ও পরিবার-পরিজনের জন্য পোশাকাদি ক্রয় করার জন্য ব্যবসায়ীদের পাঠিয়েছিলেন। তারা খোয়ারিযম শাহের দখলকৃত সর্বশেষ শহর আওয়াতুরারে অবস্থান গ্রহণ করে। এদের গমন সম্পর্কে জানতে পেরে তথাকার গভর্নর তাদের ব্যাপারে করণীয় জানতে চেয়ে খোয়ারিযম শাহের নিকট পত্র লিখেন। তিনি তাতে এও লিখেন যে, তাদের নিকট বহু অর্থ-সম্পদ রয়েছে। তিনি এ সংবাদ জানতে পেরে গভর্নরকে নির্দেশ দেন যে, ব্যবসায়ীদের হত্যা করে তাদের সাথে থাকা যাবতীয় সম্পদ তার নিকট পাঠিয়ে দিবে। গভর্নর তাই করলেন। খোয়ারিযম শাহের নিকট সেগুলো পৌঁছলে তিনি তা বুখারা ও সামারকান্দের ব্যবসায়ীদের মাঝে বিতরণ করে তার কিছু মূল্য নিজেও নিলেন। এদের হত্যা করে খোয়ারিযম শাহ

** নিয়ামতপুর, নওগাঁ।*

১. *আল-কামিল ১০/৩৩৩।*
২. *ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াহ ১৩/৮৭-৮৮; আল-কামিল ১০/৩৩৪।*
৩. *শারহু নাহজিল বালাগাহ ৮/২২।*
৪. *আল-কামিল ১০/৩৩৫; আল-বিদায়াহ ১৩/৮২; শারহু নাহজিল বালাগাহ ৮/২১৯।*
৫. *বুখারা ও সামারকান্দ উজবেকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত মসজিদ, মাদরাসা সহ বহু ঐতিহাসিক স্থাপনা সমৃদ্ধ দু'টি শহর।*
৬. *বর্তমান কিরঘিজিস্তানের চুই প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত একটি শহর।*
৭. *বর্তমান চীনের স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল জিনজিয়াংয়ের অন্তর্ভুক্ত তাজিকিস্তান ও কিরঘিজিস্তান সীমান্তবর্তী মরুদ্যানবিশিষ্ট ঐতিহাসিক একটি শহর।*
৮. *আল-কামিল ১০/৩৩৫; আল-বিদায়াহ ১৩/৮২; শারহু নাহজিল বালাগাহ ৮/২১৮-২১৯।*

তাতার গোষ্ঠী ও তাদের নেতা, তাদের সংখ্যা, তাদের সাথে থাকা তুর্কীদের পরিমাণ ও তাদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য গোয়েন্দা প্রেরণ করেন। গোয়েন্দারা দীর্ঘ দিন পর ফিরে এসে সংবাদ দিল যে, তারা সংখ্যায় অগণিত, যুদ্ধে অকুতোভয়, আল্লাহর সৃষ্টি জগতে মহা ধৈর্যশীল ও অপরাজিত। তারা নিজেরাই স্বহস্তে অস্ত্র তৈরী করে। এই বর্ণনা শুনার পর খোয়ারিযম শাহ ব্যবসায়ীদের হত্যা ও তাদের সম্পদ লুণ্ঠন করার কথা স্মরণ করে লজ্জিত হ'লেন।[৯] তিনি বিমর্ষ হয়ে তাঁর আস্থাভাজন বিশিষ্ট ফকীহ ও চিন্তাবিদ শিহাব খুয়ূফীর (الشِّهَابُ الْخُيُوفِي) নিকট গমন করে তার নিকট করণীয় সম্পর্কে পরামর্শ চেয়ে বললেন, বিরাট ঘটনা ঘটে গেছে যার জন্য সুচিন্তিত পরামর্শের প্রয়োজন। কারণ বিশাল তাতার বাহিনী আমাদের দেশে আক্রমণের জন্য এগিয়ে আসছে। ফক্বীহ ছাহেব পরামর্শ দিলেন, আমাদের সৈন্যও তো অনেক। আমরা সৈন্য সমাবেশ ঘটাব এবং যুদ্ধ যাত্রায় সাধারণ জনগণের অংশগ্রহণ বৈধ করে দিব। আপনাকে জান-মাল দিয়ে সাহায্য করা মুসলমানদের জন্য আবশ্যক হয়ে যাবে। অতঃপর সকল সৈন্যকে সাথে নিয়ে সায়হুন[১০] (سَيْحُونَ) নদীর তীরে অবস্থান গ্রহণ করব। এরপর নদী পাড়ি দিয়ে শত্রুরা আগমন করলে আমরা তাদের প্রতিহত করব। তারা দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে থাকবে। আর আমরা নিজ ভূমিতে আরামে থেকে যুদ্ধ করব। অবশেষে তারা ব্যর্থ হয়ে ফিরে যাবে। পরামর্শ শুনে খোয়ারিযম শাহ তার মন্ত্রীবর্গ ও সেনা কর্মকর্তাদের নিয়ে বৈঠকে বসলেন। তাদের কাছে পরামর্শ চাইলে নেতারা ফকীহ ছাহেবের বিপরীত পরামর্শ দিল। তারা বলল, আমরা তাদের নদী পাড়ি দিয়ে তীরে উঠতে দিব। তারা এই সংকীর্ণ ভূমি ও পাহাড় অতিক্রম করবে। তারা পথ সম্পর্কে অজ্ঞাত। আর আমরা পূর্ণ জ্ঞাত। আমরা সুযোগ বুঝে তাদের উপর হামলা করতে পারব।[১১]

চেঙ্গীস খানের দূতকে হত্যা :

আলোচনা-পর্যালোচনার মধ্যেই চেঙ্গীস খানের দূত একদল গোয়েন্দা নিয়ে হাযির। যারা খোয়ারিযম শাহকে ধমকিয়ে বলছিল, তোমরা আমাদের সাথী ও ব্যবসায়ীদের হত্যা করেছ। তাদের থেকে আমাদের সম্পদ ছিনিয়ে নিয়েছ! যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ কর। আমরা তোমাদের নিকট এমন সৈন্য বাহিনী নিয়ে আগমন করব যা তোমরা ইতিপূর্বে দেখনি। অপরদিকে চেঙ্গীস খান তুর্কিস্তানের দিকে অভিযান পরিচালনা করে কাশগড়, বেলাসাগূন, এবং অত্র অঞ্চলের সকল শহর দখল করে পূর্ব থেকে দখলকারী আরেকটি তাতার গোষ্ঠীকে অপসারণ করেন। খোয়ারিযম শাহ এসকল সংবাদ জানতে পেরে চেঙ্গীস খানের দূতকে হত্যা করেন এবং সাথে থাকা গোয়েন্দাদের দাড়ী মুণ্ডন করে পাঠিয়ে দেন। তাতার গোয়েন্দাদের এ সংবাদ দিয়ে চেঙ্গীস খানের নিকট পাঠিয়ে দেওয়া হয় যে, হে চেঙ্গীস খান! খোয়ারিযম শাহ আপনাকে বলেছেন যে, أَنَا سَائِرٌ إِلَيْكَ وَلَوْ أَنَّكَ فِي آخِرِ الدُّنْيَا، حَتَّى أَنْتَقِمَ، وَأَفْعَلَ بِكَ كَمَا فَعَلْتُ بِأَصْحَابِكَ 'আপনি পৃথিবীর শেষ প্রান্তে অবস্থান করলেও আমি সেখানে উপস্থিত হয়ে প্রতিশোধ নিব। আপনার সাথে সেই আচরণই করব যে আচরণ আপনার সাথীদের সাথে করেছি'। অর্থাৎ আপনাকে হত্যা করা হবে।[১২] খোয়ারিযম শাহ প্রস্তুতি নিলেন। সৈন্য নিয়ে দ্রুত চীনের পথে রওয়ানা দিলেন। চার মাসের পথ অতিক্রম করে তাদের আবাসভূমিতে পৌঁছে গেলেন। কিন্তু নারী-শিশু ও বৃদ্ধদের ব্যতীত কাউকে সেখানে পেলেন না। তাদের উপর হামলা করে বহু গণীমতের সম্পদ হস্তগত করলেন এবং নারী ও শিশুদের বন্দি করলেন। তাতারদের বাড়িতে না থাকার কারণ হ'ল- তারা তুর্কী শাসক কেশলুখানের বিরুদ্ধে অভিযানে গিয়েছিল। তারা তুর্কীদের সাথে যুদ্ধ করে তাদের পরাজিত করে এবং বহু গণীমতের মাল লাভ করে। তারা বাড়ি ফিরার পথে মুসলমানদের আগমন ও নারী-শিশুদের বন্দির কথা জানতে পারে। দ্রুত পথ চলা শুরু করলে তারা মুসলমানদের তাদের আবাস ভূমিতে পেয়ে যায়। মুসলমানরা তাদের আগমনের কথা জানতে পেরে সেখানেই যুদ্ধের জন্য কাতার বন্দি হয়ে গেল। উভয় দলের মধ্যে ইতিহাসের এক ভয়াবহ ও অশ্রুতপূর্ব যুদ্ধ সংঘটিত হ'ল। তিনদিন তিনরাত অনবরত যুদ্ধ চলতে থাকলেও জয়-পরাজয়ের ফলাফল নিশ্চিত হ'ল না। কিন্তু উভয় পক্ষের অসংখ্য সৈন্য নিহত হ'ল। মুসলমানগণ তাদের দ্বীন রক্ষার্থে এবং পরাজয় হ'লে তাদের অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যাবে একথা ভেবে চরম ধৈর্যের পরিচয় দিলেন। অপরদিকে তাতাররা তাদের পরিবার-পরিজন ও সম্পদ রক্ষার্থে যুদ্ধে চরম ধৈর্যের পরিচয় দেয়। যুদ্ধ এমন কঠিন রূপ ধারণ করে যে, তাদের অনেকে স্বীয় ঘোড়া থেকে নেমে পায়ে হেঁটে প্রতিপক্ষের সাথে লড়াই করতে থাকে এবং পরস্পরকে ছুরিকাঘাত করতে থাকে। এতে আহত-নিহতদের রক্ত মাটিতে গড়াতে থাকে। রক্ত প্রবাহিত হয়ে রাস্তা পিচ্ছিল হয়ে যাওয়ায় ঘোড়া পিছলিয়ে যাচ্ছিল। উভয় দলের সৈন্যদের শক্তি ও ধৈর্য নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু দেশ-জাতি ও সম্মান রক্ষার লড়াই থেকে কেউ পিছপা হচ্ছিল না। এই যুদ্ধে তাতারদের নেতৃত্ব দিচ্ছিল চেঙ্গীস খানের ছেলে। চেঙ্গীস খান এ যুদ্ধ সম্পর্কে জানতেন না এবং তিনি তা অনুভব করতেও পারেননি। কারণ এ সময় তিনি কেশলুখানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে গিয়েছিলেন। এ যুদ্ধে প্রায় বিশ হাযার মুসলিম শাহাদত বরণ

৯. *আল-কামিল ১০/৩৩৫; আল-বিদায়াহ ১৩/৮৮; শারহু নাহজিল বালাগাহ ৮/২২০-২২১; ড. হাসান ইবরাহীম হাসান, তারীখুল ইসলাম ৪/১৩৬।*

১০. *উজবেকিস্তানের বুক চিরে প্রবাহিত একটি নদী।*

১১. *আল-কামিল ১০/৩৩৫; আল-বিদায়াহ ১৩/৮২; শারহু নাহজিল বালাগাহ ৮/২২১-২২২; তারীখুল ইসলাম ৪/১৩৬।*

১২. *আল-কামিল ১০/৩৩৫; শারহু নাহজিল বালাগাহ ৮/২২২; তারীখুল ইসলাম ৪/১৩৬।*

করেন এবং অসংখ্য কাফের নিহত হয়।[১৩] চতুর্থ রাতে প্রত্যেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল। কারণ উভয় পক্ষই যুদ্ধকে এড়িয়ে যাচ্ছিল। রাত্রি গভীর হ'লে উভয় দলের সৈন্যরা আলো জ্বালিয়ে স্বঅবস্থানে ফিরে গেল। এরপর তাতাররা তাদের আধ্যাতিক নেতা চেঙ্গীস খানের নিকট ফিরে গেল। মুসলমানগণও বুখারায় ফিরে এসে তাতারদের অবরোধ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করল। কারণ যেখানে চেঙ্গীস খানের অনুপস্থিতি সত্ত্বেও খোয়ারিযম শাহের সৈন্যরা বিজয় লাভ করতে পারল না সেখানে চেঙ্গীস খান নিজে তার সকল সৈন্য নিয়ে মুসলিম সম্রাজ্যে প্রবেশ করলে তাদের ঠেকানো অসম্ভব। খোয়ারিযম শাহ বুখারা ও সামারকান্দবাসীকে অবরোধের জন্য প্রস্তুতি নিতে বললেন এবং প্রয়োজনীয় খাদ্য সামগ্রী সংগ্রহে রাখার পরামর্শ দিলেন। এরপর বুখারা ও সামারকান্দ হেফাযতের জন্য বুখারায় বিশ হাযার ও সামারকান্দে পঞ্চাশ হাযার সৈন্য মোতায়েন করে বললেন, احْفَظُوا الْبَلَدَ حَتَّى أَعُودَ إِلَى خُوَارَزْمَ وَخُرَاسَانَ وَأَجْمَعَ الْعَسَاكِرَ وَأَسْتَنْجِدَ بِالْمُسْلِمِينَ وَأَعُودَ إِلَيْكُمْ 'তোমরা দেশকে হেফাযত করবে যতক্ষণ না আমরা খোয়ারিযম ও খোরাসানে ফিরে এসে সৈন্য সমাবেশ ঘটাই এবং মুসলমানদের সাহায্য চেয়ে তোমাদের নিকট প্রত্যাবর্তন করি'।[১৪] এভাবে উপদেশ দিয়ে তিনি খোরাসানের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লেন। তিনি জায়হুন (جَيْحُونَ) নদী পাড়ি দিয়ে বালখের সন্নিকটে সৈন্য সমাবেশ ঘটালেন।[১৫]

বুখারা ধ্বংসে তাতার বাহিনী :

অন্যদিকে তাতার বাহিনী চেঙ্গীস খানের নেতৃত্বে পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে নদী পাড়ি দিয়ে মুসলিম সম্রাজ্যে প্রবেশের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিল। খোয়ারিযম শাহের বুখারায় পৌছার পাঁচ মাস পর তারা সেখানে উপস্থিত হ'ল। তারা শহরকে অবরোধ করে ফেলল। মুসলিম সৈন্যরা বাধা দেওয়ার চেষ্টা করে ব্যর্থ হ'ল। তিন দিন অনবরত কঠিন যুদ্ধ চলল। কিন্তু মুসলিম সৈন্যরা তাতার বাহিনীর সামনে টিকে থাকতে পারল না। তারা শহর ছেড়ে রাতের অন্ধকারে খোরাসানের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিল। সকাল হ'লে শহরবাসী লক্ষ্য করে দেখল যে, কোন মুসলিম সৈন্য নেই। নিরূপায় হয়ে তারা কাযী বদরুদ্দীন খানকে (بَدْرُ الدِّينِ قَاضِي خَانْ) নিজেদের নিরাপত্তার জন্য তাতার বাহিনীর কাছে প্রেরণ করল। তারা জনগণের নিরাপত্তা প্রদান করল। কিছু মুসলিম সৈন্য যারা পলায়নে সক্ষম হয়নি তারা দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করল। জনগণের নিরাপত্তার কথা শ্রবণ করে তারাও বাইরে বেরিয়ে আসল এবং ৬১৬ হিজরী সনের ৪ই যিলহজ্জ সোমবার শহরের মূল ফটক উন্মুক্ত করে দিল। এরপর কাফেররা বিনা বাধায় বুখারায় প্রবেশ করল। তারা প্রবেশকালীন সময়ে মুসলমানদের সাথে কৃত্রিম ন্যায়পরায়ণতা ও সুন্দর আচরণ প্রদর্শন করল। যদিও তাদের ভিতরে বিরাট দুরভিসন্ধি ছিল। বরং তারা তখন বলছিল, সুলতানের যে সকল সম্পদ তোমাদের নিকট আছে তার সবগুলো আমাদের নিকটে জমা কর। দুর্গে অবস্থানকারী সৈন্যদের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সহায়তা কর। চেঙ্গীস খান নিজে শহরে প্রবেশ করে দুর্গ অবরোধ করলেন। তিনি শহরবাসীর উদ্দেশ্যে ঘোষণা করলেন, بِأَنْ لَا يَتَخَلَّفَ أَحَدٌ وَمَنْ تَخَلَّفَ قُتِلَ 'কেউ পশ্চাৎগামী হবে না। যে ব্যক্তি পশ্চাৎগামী হবে তাকে হত্যা করা হবে' অর্থাৎ এখানে সবাই উপস্থিত হবে। অন্যথা হত্যা করা হবে। সকলে উপস্থিত হ'লে তিনি তাদেরকে গভীর গর্ত খনন করতে নির্দেশ দেন। তারা কাঠ, শক্ত মাটি ইত্যাদি দ্বারা গর্ত খনন করলে কাফেররা মসজিদের মিম্বার ও মুসলমানদের ঘরে থাকা কুরআনের অংশগুলো এনে গর্তে নিক্ষেপ করে। ইন্না লিল্লাহ! আল্লাহ ধৈর্যশীল ও সহনশীল না হ'লে ভূমি ধ্বসিয়ে তাদের ধ্বংস করে দিতেন।[১৬] এরপর তারা দুর্গের দিকে মনোনিবেশ করে। সেখানে চারশত অশ্বারোহী মুসলিম সৈন্য অবস্থান করছিল। তারা বারো দিন অক্লান্ত চেষ্টা করে কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ অব্যাহত রাখল। তাতারদের কিছু সৈন্যও নিহত হ'ল। কিন্তু তারা আক্রমণ অব্যাহত রাখলে মুসলিম সৈন্যরা দিশেহারা হয়ে পড়ল। অবশেষে তারা সামনে অগ্রসর হয় এবং তাদের বিশেষ বাহিনী দুর্গের প্রাচীরের নিকট পৌঁছতে সক্ষম হয়। এরপর প্রচণ্ড যুদ্ধ শুরু হয়। কিছুক্ষণ পরে মুসলিম সৈন্যরা তাদের সাথে থাকা পাথর, আগুন ও তীর তাতারদের সামনে নিক্ষেপ করে। এতে অভিশপ্তরা রাগান্বিত হয়ে সেদিনের মত যুদ্ধ বন্ধ করে। পরের দিন নতুন করে প্রচণ্ড যুদ্ধ শুরু হয়। কিন্তু দুর্গে অবস্থানকারী মুসলিম সৈন্যরা ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে পড়ায় বেশিক্ষণ টিকতে পারল না। কাফেররা প্রচণ্ড হামলা চালিয়ে দুর্গে প্রবেশ করল। মুসলমানদের শেষ ব্যক্তি জীবিত থাকা পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে শাহাদত বরণ করল। এরপর স্থানীয় ব্যবসায়ী ও নেতাদের উপস্থিত হ'তে নির্দেশ দেওয়া হ'ল। তারা উপস্থিত হ'লে চেঙ্গীস খান তাদেরকে বললেন, أُرِيدُ مِنْكُمُ النُّقْرَةَ الَّتِي بَاعَكُمْ خُوَارَزْم شَاهْ، فَإِنَّهَا لِي، وَمِنْ أَصْحَابِي أُخِذَتْ، وَهِيَ عِنْدَكُمْ 'আমি তোমাদের থেকে ঐ স্বর্ণ-রৌপ্য চাই, যেগুলো খোয়ারিযম শাহ তোমাদের নিকট বিক্রয় করেছেন। কেননা সেগুলো আমার ও আমার সাথীদের থেকে নিয়ে নেওয়া হয়েছে। আর সেগুলো এখন তোমাদের নিকট'।[১৭] এই নির্দেশের পর যার নিকট যা ছিল তা তার সামনে হাযির করল। এরপর তাদের সম্বলহীন অবস্থায় শহর ছেড়ে চলে যেতে বলা হ'ল। মুসলিম জনগণ এমন অবস্থায় বাড়ি থেকে

---

১৩. *আল-কামিল ১০/৩৩৮; আল-বিদায়াহ ১৩/৮৮-৮৯; শারহু নাহজিল বালাগাহ ৮/২২২-২২৩।*

১৪. *আল-কামিল ১০/৩৩৮; শারহু নাহজিল বালাগাহ ৮/২২৪।*

১৫. *আল-কামিল ১০/৩৩৮।*

১৬. *আল-কামিল ১০/৩৩৯; শারহু নাহজিল বালাগাহ ৮/২২৪; তারীখুল ইসলাম ৪/১৩৭।*

১৭. *আল-কামিল ১০/৩৪০; শারহু নাহজিল বালাগাহ ৮/২২৫।*

বের হ'ল যে, তাদের পরণের কাপড় ব্যতীত আর কিছুই ছিল না। এবার কাফেররা তাদের শহরে প্রবেশ করে বাড়ি বাড়ি তল্লাশি চালিয়ে যাদেরকে গৃহে পেল তাদের হত্যা করে সকল সম্পদ লুটে নিল। এরপর অসহায় সম্বলহীন মুসলমানদের চারদিক থেকে ঘিরে ফেলল। অতঃপর তাদেরকে হত্যা করার জন্য নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নিল। সেদিন ছিল মুসলমানদের জন্য এক কঠিন দিন। সর্বত্র কান্নার রোল পড়ে গেল। তারা বুখারা নগরীতে তাণ্ডব লীলা চালালো। শহর এমনভাবে ধ্বংস করল যেন এখানে কোন শহর ছিল না।[১৮] শহরে আগুন লাগিয়ে ঘর-বাড়ি, মসজিদ, মাদরাসা পুড়িয়ে ছারখার করে দিল। ফলে ইবাদত-বন্দেগী ও জ্ঞান অর্জনের সকল দরজা বন্ধ হয়ে গেল। তারা নারীদেরও ভাগ করে নিল। বাবার সামনে মেয়েকে, ভাইয়ের সামনে বোনকে ধর্ষণ করা হচ্ছিল। বাধা দেওয়ার মত ক্ষমতা মুসলমানদের ছিল না। তদুপরি অনেকে বাধা দিতে গিয়ে কাফেরদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হন এবং অবশেষে শাহাদতের অমিয় শুধা পান করেন। আবার অনেকে মুসলমানদের দুরবস্থা দেখে মৃত্যু কামনা করছিলেন।[১৯]

সামারকান্দের পথে রওয়ানা :

তাতার বাহিনী বুখারা ধ্বংস করে সামারকান্দের পথে রওয়ানা হয়। সাথে নেয় মুসলিম বন্দিদের। উদ্দেশ্য ছিল এর মাধ্যমে অন্য মুসলমানদের ভয় দেখানো। তারা বালখ ও তিরমীযের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থান নেয়। মুসলিম বন্দিদের কঠিন যন্ত্রণা দিয়ে নির্মমভাবে হাঁটিয়ে নিয়ে যায়। যারা তাদের সাথে হেঁটে যেতে অপারগতা প্রকাশ করে বা অক্ষম হয় তাদেরকে হত্যা করে। সামারকান্দের সন্নিকটে পৌঁছে তারা প্রথমে অশ্বারোহীদের পাঠিয়ে দেয় এবং পদাতিক, বন্দি ও বৃদ্ধদের পিছনে রেখে দেয়। এরপর দলে দলে তাদের পাঠাতে থাকে। যাতে মুসলমানদের হৃদয়ে ভীতি সঞ্চারিত হয়। দ্বিতীয় দিন তারা শহরের উপকণ্ঠে পৌঁছল। প্রত্যেক দশজন বন্দির হাতে একটি করে পতাকা তুলে দিল। এতে শহরবাসী মনে করল তাদের প্রত্যেকেই যোদ্ধা। তারা শহর অবরোধ করল। তখন সেখানে খোয়ারিযম শাহের পঞ্চাশ হাযার সৈন্য অবস্থান করছিল। তাছাড়া অসংখ্য জনগণ তাতারদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত ছিল। কিন্তু সৈন্যদের কেউ ভয়ে তাতারদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নামল না। সাধারণ জনগণের মধ্যে বীর পুরুষেরা যার কাছে যা ছিল তা নিয়ে তাতারদের বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ল। প্রচণ্ড যুদ্ধ করে তাতারদের পিছু হটাতে সক্ষম হ'ল। কিন্তু জনগণ তাতারদের পাতানো ফাঁদে আঁটকে পড়ল। তারা যখন যুদ্ধ করতে করতে গ্রামের বাইরে মাঠে গিয়ে উপনীত হ'ল। তখন তাতারদের পিছনে থাকা অশ্বারোহী সৈন্যরা চারদিক থেকে ঘিরে ফেলল। সেখানে প্রচণ্ড যুদ্ধে প্রায় সত্তর হাযার জনগণ শাহাদত বরণ করল। এ অবস্থা দেখে খোয়ারিযম শাহের সৈন্যরা আরো ভীত-সন্ত্রস্ত ও দুর্বল হয়ে পড়ল। সৈন্যদের অবস্থা দেখে সাধারণ জনতা ভীত-বিহ্বল হয়ে পড়ল। এদিকে সৈন্যরাও নিজেদের মৃত্যুর ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে গেল। তারা বলাবলি করছিল যে, আমরা সৈন্য হওয়া সত্ত্বেও আমাদেরকে তাতাররা হত্যা করল না! আমরাওতো তুর্কী, ফলে তারা তাদের নিকট নিরাপত্তার আবেদন করল। তারা মুসলমানদের হত্যার বিষয়টি গোপন রেখে প্রকাশ্যে নিরাপত্তা দান করল। এরপর শহরের দরজা খুলে দেওয়া হ'ল। জনগণ পরিবার-পরিজন ও ধন-সম্পদ সাথে নিয়ে কাফেরদের সামনে বেরিয়ে আসল। কাফেররা তখন তাদেরকে বলল, তোমাদের অস্ত্র, ধন-সম্পদ ও বাহন আমাদের কাছে সমর্পণ কর। আমরা তোমাদেরকে নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দিব। মুসলমানরা তাই করল। তাদের অস্ত্র ও বাহন হস্তগত হ'লে তাতাররা হত্যাকাণ্ড শুরু করে দিল। মুসলমান পুরুষদের হত্যা ও নারীদেরকে বন্দি করা হ'ল। চতুর্থ দিন তারা শহরে ঘোষণা করল যে, প্রত্যেকে যেন স্বপরিবারে বাড়ি থেকে বাইরে বেরিয়ে আসে। এরপরেও যারা বাড়িতে অবস্থান করবে তাদেরকে হত্যা করা হবে। ভয়ে সকল নারী-পুরুষ ও শিশুরা বাইরে বেরিয়ে আসল। তাতাররা সামারকান্দবাসীর সাথে ঐ আচরণ করল যা করেছিল বুখারাবাসীর সাথে। তারা শহরে প্রবেশ করে সকল সম্পদ লুণ্ঠন করল এবং মসজিদ ও প্রতিষ্ঠান সমূহে আগুন লাগিয়ে দিল। এই নিষ্ঠুর জাতি বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদেরও হত্যা করল। ইতিহাসের এ নির্মম ঘটনা ঘটে ৬১৭ হিজরী সালের মুহাররম মাসে।[২০]

খোয়ারিযম শাহের পরাজয় ও মৃত্যু :

খোয়ারিযম শাহ সামারকান্দবাসীকে সাহায্য করার জন্য প্রথমে দশ হাজার ও পরে বিশ হাজার অশ্বারোহী সৈন্য প্রেরণ করেন কিন্তু তারা ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসে। চেঙ্গীস খান সামারকান্দ দখল করে খোয়ারিযম শাহের দিকে মনোনিবেশ করেন। তিনি সৈন্যদের মাঝে ঘোষণা দেন যে, اُطْلُبُوا خُوَارَزْم شَاهْ أَيْنَ كَانَ، وَلَوْ تَعَلَّقَ بِالسَّمَاءِ، حَتَّى تُدْرِكُوهُ وَتَأْخُذُوهُ 'তোমরা খোয়ারিযম শাহকে খোঁজে বের কর যেখানে অবস্থান করুক তিনি, আকাশে ঝুলে থাকলেও তোমরা তার কাছে পৌঁছবে এবং তাকে পাকড়াও করবে'। তাতারদের এই দলটিকে মুগার্‌রিবাহ (الْمُغَرِّبَةَ) বলা হয়। কারণ তারা খোরাসানের পশ্চিম অঞ্চলে অভিযানে বেরিয়েছিল।[২১] তারা গোয়েন্দা সূত্রে খোয়ারিযম শাহের অবস্থান জানতে পেরে বাঞ্জাআব্‌[২২] (بَنْج آب) নামক স্থানের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হ'ল। কিন্তু সেখানে গিয়ে তারা নদী পাড়ি দেওয়ার নৌকা না পেয়ে অস্থির হয়ে পড়ল। তবে তারা বসে থাকেনি। তারা কাঠ দিয়ে একটি হাওয তৈরি করে তাতে গরুর চামড়া পরিয়ে দিল।

১৮. *আল-কামিল ১০/৩৪০-৩৪১; শারহু নাহজিল বালাগাহ ৮/২২৫; তারীখুল ইসলাম ৪/১৩৭।*
১৯. *আল-কামিল ১০/৩৪০-৩৪১; শারহু নাহজিল বালাগাহ ৮/২২৫; তারীখুল ইসলাম ৪/১৩৬।*
২০. *আল-কামিল ১০/৩৪১; তারীখুল ইসলাম ৪/১৩৭।*
২১. *আল-কামিল ১০/৩৪১; শারহু নাহজিল বালাগাহ ৮/২২৬।*
২২. *সামারকান্দের একটি এলাকা।*

যাতে তাতে পানি প্রবেশ না করে। এরপর তার মধ্যে তাদের অস্ত্র ও অন্যান্য আসবাব পত্র রেখে দেয়। তারপর হাওযকে নিজেদের সাথে বেঁধে দেয় এবং নিজেরা ঘোড়ার লেজ ধরে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এভাবে তারা একবারেই নদী অতিক্রম করতে সক্ষম হয়।[২৩] প্রথমে খোয়ারিযম শাহ তাদের উপস্থিতি বুঝতে পারেননি। ভীত-সন্ত্রস্ত মুসলিম বাহিনী তাতারদের প্রতিহত করতে গিয়ে ব্যর্থ হয় এবং বিচ্ছিন্ন হয়ে পলায়ন করে। খোয়ারিযম শাহ আত্মরক্ষা করতে তার বিশেষ ব্যক্তিদের সাথে নিয়ে নিসাপুরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। তাতাররাও তাকে অনুসরণ করে চলতে থাকে। সেখানেও মুসলমানেরা তাদের প্রতিহত করতে ব্যর্থ হয়। তিনি জীবন রক্ষার জন্য তার শাসিত মাযান্দারানের[২৪] পথে রওয়ানা দেন। তাতার বাহিনীও তার পিছু পিছু রওয়ানা দেয়। এরপর তিনি তাবারিস্তানের মারসায় উপনীত হন। সেখানে তিনি সঙ্গী-সাথীদের নিয়ে জাহাজে আরোহণ করেন। তাতাররা তাদের পিছু নেয় কিন্তু নাগাল না পেয়ে ফিরে আসে। নদীর তীরে একটি সুরক্ষিত দুর্গ ছিল যেখানে তিনি আশ্রয় গ্রহণ করেন। আর সেখানেই তার মৃত্যু হয়। অবশেষে তাতার বাহিনী খোয়ারিযম শাহের সাক্ষাতে ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসে।[২৫] তবে ড. হাসান ইবরাহীম হাসান ইবনুল আছীরের বরাতে বলেন, খোয়ারিযম শাহ তাতারদের ভয়ে এক শহর থেকে আরেক শহরে আশ্রয় নিতে থাকেন। কিন্তু তাতাররা তার পিছু ছাড়েনি। এমনকি তিনি রায় অতঃপর হামাদান হয়ে ইরাক সীমান্তে পলায়ন করেন।[২৬] কেউ কেউ বলেন, তিনি নদীতে ডুবে মারা যান। আবার কেউ বলেন, তিনি ভারত বর্ষে চলে আসেন এবং সেখানেই তার মৃত্যু হয়।[২৭] তবে সঠিক কথা হ'ল তাতারদের ভয়ে তার সার্বিক অবস্থানকে গোপন রাখা হয়।

খোয়ারিযম শাহ সম্পর্কে কিছু কথা :

তার নাম আলাউদ্দীন মুহাম্মাদ ইবনু আলাউদ্দীন তিকাশ। তিনি প্রায় বাইশ বছর ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি নিজে একজন আলেম ছিলেন এবং আলেমদের যথেষ্ট সম্মান করতেন। তিনি ফিক্বহ, উছূলসহ বিভিন্ন বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। বিশেষতঃ তিনি হানাফী ফিক্বহে ব্যাপক পারদর্শী ছিলেন। তার রাজত্ব প্রায় অর্ধেক বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছিল। কারণ তিনি সর্বাবস্থায় এই কাজে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছিলেন। সুলজূকী শাসনের পর তার মতো বিস্তৃত ভূমির অধিকারী আর কেউ হয়নি। ইরাক থেকে তুর্কিস্তান পর্যন্ত এবং আফগানিস্তানের গযনী, ভারতের কিছু অংশ, সিজিস্তান[২৮], কারমান[২৯], ত্বাবারিস্তান, জুরজান, বিলাদুল জিবাল, খোরাসান ও পারস্যের কিছু অংশসহ তিনি বহু এলাকার অধিকারী হন। এই অঞ্চলগুলো তার প্রতিনিধিদের নেতৃত্বে পরিচালিত হ'ত।[৩০] তিনি হানাফীদের জন্য বিরাট একটি মাদরাসাও নির্মাণ করে দেন।[৩১]

মাযান্দারান দখল ও অধিবাসীদের হত্যা :

তাতার মুগাররিবা বাহিনী খোয়ারিযম শাহকে পাকড়াও করতে ব্যর্থ হয়ে তার খোঁজে ও মাযান্দারান দখলের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেয়। খোয়ারিযম শাহ তাদের উপস্থিতি জানতে পেরে শহর ত্যাগ করে রায়ে চলে যান। তারা একধরনের বিনা বাধায় শহরটি দখল করে নেয়। এ শহরটিতে মুসলমানদের আধিপত্য থাকলেও তারা কোন সময় শহরটির দেখভাল করত না। তাতার বাহিনী শহরটি দখল করে কাউকে হত্যা কাউকে বন্দি এবং গচ্ছিত সম্পদ লুণ্ঠন করে। অতঃপর শহরে আগুন লাগিয়ে তা ধ্বংস করে দেয়।[৩২]

রায় নগরের পথে তাতার বাহিনী :

মাযান্দারান ধ্বংস ও দখল করে তাতার বাহিনী রায়ের পথে রওয়ানা দেয়। পথে তারা বাদশাহ খোয়ারিযম শাহের মা, স্ত্রী ও অঢেল সম্পদের সন্ধান পেয়ে যায়। এ সময় খোয়ারিযম শাহের মা ছেলের করুণ অবস্থা অবলোকন করে আত্মরক্ষার্থে বাসভবন ছেড়ে হামাদান ও ইস্ফাহানের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাস, তারা তাতার বাহিনীর হাতে ধরা পড়েন। এত পরিমাণ সম্পদ তারা পেয়েছিল যে, তা দেখে তাদের চোখ ছানাবড়া হয়ে যায় এবং হৃদয় ভরে যায়। এরূপ দুর্লভ ও মূল্যবান বস্তু তারা ইতিপূর্বে কখনো দেখেনি। এসকল সম্পদ তারা চেঙ্গীস খানের নিকট পাঠিয়ে দেয়।[৩৩] ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন, ثُمَّ تَرَحَّلُوا عَنْهَا نَحْوَ الرَّيِّ فَوَجَدُوا فِي الطَّرِيقِ أُمَّ خُوَارَزْمَ شَاهْ وَمَعَهَا أَمْوَالٌ عَظِيمَةٌ جِدًّا، فَأَخَذُوهَا وَفِيهَا كُلُّ غَرِيبٍ وَنَفِيسٍ مِمَّا لَمْ يُشَاهَدْ مِثْلُهُ مِنَ الْجَوَاهِرِ وَغَيْرِهَا 'এরপর তারা রায়ের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেয় এবং রাস্তায় খোয়ারিযম শাহের মাকে পেয়ে যায়। যার সাথে অঢেল সম্পদ ছিল। সেগুলো তারা নিয়ে নেয়। যাতে প্রত্যেক মূল্যবান ও দুর্লভ মনি-মুক্তার মত বহু সম্পদ ছিল যা পূর্বে দেখা যায়নি।[৩৪]

রায় ও হামাদানে তাতার বাহিনী :

৬১৭ হিজরী সালে তাতার বাহিনী রায় শহরে পৌঁছে যায়। উদ্দেশ্য খোয়ারিযম শাহকে খোঁজে বের করা। তাতার বাহিনীর সাথে স্বার্থান্বেষী কিছু মুসলিম সৈন্য ও সাধারণ

---

২৩. *আল-কামিল ১০/৩৪৩; তারীখুল ইসলাম ৪/১৩৮।*
২৪. *বর্তমান ইরানের অন্তর্ভুক্ত এবং কাস্পিয়ান সাগরের তীরবর্তী এলবুর্জ পর্বতমালার পাদদেশে অবস্থিত একটি প্রদেশ।*
২৫. *আল-কামিল ১০/৩৪৩; তারীখুল ইসলাম ৪/১৩৮; শারহু নাহজিল বালাগাহ ৮/২২৭।*
২৬. *তারীখুল ইসলাম ৪/১৩৮।*
২৭. *শারহু নাহজিল বালাগাহ ৮/২২৭।*
২৮. *বর্তমানে ইরানের সিস্তান নগরী।*
২৯. *ইরানের রাজধানী তেহরান থেকে এক হাযার কি.মি. দূরে অবস্থিত একটি গুরুত্বপূর্ণ শহর।*
৩০. *আল-কামিল ১০/৩৪৩; আল-বিদায়াহ ১৩/৮৯।*
৩১. *আল-বিদায়াহ ১৩/২৩।*
৩২. *আল-কামিল ১০/৩৪৪; শারহু নাহজিল বালাগাহ ৮/২২৭; তারীখুল ইসলাম ৪/১৩৮।*
৩৩. *আল-কামিল ১০/৩৪০-৩৪১; শারহু নাহজিল বালাগাহ ৮/২২৯; তারীখুল ইসলাম ৪/১৩৮।*
৩৪. *আল-বিদায়াহ ১৩/৮৯।*

দুর্বৃত্তরাও অংশগ্রহণ করে। যারা সম্পদের আশায় তাতারদের সাথে হাত মিলিয়েছিল। তারা এমন সময় রায়ে প্রবেশ করে যখন জনতা স্বীয় কর্মে ব্যস্ত। কেউবা ঘুমিয়ে দিনের ক্লান্তি দূর করছিল। তারা তাতারদের অনুপ্রবেশ সম্পর্কে অনুভব করতেও পারেনি। তারা শহরে প্রবেশ করে সম্পদ লুণ্ঠন, নারীদের বন্দি, শিশুদের চুরি এবং পুরুষদের হত্যা করে। তারা শহরে আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে দ্রুত হামাদানের পথে রওয়ানা হয়। সেখানেও ব্যাপক ধ্বংসলীলা চালায় যা ইতিহাসে কুখ্যাত হয়ে আছে। পথিমধ্যে তারা বহু গ্রাম ও শহরে লুণ্ঠন চালায় এবং নারী-পুরুষ ও শিশুদের নির্মমভাবে হত্যা করে।[৩৫] এরপর তারা হামাদানের পথে রওয়ানা দেয়। শহরের নিকটবর্তী হ'লে নেতারা অঢেল সম্পদ, কাপড় ও বাহন ইত্যাদি নিয়ে তাদের দরবারে উপস্থিত হয়। উদ্দেশ্য নিজেদের নিরাপত্তা প্রার্থনা করা। তাতার বাহিনী বহু সম্পদ ও বাহন পেয়ে তাদের নিরাপত্তা প্রদান করে। এরপর তারা হামাদান ছেড়ে যানজানের[৩৬] পথে রওয়ানা দেয়। সেখানেও বহু মানুষকে হত্যা ও সম্পদ লুণ্ঠন করে। অতঃপর ধ্বংসলীলা চালিয়ে কাযভীনের পথে রওয়ানা হয়। কাযভীনবাসী শহরে আশ্রয় গ্রহণ করে। কিন্তু তাতাররা অস্ত্রের জোরে শহরে প্রবেশ করলে শহরবাসী তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। যুদ্ধ ভয়াবহ রূপ ধারণ করে। এক পর্যায়ে যুদ্ধ সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। তখন তারা একে অপরকে ছুরিকাঘাত করতে থাকে। এতে উভয় পক্ষের অসংখ্য সৈন্য হতাহত হয়। ইবনুল আছীর বলেন, এতে চল্লিশ হাযারেরও বেশী কাযভীনবাসী মুসলিম নিহত হয়।[৩৭]

আযারবাইজানের পথে তাতার বাহিনী :

তাতার বাহিনী হামাদান ও বিলাদুল জিবালে প্রচণ্ড শীতে অস্থির হয়ে পড়ে। তাছাড়া সেখানে বরফ জামে যায়। তাদের জন্য অবস্থান করা কঠিন হয়ে পড়ে। তারা সেখান থেকে পলায়ণ করে আযারবাইজানের দিকে রওয়ানা হয়। পথে গ্রাম ও ছোট ছোট শহরগুলো অতিক্রম করার সময় অধিবাসীদের হত্যা ও ধন-সম্পদ লুণ্ঠন করে। গ্রাম ও শহরগুলোতে আগুন লাগিয়ে ধ্বংস করে দেয়। এরপর তারা তিবরীযের[৩৮] পথে রওয়ানা হয়। যেখানে অবস্থান করছিলেন আযারবাইজানের শাসনকর্তা আওযাব্‌ক বিন বাহ্‌লাওয়ান (أُوْزَبْكُ بْنُ الْبَهْلَوَانِ)। তিনি দিন-রাত মদ্যপান ও খেল-তামাশায় লিপ্ত থাকতেন। তাই তাতারদের ব্যাপারে তার কোন মাথা ব্যথা ছিল না। জ্ঞান ফিরলে তিনি প্রচুর ধন-সম্পদ, পোশাকাদি ও অগণিত বাহন পাঠিয়ে তাদের সাথে শান্তি চুক্তি করে। এরপর তারা আযারবাইজান ও তিরমীয ছেড়ে অতি ঠাণ্ডা, বরফ ও বৃষ্টি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য সমুদ্র তীরবর্তী এলাকা মুক্বানে[৩৯] চলে যায়। সেখানে ধ্বংশলীলা চালিয়ে 'কারাজ'[৪০] শহরের দিকে রওয়ানা হয়। তাদের প্রতিহত করতে দশ হাযার কারাজ বাহিনী গতিরোধ করে। কিন্তু তারা পরাজিত হয় এবং অধিকাংশই নিহত হয়। কারাজ নেতা মুসলিম ঐক্য গড়ে তুলার জন্য আওযাবকের নিকট লোক প্রেরণ করেন এবং আযারবাইজান নেতা তাতে সম্মতি দেন। অনুরূপভাবে তিনি জাযীরা ও খেলাত্বের নেতা আশরাফ বিন মালেক আল-আদেল (الْأَشْرَفُ ابْنُ الْمَلِكِ الْعَادِلِ)-এর নিকট পত্র প্রেরণ করেন। উদ্দেশ্য ছিল শীতকাল অতিবাহিত হ'লে ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধের মাধ্যমে তাতারদের প্রতিহত করা। কিন্তু তাতাররা এত দিন অপেক্ষা করল না। তারা শীতকালেই বরফ আচ্ছাদিত কারাজে ঢুঁকে পড়ে। তাদের সাথে যোগ দেয় আওযাবুকের অধিনস্ত তুর্কী রাজা আক্বওয়াস (أَقْوَشْ)। তিনি পাহাড়ী অঞ্চলের তুর্কী, কুর্দী ও অন্যান্য উপজাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে তাতারদের সহায়তার জন্য প্রেরণ করেন। তাতার বাহিনী তাদেরকে সাদরে গ্রহণ করে। কারণ তারা ছিল তাদেরই জাতির মানুষ। এরপর তারা কারাজে যৌথ অভিযান পরিচালনা করে বহু দুর্গ দখল করে নেয়। তারা এগুলোতে আশ্রয় গ্রহণকারীদের হত্যা করে, ধন-সম্পদ লুণ্ঠন করে এবং সেগুলোতে আগুন দিয়ে ধ্বংস করে দেয়। এ ঘটনাটি সংঘটিত হয় ৬১৭ হিজরী সালের যিলহজ্জ মাসে।[৪১] অতঃপর তারা তিফলীসের[৪২] সন্নিকটে পৌঁছলে সুলতান কারাজ তার সকল সৈন্য নিয়ে তাতারদের প্রতিহত করতে এগিয়ে আসে। জওয়াব দেওয়ার জন্য প্রথমে আক্বওয়াশের বাহিনী এগিয়ে আসে। এতে উভয় পক্ষের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ হয়। নিহত হয় আক্বওয়াশ বাহিনীর বহু সৈন্য। তারা টিকতে না পেরে তাতার বাহিনীর কাছে ফিরে যায়। অন্যদিকে কারাজ বাহিনীও ভয়াবহ যুদ্ধ করে ক্লান্ত হয়ে পড়ে। পরে তাতার বাহিনীর প্রচণ্ড হামলায় কারাজ বাহিনী পরাস্ত হয় এবং তাদের বহু সেনা নিহত হয়। তারা ধন-সম্পদ লুণ্ঠন করে এই শহরটিকেও আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেয়। এদের ধ্বংসলীলা লিখার সময় ইবনুল আছীর আক্ষেপ করে বলেন,

وَتَاللهِ لاَ شَكَّ أَنَّ مَنْ يَجِيءُ بَعْدَنَا، إِذَا بَعُدَ الْعَهْدُ، وَيَرَى هَذِهِ الْحَادِثَةَ مَسْطُورَةً يُنْكِرُهَا، وَيَسْتَبْعِدُهَا، وَالْحَقُّ بِيَدِهِ، فَمَتَى اسْتَبْعَدَ ذَلِكَ فَلْيَنْظُرْ أَنَّنَا سَطَّرْنَا نَحْنُ، وَكُلُّ مَنْ جَمَعَ التَّارِيخَ فِي أَزْمَانِنَا هَذِهِ فِي وَقْتٍ كُلُّ مَنْ فِيهِ يَعْلَمُ هَذِهِ الْحَادِثَةَ، اسْتَوَى فِي مَعْرِفَتِهَا الْعَالِمُ وَالْجَاهِلُ لِشُهْرَتِهَا-

৩৫. *আল-কামিল ১০/৩৪৫; আল-বিদায়াহ ১৩/৮৯; তারীখুল ইসলাম ৪/১৩৮; শারহু নাহজিল বালাগাহ ৮/২২৯।*
৩৬. *বর্তমান ইরানের একটি প্রদেশ।*
৩৭. *আল-কামিল ১০/৩৪৫; আল-বিদায়াহ ১৩/৮৯; তারীখুল ইসলাম ৪/১৩৮; শারহু নাহজিল বালাগাহ ৮/২৩০।*
৩৮. *বর্তমান ইরানের একটি শহর।*
৩৯. *আরমেনিয়ার একটি ছোট শহর।*
৪০. *বর্তমান জর্জিয়ার প্রাচীন নাম।*
৪১. *আল-কামিল ১০/৩৪৬; আল-বিদায়াহ ১৩/৮৯; তারীখুল ইসলাম ৪/১৩৯; শারহু নাহজিল বালাগাহ ৮/২৩০।*
৪২. *বর্তমান জর্জিয়ার রাজধানী এবং সবচেয়ে বড় শহর।*

Contents

'আল্লাহ্‌র কসম! যারা আমাদের পরে আগমন করবে ও সময় বহুকাল অতিক্রম করবে। আর দেখবে যে, এ ঘটনা লিপিবদ্ধ তারা অস্বীকার করবে, এটিকে দূরবর্তী ঘটনা মনে করবে। অথচ সত্য তাঁরই (আল্লাহ্‌রই) হাতে। অতএব যে ব্যক্তি উক্ত ইতিহাসকে অবিশ্বাস করবে সে যেন অবশ্যই চিন্তা করে যে, আমরা নিজেরাই তা লিখেছি। এমনকি আমাদের যুগের ঐতিহাসিকগণ যারা এ ঘটনা সম্পর্কে অবগত তাদের প্রত্যেকে এ বিষয়ে ইতিহাস সংকলন করেছেন। এর ব্যাপক পরিশুদ্ধতার কারণে জ্ঞানী-মূর্খ সকলে তা অবগত।[৪৩]

মারাগার[৪৪] উদ্দেশ্যে তাতার বাহিনী :

৬১৮ হিজরীর ছফর মাস। তাতার বাহিনী ৬১৭ হিজরী সন পর্যন্ত কারাজ শহরেই অবস্থান করে। এরপর সেখানে অবস্থান করাকে বিপদজনক মনে করে তিবরীযের পথে রওয়ানা দেয়। কিন্তু তিবরীযের শাসনকর্তা অঢেল ধন-সম্পদ, কাপড় ও বাহনের বিনিময়ে তাতারদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়ে যাওয়ায় তারা মারাগার উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেয়। তারা মারাগাহ শহরটিকে অবরোধ করে। মারাগার শাসনকর্তা নারী হওয়ায় প্রতিহত করার কেউ ছিল না। সে 'রুওয়ান্ডেয' (رُوَيْنْـــدِزَ) দুর্গে আত্মগোপন করে। আর রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْـــرَهُـمُ امْـــرَأَةً 'ঐ জাতি কখনও সফলকাম হ'তে পারে না, যারা নারীকে তাদের নেত্রী নির্বাচিত করে'।[৪৫] তারা যখন শহরটিকে অবরোধ করে ফেলল তখন শহরবাসী তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করল। তারা শহরের বাইরে মিনজানীক স্থাপন করে শহরের দিকে এগিয়ে গেল। তাতারদের নিয়ম ছিল মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হলে প্রথমে তারা মুসলিম বন্দিদের মানবঢাল হিসাবে ব্যবহার করত। তারা পলায়ণ করে চলে আসলে তাতাররা তাদের হত্যা করত। তারা নিজেদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করত। কারণ তারা নিশ্চিতভাবে জানত যে, সামনে গেলে হত্যা করা হবে এবং পলায়ন করলেও নিশ্চিত মৃত্যু। তাতাররা তাদের পিছনে থেকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করত। এভাবে তারা নিজেদেরকে নিরাপদ রাখত। তারা শহরে প্রবেশ করে দীর্ঘদিন অবস্থান করে। অতঃপর ৬১৮ হিজরীর ৪ ছফর পুরো শহর দখল করে নেয়। এরপর শুরু করে হত্যাকাণ্ড। যারা বাইরে বের হয় তাদের সকলকে হত্যা করে। প্রয়োজনীয় সম্পদগুলো লুণ্ঠন করে এবং অপ্রয়োজনীয়গুলোতে আগুন লাগিয়ে ধ্বংস করে দেয়। কিছু লোক বাড়ির গোপন স্থানে আত্মগোপন করে। তাতাররা তাদের বাইরে আনার জন্য এক প্রতারণার আশ্রয় গ্রহণ করে। তারা মুসলিম যুদ্ধবন্দিদের দ্বারা ঘোষণা দেয় যে, তাতার বাহিনী চলে গেছে। এই স্বস্তির ঘোষণা শুনে লোকেরা বাইরে আসলে তাদেরকে নৃশংস্বভাবে হত্যা করা হয়। ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন, وَقَتَلُوا مِنْ أَهْلِهِ خَلْقًا لَا يَعْلَمُ عِدَّتَهُمْ إِلَّا اللَّهُ عَزَّ وَجَـــلَّ 'তারা এত সংখ্যক মানুষকে হত্যা করে যে, এদের সংখ্যা মহান আল্লাহ ব্যতীত কেউ জানে না'। তারা বহু সম্পদ গণীমত হিসাবে লাভ করে ও বহু লোককে বন্দি করে।[৪৬]

একশ'জন মুসলিম তাতারদের ভয়ে আত্মরক্ষার্থে গিরিপথে আত্মগোপন করে। তাদের কেউ বাইরে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হচ্ছিল না। এক তাতার সৈনিক তাতে প্রবেশ করে এক এক করে তাদের সকলকে হত্যা করে। কেউ প্রতিহত করার সাহসটুকু পায়নি।[৪৭] এটি কোন ধরনের যুদ্ধ? কেমন মানবতা? এটি কোন ধরনের যুদ্ধনীতি? এটি কাপুরুষতার কোন স্তর? কোন ধর্মই এই ধরনের হত্যাকাণ্ড সমর্থন করে না।

তাতার মহিলা সৈনিকের কাণ্ড :

জনৈক পুরুষের পোশাক পরিহিত তাতার মহিলা সৈনিক এক মুসলিমের বাড়িতে প্রবেশ করে। অতঃপর একাই বাড়ির সকলকে হত্যা করে। সকলে তাকে পুরুষ মনে করছিল। সে কিছু লোককে বন্দিও করে। তার তাবুতে ফিরে এসে যুদ্ধের পোশাক খুললে একজন বন্দি বুঝতে পারে যে, সে একজন মহিলা। তখন সেই কয়েদী তাকে হত্যা করে।[৪৮] নারীরাও এত নিষ্ঠুর হয়, ইতিহাস অধ্যয়ন না করলে জানা যেত না।

দুর্ধর্ষ তাতার বাহিনীর বর্ণনা দিয়ে ইবনুল আছীর (রহঃ) বলেন,

مَنْ حَدَّثَكُمْ أَنَّ التَّتَرَ انْهَزَمُوا وَأُسِرُوا فَلَا تُصَدِّقُوهُ، وَإِذَا حُدِّثْتُمْ أَنَّهُمْ قَتَلُوا فَصَدِّقُوهُ، فَإِنَّ الْقَوْمَ لَا يَفِرُّونَ أَبَدًا، وَلَقَدْ أَخَذْنَا أَسِيرًا مِنْهُمْ، فَأَلْقَى نَفْسَهُ مِنَ الدَّابَّةِ وَضَرَبَ رَأْسَهُ بِالْحَجَرِ إِلَى أَنْ مَاتَ، وَلَمْ يُسَلِّمْ نَفْسَهُ

'তোমাদের নিকট যে বর্ণনা করবে যে, তাতার বাহিনী পরাজিত হয়েছে এবং বন্দি হয়েছে, তোমরা তাকে বিশ্বাস করবে না। আর যদি তোমাদের নিকট বর্ণনা করা হয় যে, তারা হত্যা করেছে তাহ'লে বিশ্বাস করবে। কারণ তারা এমন জাতি যারা কখনো পলায়ন করবে না। আমরা তাদের কাউকে কাউকে বন্দি করেছি। সে নিজেকে বাহন থেকে নিক্ষেপ করে স্বীয় মাথাকে পাথরে আঘাত করে মৃত্যুকে নিশ্চিত করেছে। তবুও নিজেকে সমর্পণ করেনি।[৪৯]

[চলবে]

---

৪৩. *আল-কামিল ১০/৩৪৭; আল-বিদায়াহ ১৩/৮৯; তারীখুল ইসলাম ৪/১৩৯; শারহু নাহজিল বালাগাহ ৮/২৩০।*
৪৪. *ইরানের একটি শহর।*
৪৫. *বুখারী হা/৪৪২৫; মিশকাত হা/৩৬৯৩,'শাসন ও বিচার' অধ্যায় হা/৩৬৯৩।*
৪৬. *আল-কামিল ১০/৩৪৮; আল-বিদায়াহ ১৩/৮৯-৯০; তারীখুল ইসলাম ৪/১৩৯; শারহু নাহজিল বালাগাহ ৮/২৩০।*
৪৭. *আল-কামিল ১০/৩৪৮; আল-বিদায়াহ ১৩/৮৯-৯০।*
৪৮. *আল-কামিল ১০/৩৪৮; আল-বিদায়াহ ১৩/৮৯-৯০।*
৪৯. *আল-কামিল ১০/৩৪৮।*

Contents

পেঁপে চাষে বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রের সাফল্য

নড়াইল যেলার লোহাগাড়া উপযেলার পুটিবিলা গৌড়স্থান এলাকার যমীরুদ্দীন ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের ৪র্থ বর্ষের ছাত্র। পড়ালেখার পাশাপাশি বড় পরিবারের ব্যয় নির্বাহ ও নিজের পড়ালেখার খরচ চালিয়ে নেওয়ার জন্য বছর চারেক আগে পোল্ট্রি ফার্মের কাজে নামেন। প্রথম দুই দফা লাভ করলেও পরবর্তীতে এই ব্যবসায় বেশ কয়েক দফায় ক্রমাগত লোকসান হওয়ায় প্রায় ৪ লক্ষ টাকা ঋণী হয়ে যান। পরবর্তীতে আরো ধারদেনা করে গরু মোটাতাজাকরণের কাজে নামেন। কিন্তু সেখানেও লাভের মুখ দেখেননি। তবু হাল ছাড়েনি যমীর। পরে পিতার দখলীয় সরকারী পরিত্যক্ত খাসজমিতে পেঁপে চাষের উদ্যোগ নেয়। তাতেই তার সফলতা আসে। গত দেড় বছর আগে প্রথম ১ হাযার পেঁপে গাছ লাগিয়ে লাভ করতে না পারলেও ক্ষতি হয়নি। হাল ছাড়েনি যমীর। পরবর্তী বছর একই জায়গায় সম্পূর্ণ নিজের অভিজ্ঞতায় আবার ২ হাযার পেঁপে গাছ লাগায়। বাম্পার ফলন ঘটে। আগের ব্যবসার ক্ষতি পুষিয়ে গত বছর সে লাভের মুখ দেখে। ঐ বছরের লাভ ও মূলধনসহ বিভিন্ন বন্ধু-বান্ধবদের কাছ থেকে ধারদেনা করে প্রায় ১৫ লক্ষ টাকা খরচ করে একই এলাকায় ৭ একরের বনজঙ্গলে ভরা পরিত্যক্ত জমি পরিষ্কার করে গত বছর সেখানে ৫ হাযার পেঁপে চারা লাগায়। নিজে নার্সারি করে তা চাষ করে। গত দেড় মাস হ'তে এই বাগান থেকে পেঁপে বিক্রি শুরু করে। প্রতিসপ্তাহে ৩ টন করে পেঁপে বিক্রি করছে। যার মূল্য ১ লক্ষ টাকা। আগামী ১ মাস পর প্রতি সপ্তাহে ৫ টন করে পেঁপে বিক্রি করতে পারবে বলে যমীর আশা প্রকাশ করছেন এবং পরবর্তীতে তার পরিমাণ আরও বাড়তে থাকবে বলে তার ধারণা। তার পেঁপে বিক্রির এই ধারাবাহিকতা বজায় থাকলে আগামী ৩ মাসে মূলধন পেয়ে যাবে বলে তার বিশ্বাস। তবে ইতিমধ্যে বেশ কয়েকবার বন্য হাতির দল এসে কয়েকশ' পেঁপে গাছের চারা নষ্ট করে দিয়েছে বলে সে জানায়। অথচ স্থানীয় বনবিভাগ থেকে বার বার সহায়তা চেয়েও সে কোন সহায়তা পায়নি বলে জানায়। এদিকে তার পেঁপে চারার মাঝে মাঝে জমিগুলোতে বিভিন্ন জাতের ১১ শত আমগাছ ও ৭ শত লিচু গাছ লাগিয়েছে। যেগুলোতে আগামী বছর ফলন আসতে পারে। এছাড়াও এ বছর নতুন করে বড় আকারের একটি ছাগলের খামার করার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে বলেও সে জানিয়েছে।

স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা নূরুল আলম বলেন, যমীরুদ্দীন তার এই প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে পারলে আগামীতে সে সারা দেশের ছাত্রদের কাছে মডেল হয়ে থাকবে। সম্প্রতি তার বাগান পরিদর্শনে গিয়ে দেখা যায় যমীরুদ্দীন বাগানে অন্যান্য শ্রমিকের সাথে কাজ করছে। মনে হচ্ছিল সেও দিনমজুর। কাজের ফাঁকে তার সাথে কথা বলে জানা যায়, সে সারাদিন মানুষের সাথে বাগানে কাজ করে আর রাতে পড়াশুনা করে। এ পর্যন্ত কোন পরীক্ষায় সে ফেল করেনি বলে জানিয়েছে। পুটিবিলা পহরচান্দার এই নির্জন পাহাড়ী এলাকায় তার বাগানের মাঝে একটি ঝুঁপড়ি ঘরে রাতে সে একাই থাকে। সাথে বই-পুস্তকও রয়েছে। লোহাগাড়া উপযেলা কৃষি কর্মকর্তা জাহাঙ্গীর আলম বলেন, কর্মের প্রতি তার আগ্রহ ও প্রচেষ্টাই তার সফলতার মূলধন।

সাতক্ষীরায় জনপ্রিয় হয়ে উঠছে খাঁচায় কাকড়া চাষ

বাজার থেকে কাকড়া কিনে ছোট ছোট খাচায় রেখে মোটাতাজা করা হচ্ছে। ২০ থেকে ২২ দিনেই একবার খোলস পরিবর্তন করে প্রতিটি কাকড়া। এতে প্রতিটি কাকড়ার ওযন বেড়ে দ্বিগুণের চেয়ে বেশী হয়। পরে এই কাকড়া রপ্তানী হয় বিশ্বের বিভিন্ন দেশে। আর এতে লাভ বেশী ও রোগবালাই কম হওয়ায় সাতক্ষীরায় ক্রমেই জনপ্রিয় হয়ে উঠছে খাচায় কাকড়া চাষ পদ্ধতি। যেলার শ্যামনগর উপযেলার মুন্সীগঞ্জ ইউনিয়নের কলবাড়ি ব্রীজ সংলগ্ন খাস জমিতে বিশেষ এলাকার উন্নয়নের জন্য প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অর্থায়নে ইনোভেশন ইন পাবলিক সার্ভিসের আওতায় শ্যামনগর উপযেলা প্রশাসন গড়ে তুলেছে কাকড়া মোটাতাজাকরণ খামার। দুই বিঘা জমির এই খামারে সাড়ে পাঁচ হাযার খাচায় কাকড়া মোটাতাজা করা হচ্ছে। যার ব্যবস্থাপনায় রয়েছে স্থানীয় বাগদী সম্প্রদায়ের আদিবাসীরা। সমবায়ের ভিত্তিতে পরিচালিত এই খামার সম্পর্কে মালঞ্চ সমবায় সমিতির সভাপতি জয়ন্ত মণ্ডল বাগদী বলেন, প্রতিদিন বাজার থেকে ছোট সাইজের কাকড়া কিনে খাচায় রেখে মোটাতাজা করা হয়। হাতে থাকা কাকড়া দেখিয়ে তিনি বলেন, সকালে বাজার থেকে তিনি ১০ কেজি কাকড়া কিনেছেন। প্রতি কেজিতে ৫টি করে কাকড়া হয়েছে। এই কাকড়া ২০ থেকে ২২ দিন খাচায় লালন-পালন করে মোটাতাজা করা হবে। এতে প্রতিটি কাকড়ার ওযন হবে দ্বিগুণের চেয়ে বেশী। তখন ৫টি কাকড়ার ওযন হবে দুই কেজির অধিক। জয়ন্ত মণ্ডল জানান, এতে খরচও কম। শুধুমাত্র খাবার দিতে হয়। খাবার হিসাবে তারা প্রতিদিন ছোট ছোট একটি করে তেলাপিয়া মাছ খাচায় দেন। যা বাজার থেকে সস্তায় কেনা হয়। কয়েকদিনের মধ্যে খোলস পরিবর্তন করলেই কাঙ্ক্ষিত ওযন বেড়ে যায় কাকড়ার। এ সময় কাকড়ার খোলস নরম থাকে। এ কারণে বাজার চাহিদাও বেশী। পরে তা প্যাকেটজাত করে অস্ট্রেলিয়া, যুক্তরাষ্ট্র, মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড, চীনসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে পাঠানো হয়। দামও পাওয়া যায় ভালো, কেজি প্রতি ৬০০ থেকে ৮০০ টাকা। শুধু বাগদী সম্প্রদায়ের মানুষ নয়, চিংড়ি চাষের তুলনায় লাভ ও ভাইরাস সংক্রমণের আশঙ্কা না থাকায় অনেকেই ঝুঁকে পড়েছেন কাকড়া চাষে। যার ফলশ্রুতিতে সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগে ইতিমধ্যে যেলায় ৩৭০টি কাকড়া মোটাতাজাকরণ খামার গড়ে উঠেছে। আর এ খাত থেকে ক্রমেই বাড়ছে রপ্তানী আয়। এ খাতে কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করছে প্রায় ১১ হাযার মানুষ। সূত্র জানায়, যেলায় ২০১৫ সালে সদর উপযেলায় ৩ মেট্রিক টন, তালায় ৭ মেট্রিক টন, আশাশুনিতে ২০৫ মেট্রিক টন, দেবহাটায় ৩১১ মেট্রিক টন, কালিগঞ্জে ৭৪৫ মেট্রিক টন ও শ্যামনগরে এক হাযার পাঁচশ' ৪৩ মেট্রিক টন কাকড়া উৎপাদন হয়। শ্যামনগরের কাকড়া চাষী বিশ্বজিৎ কুমার জানান, মোটাতাজা করার জন্য প্রয়োজনীয় কাকড়া জোগান দেওয়া সম্ভব হ'লে রপ্তানি খাতে সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন হ'তে পারে। কিন্তু যতই মোটাতাজাকরণের খামার বাড়ছে ততই ছোট কাকড়ার প্রাপ্যতা নিয়ে চিন্তা বাড়ছে। এজন্য এ এলাকায় একটি কাকড়া প্রজনন কেন্দ্র স্থাপনের দাবী জানান তিনি। শ্যামনগর উপযেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) আবু সাঈদ মুহাম্মাদ মনযুর আলম জানান, শ্যামনগরে ইনোভেশন ইন পাবলিক সার্ভিসের আওতায় মৎস্য বিভাগের তত্ত্বাবধানে খাচায় কাকড়া মোটাতাজাকরণের মাধ্যমে আদিবাসীদের দারিদ্র বিমোচনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে এবং ক্রমেই এই উদ্যোগ সর্বত্র ছড়িয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে। যেলা মৎস্য কর্মকর্তা রামাযান আলী জানান, লাভ বেশি হওয়ায় যেলায় কাকড়া চাষ দিন দিন জনপ্রিয় হয়ে উঠছে।

মোট রপ্তানীর একটি বড় অংশ সাতক্ষীরা থেকে যায়। এছাড়া রপ্তানী আয় বৃদ্ধির জন্য সরকার এই খাতকে এগিয়ে নিতে প্রয়োজনীয় পৃষ্ঠপোষকতাও দিয়ে যাচ্ছে।

Contents

কবিতা

আশূরার আগমনে

মুহাম্মাদ লাবীবুর রহমান
হয়বৎপুর, পার্বতীপুর, দিনাজপুর।

আশূরায়ে মুহাররম করলে আগমন
বিমূঢ় ধার্মিক যারা
ধর্মের নামে শিরক-বিদ'আতের ধামে
হয়ে উঠে পাগলপারা।
সাজায়ে অসার হুসায়েনের কবর
রূহের হাযিরি সেথা ভেবে
সালাম করে নত করে শির,
সিজদাও করে সবে।
প্রার্থনা করে লভিতে ফল
ঐ অসার কবরের নিকটে,
কাণ্ড-জ্ঞান তাদের হয়েছে বিলীন
অজ্ঞতার করুণ চাপটে।
মিথ্যা শোকে বক্ষে চাপড়,
বুকের কাপড় ছেঁড়া,
'হায় হোসেন! হায় হোসেন! বলে যবানে
চলে তাদের মাতম করা।
রঙ-বেরঙে সাজিয়ে পথঘাট কালো পোশাক পরে
কারবালা যুদ্ধের মহড়া দেয় তীর-বল্লম হস্তে ধরে।
হুসায়েন নামের বরকতি পিঠা বিক্রি করে চড়া দামে,
মোরগ ছুঁড়ে মধ্য পুকুরে যুবক-যুবতীসব তা ধরতে নামে।
বিবাহ-শাদী করতে বারণ অন্যায় ভেবে এ মাসে,
এ দিনে শিশুকে দুগ্ধদান অনুচিত ভেবে রাখে উপোষে।
ওদিকে কেউ বকরী বাঁধে আয়েশার নাম করে,
রক্তাক্ত করে তারে অস্ত্রাঘাতে উল্লাসে ফেটে পড়ে।
হুসায়েনের শাহাদত খুশির কারণ ঐসব লোকের নিকটে,
আশূরার দিন তাই ঈদের দিন ভেবে ফুর্তিতে উঠে মেতে।
কি জঘন্য কর্ম! নামে ধর্ম, ধর্মের দীক্ষা নয় এ যে,
আক্বীদা লুটে ধর্মের নামে কতক ভণ্ড ধার্মিক সেজে।
সাবধান হই মুসলিম তাই আশূরার খাঁটি দীক্ষা জানি,
সেই মতো করে আমল করি, কল্যাণ হবে তবে মানি।

আহলেহাদীছ আন্দোলন

এস.এম শরীফুয্যামান
বুধহাটা, আশাশুনি, সাতক্ষীরা।

আজি দিগন্তে উঠছে সূর্য অন্ধকার সব হবে বিলীন
বিদ'আতী মতবাদ মুছে দিতে আহলেহাদীছ আন্দোলন।
পথভ্রষ্টকে পথ দেখাতে ঊর্ধ্বে তুলে আল-কুরআন
ছহীহ হাদীছের পতাকা তলে এসোরে সব নওজোওয়ান।
আসুক যত বাধা-বিঘ্ন জেল-যুলুম আর নির্যাতন
চলবে মোদের দ্বীনের দাওয়াত মযবূত হবে ঈমান।
আহলেহাদীছ আন্দোলনে পাচ্ছে সবে সঠিক পথ
কুরআনের আলোয়, হাদীছের দিশায় দূরীভূত হবে সকল মত।
লক্ষ্য একটিই আল্লাহ্র ইবাদত নবীর দ্বীনের প্রতিষ্ঠা
হকের পথে এগিয়ে চল সঙ্গে নিয়ে ন্যায়-নিষ্ঠা।
আদর্শ মোদের বিশ্বনবী, সা'দ-মু'আয আর আলী হায়দার
ধৈর্যে হব পর্বত সম জ্ঞান-গরিমায় হীরের ধার।
জামা'আতবদ্ধ জীবন যাপনে শপথ নেব আজ সবাই
আহলেহাদীছ আন্দোলনে জ্বলবে আলো বিশ্বময়।

আহ্বান

মুহাম্মাদ মাস'উদুর রহমান
বাঁটরা, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

হায়রে মানুষ নেই কিরে হুঁশ
করে যাচ্ছ অন্যায়
তোমার আচরণে এ পাষাণ মনে
জাগবে কবে ভয়?
তুমি তো শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির জ্যেষ্ঠ
আশরাফুল মাখলূকাত
করছ দুর্নীতি ঘটছে অবনতি
এভাবে কাটছে দিন-রাত।
নেই কোন একতা বিভক্তি বিচ্ছিন্নতা
করে চলেছ যুলুম
পশু-পাখি ঘৃণা করে আনুগত্যে তাচ্ছিল্য করে
তোমার ভাঙবে কবে ঘুম?
দেশে নেই শান্তি অশান্তিতে নেই ক্লান্তি
হবে কি পরিণতি?
দলে দলে অবিচার বিরোধীদের উপর অত্যাচার
কি ভয়াবহ রাজনীতি!
দল মত সব ছেড়ে এক আল্লাহ্র দিকে ফিরে
মানুষ হও আগুয়ান
হারানো মর্যাদা ফিরে পাবে সবাই
পাবে সেই মান।

জিজ্ঞাসা

আবুল কাশেম, মেহেরপুর।

তোমরা কি দেখেছো কোথাও
আছে কি সেই মুসলমান?
আল্লাহ্র ভয়ে ভীতু হয়ে
এনেছে পূর্ণ ঈমান।
তোমরা কি দেখনি সেই দিন?
ইতিহাসে আছে লেখা
আবু বকর ওমর আলী
ওছমান চার খলীফা।
রাসূলের ডাকে সাড়া দিয়ে
কবুল করেছিল ইসলাম
তারা শ্রেষ্ঠ মুসলমান।
আছে কি সেই মুসলমান?
দ্বীন কায়েম করেছিল যারা
বুকের শেষ রক্ত দিয়ে
জান্নাতী জীবন লাভ করেছে
সেই রক্তের বিনিময়ে।
তোমরা তাদের ভুলে যাবে,
দেবে না রক্তের পুরা দাম।
এসো তবে জীবন গড়ি
হাতে নিয়ে আল-কুরআন।
আছে কি সেই মুসলমান?
শপথ বাক্য পাঠ করেছে যারা
রাসূলের দু'হাত ধরে
জান-মাল আল্লাহ্র পথে দেখো
দিয়েছে উজাড় করে।
তবু তাদের চিনলে না তো
দিলে না রাসূলের সম্মান,
আছে কি সেই মুসলমান?
এক মুসলমানের বন্ধু হবে,
দেখো আরেক মুসলমান
আছে কি সেই মুসলমান?

Contents

সোনামণিদের পাতা

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (ইসলামী)-এর সঠিক উত্তর

১. মু'আয বিন আফরা (রাঃ)।
২. ওছমান বিন আফ্ফান (রাঃ)।
৩. আলী বিন আবী তালিব (রাঃ)।
৪. হাসান বিন আলী (রাঃ)
৫. হাসান ও হুসাইন (রাঃ)-কে।
৬. আবু তালহা (রাঃ)।
৭. খাদীজা (রাঃ)।
৮. আয়েশা (রাঃ)-কে।
৯. আবু বকর (রাঃ)-কে।
১০. হাফছা বিনতে ওমর (রাঃ)।

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (স্বদেশ)-এর সঠিক উত্তর

১. সুধারাম/ভুলুয়া। ২. নদীয়া।
৩. জাহানাবাদ। ৪. খলীফাবাদ।
৫. খলীফাতাবাদ। ৬. গণ্ডোয়ানাল্যান্ড।
৭. গোয়ালন্দ। ৮. ইন্দ্রাকপুর পরগনা।
৯. দোয়ার ১০. আইয়ুব নগর।

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (ইসলামী)

১. ওহোদ যুদ্ধে জনৈক মহিলা ছাহাবীর পিতা, ভাই, চাচা ও চাচাতো ভাই শহীদ হন। নবী করীম (ছাঃ) বেঁচে আছেন শুনে তিনি বলেন আমার সকল দুঃখ তুচ্ছ। সেই মহিলার নাম কি?
২. স্বপ্নের মাধ্যমে নির্দেশ প্রাপ্ত হয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কাকে বিবাহ করেন?
৩. রাসূল (ছাঃ)-এর কোন স্ত্রীর পবিত্রতায় পবিত্র কুরআনে ১০টি আয়াত নাযিল হয়?
৪. রাসূল (ছাঃ)-এর কোন স্ত্রীকে আল্লাহ তা'আলা জিবরীল (আঃ) মারফত সালাম দিয়েছেন?
৫. নবী করীম (ছাঃ) একদা তাঁর জনৈক স্ত্রীকে তালাক প্রদান করেন। তখন জিবরীল (আঃ) এসে তাঁকে বলেন, আপনি তাকে ফিরিয়ে নিন। কেননা তিনি অধিক ছিয়াম পালনকারিণী এবং অধিক নফল ছালাত আদায়কারিণী। আর তিনি জান্নাতে আপনার স্ত্রী। তাঁর নাম কি?
৬. নবী করীম (ছাঃ)-এর কন্যা যায়নাব (রাঃ) মৃত্যু বরণ করলে কে তাকে গোসল দেন?
৭. কোন ছাহাবীর ইমামতিতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছালাত আদায় করেছেন?
৮. আবু বকর ব্যতীত কোন সৌভাগ্যবান ছাহাবীর ইমামতিতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছালাত আদায় করেছেন?
৯. কোন ছাহাবী বদর যুদ্ধে নিজের মুশরিক পিতাকে হত্যা করেন?
১০. কোন মহিলা ছাহাবীকে দুই শহীদের মাতা বলা হয়? তিনি মৃত্যু বরণ করলে রাসূল (ছাঃ) নিজের জামা দ্বারা কাফন পরান এবং নিজে তাকে কবরে রাখেন।

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (স্বদেশ)

১. শেরে বাংলা নগরের পুরাতন নাম কি?
২. ভোলার পুরাতন নাম কি?
৩. মুন্সিগঞ্জের পুরাতন নাম কি?
৪. সাতক্ষীরার পুরাতন নাম কি?
৫. উত্তরবঙ্গের পুরাতন নাম কি?
৬. রাঙামাটির পুরাতন নাম কি?
৭. বাংলা একাডেমীর পুরাতন নাম কি?
৮. সিরডাপ কার্যালয়ের পুরাতন নাম কি?
৯. প্রধানমন্ত্রীর ভবনের পুরাতন নাম কি?
১০. বঙ্গভবনের পুরাতন নাম কি?

সংগ্রহে : মুহাম্মাদ তরীকুল ইসলাম
বংশাল, ঢাকা।

সোনামণি সংবাদ

নওদাপাড়া, রাজশাহী ৩১শে আগস্ট বুধবার : অদ্য বাদ আছর দারুল হাদীছ (প্রাঃ) বিশ্ববিদ্যালয় জামে মসজিদে আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী কমপ্লেক্স-এর ইবতেদায়ী শিক্ষা সমাপনী ও জেডিসি ২০১৫ এবং দাখিল ২০১৬-এর জিপিএ-৫ প্রাপ্ত কৃতী ছাত্রদের সংবর্ধনা ও সোনামণি কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ২০১৬-এর শাখা পর্যায়ের বাছাই পর্বের পুরস্কার বিতরণ উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী কমপ্লেক্স-এর অধ্যক্ষ মাওলানা আব্দুল খালেক সালাফীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীক-এর সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হুসাইন। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী কমপ্লেক্স-এর ভাইস প্রিন্সিপ্যাল নূরুল ইসলাম ও সোনামণি কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম। অনুষ্ঠানে উদ্বোধনী ভাষণ পেশ করেন সোনামণি মারকায এলাকার প্রধান উপদেষ্টা হাফেয লুৎফর রহমান। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি রায়হানুদ্দীন ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে ফরীদুল ইসলাম। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন মারকায এলাকার সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ শহীদুল্লাহ।

টেমা পশ্চিম পাড়া, মোহনপুর, রাজশাহী ২৫শে আগস্ট, বৃহস্পতিবার : অদ্য সকাল সাড়ে ৭-টায় টেমা পশ্চিম পাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মসজিদের ইমাম ও মক্তবের শিক্ষক জনাব মুর্তাযার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক রবীউল ইসলাম, যয়নুল আবেদীন ও হাফেয হাবীবুর রহমান। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা করেন অত্র মক্তবের শিক্ষক জনাব আব্দুর রশীদ। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি জাহিদ হাসান এবং ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে মাসুমা আখতার। অনুষ্ঠান শেষে জনাব মুর্তাযাকে পরিচালক করে পৃথক পৃথক বালক ও বালিকা শাখা গঠন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রায় ৭০ জন সোনামণি অংশগ্রহণ করে।

Contents

স্বদেশ

মীর কাসেম আলীর ফাঁসি কার্যকর

১৯৭১-এর স্বাধীনতা যুদ্ধে কথিত মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগে অভিযুক্ত জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য মীর কাসেম আলীর ফাঁসি কার্যকর করা হয়েছে। সুপ্রীমকোর্টের চূড়ান্ত রায় মোতাবেক গত ৩রা সেপ্টেম্বর শনিবার দিবাগত রাত ১০-টা ৩৫ মিনিটে গাজীপুরস্থ কাশিমপুর কারাগার-২ এ তাঁর মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়। একই দিন রাত সোয়া ৩-টায় স্বীয় জন্মস্থান মানিকগঞ্জ যেলার হরিরামপুর থানার চালা গ্রামে তাঁকে দাফন করা হয়। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৩ বছর।

মীর কাসেম আলী ১৯৫২ সালের ৩১শে ডিসেম্বর মানিকগঞ্জের হরিরামপুর থানাধীন চালা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার চাকুরীর সুবাদে ১৯৬৫ সাল থেকে তিনি পরিবারের সাথে চট্টগ্রাম শহরে বসবাস শুরু করেন। ১৯৭১ সালের ৬ই নভেম্বর তিনি তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান ইসলামী ছাত্রসংঘের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। অতঃপর স্বাধীনতার পর ১৯৭৭ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারী বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি হন। রাজনৈতিক জীবনে তিনি বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সাথে যুক্ত এবং দলটির কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য নির্বাচিত হন। রাজনীতি ছাড়াও একজন সংগঠক ও উদ্যোক্তা হিসাবে ব্যাংকিং, চিকিৎসা, শিক্ষা, আবাসন, গণমাধ্যম, পর্যটন, পরিবহন খাতসহ আর্থ-সামাজিক বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁর নেতৃস্থানীয় ভূমিকা ছিল। তিনি দুই ছেলে ও তিন কন্যা সন্তানের জনক।

[আমরা মাইয়েতের রূহের মাগফিরাত কামনা করছি এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি (স.স.)]

ফারাক্কা বাঁধ তুলে দেওয়ার দাবী বিহারের মুখ্যমন্ত্রীর

বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতিশ কুমার গঙ্গা নদীর ওপর নির্মিত বহুল বিতর্কিত ফারাক্কা বাঁধকে পুরোপুরি সরিয়ে দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছেন। গত ২৩শে আগস্ট প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে দেখা করে তিনি এ প্রস্তাব দেন। খবরে বলা হয়েছে, বিহারের বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনার জন্য প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেন বিহারের তিনবারের মুখ্যমন্ত্রী নীতিশ কুমার। বৈঠকের আগে তিনি বলেন, ফারাক্কা বাঁধের কারণে গঙ্গায় বিপুল পরিমাণ পলি জমছে। আর এ কারণে প্রতিবছর বিহারে বন্যা হচ্ছে। তিনি বলেন, এর একটা স্থায়ী সমাধান হ'ল ফারাক্কা বাঁধটাই তুলে দেওয়া। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকে বিহার সরকারের পক্ষ থেকে একটি তালিকা তুলে দেওয়া হয়। এতে ফারাক্কা বাঁধ নির্মাণ হওয়ার আগে ও পরে বিহারে গঙ্গার গভীরতা বা নাব্যতা কতটা কমেছে, তার হিসাব তুলে ধরা হয়।

উল্লেখ্য, ভারতের ফারাক্কা বাঁধ নিয়ে বাংলাদেশের আপত্তি দীর্ঘদিনের। এই প্রথম ভারতের একজন প্রভাবশালী রাজনীতিক ও মুখ্যমন্ত্রী ফারাক্কা বাঁধ তুলে দেওয়ার কথা বললেন। এসব প্রতিক্রিয়া হবে তা অনেক বিশেষজ্ঞই বলেছিলেন। এখন সমস্যা চোখের সামনে ঘটতে শুরু করায় ভারতীয় রাজনীতিবিদরাও টের পেলেন।

[ধন্যবাদ বিহারের মুখ্যমন্ত্রীকে। আমরা আমাদের বহু নিবন্ধে এ বাঁধের প্রতিবাদ জানিয়েছি। অতি সম্প্রতি জুন'১৬ সংখ্যায় 'ভারতের আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্প চালু' শীর্ষক সম্পাদকীয়তে আমরা আমাদের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছি। কেবল গঙ্গা নয়, সকল নদী স্বাভাবিকভাবে প্রবাহিত হৌক- এটাই আমাদের কাম্য। এর মধ্যেই রয়েছে দু'দেশের জনগণের কল্যাণ (স.স)।]

বিদেশ

মোহরানা হিসাবে বই নিয়ে প্রশংসা কুড়াল ভারতীয় মুসলিম তরুণী

ভারতে এক মুসলিম তরুণী নিজের বিয়েতে ব্যতিক্রম ধরনের মোহরানা নিয়ে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। কেরালার সাহলা নামের এই তরুণীর বিবাহের কথাবার্তা চূড়ান্ত হওয়ার পর শর্ত দেয় যে, মোহরানা হিসাবে সে প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী স্বর্ণ বা অর্থ নেবে না। বরং তার পসন্দের একগুচ্ছ বই মোহরানা হিসাবে দিলেই চলবে। কিন্তু বেঁকে বসলেন বর ও কনের পরিবারের সদস্যরা ও আত্মীয়-স্বজনরা। কিন্তু সাহলা সহজে দমবার পাত্রী নয়। সে বলল, ধর্ম তাকে যে পসন্দের স্বাধীনতা দিয়েছে তা সমাজ বা আত্মীয়-স্বজনরা কেড়ে নিতে পারে না। এক্ষেত্রে সে রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছ যুক্তি হিসাবে তুলে ধরে। কনের এমন দৃঢ়তা এবং যুক্তিতে বাকি সবাই হার মানেন। অতঃপর বরপক্ষ বহু বইয়ের দোকান ঘুরে অবশেষে সেই মূল্যবান ৫০টি বই ক্রয় করতে সক্ষম হন এবং মোহরানা হিসাবে তুলে দেন। সাহলা বলেন, আমি দু'টি কারণে বই চেয়েছি। প্রথমতঃ বই পড়া আমার শখ। দ্বিতীয়তঃ আমার এলাকার অধিবাসীদেরকে একটা বার্তা দিতে চেয়েছি যে, কাঁড়িকাঁড়ি স্বর্ণ বা টাকা লেনদেনের বাইরেও মুসলিমদের একটি সুন্দর বিবাহ হ'তে পারে।

[ধন্যবাদ মেয়েটিকে। সে একটি মোর্দা সুন্নাতকে যিন্দা করেছে (বুখারী হা/৫০২৯)। এর ফলে অধিক মোহরানার অত্যাচার থেকে বহু যুবক বেঁচে যাবে ও বিবাহ সহজ হবে (স.স.)]

১২০ কোটি টাকা ব্যয়ে মসজিদ নির্মিত হ'ল সিঙ্গাপুরে

সিঙ্গাপুরের মুসলমানদের জন্য সরকারীভাবে ১২০ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত হয়েছে 'মসজিদ মা'রূফ'। গত ১৯শে আগস্ট শুক্রবার নবনির্মিত মসজিদটির উদ্বোধন করেন সিঙ্গাপুরের তথ্য ও যোগাযোগ মন্ত্রী এবং মুসলিম ধর্মবিষয়ক মন্ত্রী ড. ইয়াকূব ইবরাহীম। চারতলা এই মসজিদে রয়েছে সকল আধুনিক সুযোগ-সুবিধা। মসজিদটিতে একসাথে সাড়ে চার হাযার মুছল্লী ছালাত আদায় করতে পারবেন। মসজিদটি ২০ জুড়ং ওয়েস্টের ২৬নং স্ট্রিটে নির্মাণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, সিঙ্গাপুরে মোট জনসংখ্যার ১৭ শতাংশ মুসলমান। আর পুরো সিঙ্গাপুরে ৭০টির মতো মসজিদ রয়েছে।

হিজাবকে সরকারী ইউনিফর্মে অন্তর্ভুক্ত করল স্কটল্যান্ড

বিশ্ব যখন মেয়েদের হিজাব নিষিদ্ধে সরগরম ঠিক এই সময়ে ব্যতিক্রমী সিদ্ধান্ত নিল স্কটল্যান্ড। দেশটি মুসলিম নারীদের অপরিহার্য পোশাক হিজাবকে সরকারী ইউনিফর্ম হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করেছে। স্কটল্যান্ডের পুলিশ প্রধান ফিল গুর্মলি বলেন, পোশাকের বাধ্যবাধকতার জন্য স্কটল্যান্ডের মুসলিম নারীরা সরকারী কাজে অংশ নিতে পারেন না। এতে করে নানারকম সমস্যাও হ'তে থাকে। বিশেষ করে পুলিশ প্রশাসনে কাজের ক্ষতিসাধন হয়। হিজাবকে সরকারি ইউনিফর্ম করার ফলে মুসলিম নারীরা এই পেশায় অন্তর্ভুক্ত হ'তে পারবে। সেবার ক্ষেত্রে স্ব স্ব সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব গড়ে তুলতে তারা কাজ করছে। সরকারের এই সিদ্ধান্ত কে দেশটির মুসলিম কমিউনিটি স্বাগত জানিয়েছেন।

অবশ্য আগে থেকেই স্কটল্যান্ড পুলিশে মুসলিম নারীরা অনুমতি নিয়ে তাদের মাথা ঢেকে রাখতে পারতেন। আনুষ্ঠানিক এ ঘোষণার ফলে এখন থেকে তারা ইউনিফর্মে ঐচ্ছিক পোশাক হিসাবে হিজাব ব্যবহার করতে পারবেন। উল্লেখ্য, এর আগে লন্ডন মেট্রোপলিটন পুলিশ তাদের ইউনিফর্মে হিজাবের অনুমোদন দিয়েছে।

[এ থেকে অতি উৎসাহীরা শিক্ষা গ্রহণ করবেন, এটাই আশা করি (স.স.)]

Contents

মানবতার অনন্য নযীর!

ভারতে শামশাদ বেগম (৪০) নামে এক মুসলিম নারী আরতি (৩৮) নামের এক হিন্দু নারীকে কিডনী দান করছেন। দেশটিতে সম্প্রতি গরু খাওয়া নিয়ে মুসলমানদের উপর নির্যাতনের মধ্যে উত্তর প্রদেশের শামশাদ বেগমের এই কিডনী দান সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এক অনন্য নযীর স্থাপন করেছে। টাইমস অফ ইন্ডিয়ার এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, শামশাদ কিডনী দানের ইচ্ছাপত্রসহ যাবতীয় নথিপত্র ফতেহপুর যেলা স্বাস্থ্য বিভাগে জমা দিয়েছেন। এ ব্যাপারে কোন আপত্তিও নেই তার পরিবারের। এখন সরকারের অঙ্গদান অনুমোদন কমিটির অনুমতি পেলেই পরবর্তী কার্যক্রম চালাবেন চিকিৎসকরা। আরতির দু'টি কিডনী নষ্ট হয়ে যাওয়ায় এক বছর ধরে তার ডায়ালাইসিস চলছে। যা দেখে নিজের কিডনী দিয়ে তাকে বাঁচানোর সিদ্ধান্ত নেন শামশাদ। তিনি বলেন, আরতির শারীরিক যাতনা দেখে আমি আর থাকতে পারিনি, রক্তের গ্রুপ পরীক্ষা করিয়েও দেখি আমার আর তার রক্তের গ্রুপ একই। তাই আমি কিডনী দিতে চাই। তিনি বলেন, 'ধর্ম দিয়ে নয়, মানুষকে মানুষ হিসাবে দেখতে চাই। সেকারণেই আমার এই প্রচেষ্টা।

[মুসলিম বিদ্বেষীদের চোখ খুলবে কি? (স.স.)]

কাশ্মীরে নিরাপত্তা বাহিনীর নৃশংসতা উপেক্ষা করছে বিশ্ব

ভারত অধিকৃত কাশ্মীরে চলছে ভয়াবহ নৃশংসতা, মানবাধিকার লংঘন ও হত্যাকাণ্ড। মাত্র সপ্তাহের ব্যবধানে জম্মু-কাশ্মীরে অর্ধশতাধিক মুসলমানকে হত্যা এবং শত শত মুসলমানকে মারাত্মকভাবে আহত করা হয়েছে। পরিকল্পিতভাবে যুবকদের চোখে বন্দুকের ছারা গুলি করে তাদের চিরতরে অন্ধ করে দেয়া হচ্ছে। ভারতীয় নিরাপত্তা বাহিনী সরাসরি যার সাথে জড়িত। কিন্তু বহির্বিশ্ব অন্যান্য দেশের সন্ত্রাস-সহিংসতা নিয়ে উদ্বিগ্ন হ'লেও জম্মু-কাশ্মীরের এই মানবতা-বিরোধী অপরাধ নিয়ে আদৌ মাথা ঘামাচ্ছে না। গণমাধ্যমের দৃষ্টি থেকে এসব ঘটনা কৌশলে আড়াল করে রাখা হচ্ছে। ফলে কাশ্মীরী জনগণের দুঃখ-দুর্দশা বেড়েই চলেছে। ভারতীয় সেনাবাহিনীর গুলিতে গত ৮ই জুলাই হিযবুল মুজাহিদীন কমান্ডার বোরহান ওয়ালী নিহত হওয়ার পর সমগ্র পশ্চিম ও উত্তর কাশ্মীর জুড়ে পুলিশ-জনতার মধ্যে ব্যাপক সংঘর্ষ চলছে।

উল্লেখ্য, ভারত সরকার গড়ে প্রতি ৭ জন কাশ্মীরীকে দমিয়ে রাখার জন্য একজন পাহারাদার নিযুক্ত করে এবং ভারতের সেনাবাহিনী এবং কেন্দ্রীয় পুলিশবাহিনী গুপ্ত হত্যা, প্রকাশ্য হত্যা, দমন-পীড়ন, ধর্ষণ করেও কাশ্মীরীদের তাদের ন্যায্য দাবী থেকে আজও পর্যন্ত বিরত কিংবা দমিয়ে রাখতে পারেনি।

তুরস্কে চালু হ'ল বিশ্বের সবচেয়ে প্রশস্ত ঝুলন্ত সেতু

তুরস্কের বসফরাস প্রণালীর ওপর নির্মিত এশিয়া ও ইউরোপ মহাদেশকে সংযোগকারী তৃতীয় সেতু খুলে দেয়া হয়েছে। ৩০০ কোটি ডলার ব্যয়ে নির্মিত 'মার্টিয়ার্স অফ জুলাই ১৫' নামের সেতুটি বিশ্বের সবচেয়ে প্রশস্ত ঝুলন্ত সেতু। গত ২৬শে আগস্ট এর উদ্বোধন করেন তুর্কি প্রেসিডেন্ট রিসেপ তায়েপ এরদোগান। সাধারণ গাড়ি চলাচলের জন্য আট লেন ও মাঝখান দিয়ে ট্রেন লাইনের এই দৃষ্টিনন্দন সেতু গত কয়েক বছরের সেরা স্থাপত্য বলে দাবী করছেন সংশ্লিষ্ট নির্মাতারা। সেতুটি দিয়ে দৈনিক গড়ে ১ লাখ ৩৫ হাযার গাড়ি চলাচল করতে পারবে। এই সেতু চালুর ফলে পৃথিবীর অন্যতম পর্যটন শহর ইস্তাম্বুলের ট্রাফিক জ্যাম অনেকটাই কমবে এবং ১৪৫ কোটি ডলারের জ্বালানি সাশ্রয় হবে ও ৩৩ দশমিক ৫ কোটি ডলারের শ্রম সাশ্রয় হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেছে সরকার। সেতুটি ৪৬২০ ফুট লম্বা, ১৯২ ফুট চওড়া এবং এর উচ্চতা ১০৫৬ ফুট।

মুসলিম জাহান

আরব ইয়ুথ সার্ভে ২০১৬

তরুণ আরবদের মাঝে আইএস বিরোধী মনোভাব বাড়ছে

তরুণ আরবদের মধ্যে আইএস বিরোধিতা বাড়ছে। তারা মনে করছে 'আইএস' প্রতিষ্ঠিত খেলাফত অচিরেই ভেঙে পড়বে। তরুণ আরবদের মধ্যে 'আরব ইয়ুথ সার্ভে ২০১৬' নামে চালানো এক জরিপে এমনটাই দেখা গেছে। জরিপে অংশগ্রহণকারীদের ৫০ শতাংশই আইএস-কে সবচেয়ে বড় সমস্যা হিসাবে মনে করে। জরিপে অংশগ্রহণকারীদের ৫৩ শতাংশ মনে করে, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার চেয়ে স্থিতিশীলতাই যরূরী। মাত্র ২৮ শতাংশ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রচারণার পক্ষে মত দেয়।

জরিপ চালানো ১৬টি দেশের মধ্যে ৮টিতেই বেকারত্বকে আইএস থেকেও বড় সমস্যা হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। ১৫ থেকে ২৪ বছর বয়সী আরবদের এক-চতুর্থাংশই কর্মহীন। 'ইন্টারন্যাশনাল লেবার অর্গানাইজেশন'-এর মতে, প্রায় সাড়ে সাত কোটি তরুণ আরব বেকার।

আন্তর্জাতিক জরিপকারী সংস্থা 'পেন শোয়েন বারল্যান্ড' এই জরিপটি পরিচালনা করে। মধ্যপ্রাচ্যের যে ১৬টি দেশে জরিপ চালানো হয়, তা হ'ল- আলজেরিয়া, বাহরাইন, মিশর, ইরাক, জর্দান, কুয়েত, লেবানন, লিবিয়া, মরক্কো, ওমান, ফিলিস্তীন, কাতার, সঊদী আরব, তিউনিশিয়া, সংযুক্ত আরব আমিরাত এবং ইয়ামন।

পরিবর্তনের হাওয়া আলজেরিয়ায়

৯৮ শতাংশ মুসলিম অধ্যুষিত উত্তর আফ্রিকার দেশ আলজেরিয়ায় গত কয়েকবছর যাবৎ পরিবর্তনের হাওয়া বইছে। দেশটিতে ইসলামী মূল্যবোধের চর্চা দিন দিন বেড়েই চলেছে। মসজিদের সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। অধিকাংশ মহিলাকে বোরকা আবৃত অবস্থায় চলা ফেরা করতে দেখা যাচ্ছে। অ্যালকোহলিক পানীয় বিক্রির দোকানগুলো বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। এভাবে ধীরে কিন্তু সক্রিয়ভাবে ইসলামী শরী'আতের অনুসরণ বাড়ছে আলজেরিয়ায়। প্রচলিত রাজনীতিকে উপেক্ষা করে চলার কারণে মধ্যপন্থী সালাফীদের আলজেরীয় কর্তৃপক্ষ বেশ উদার দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে। ফলে সালাফী দাওয়াতের প্রচার, প্রসার, প্রতিপত্তি দিন দিন বেড়েই চলেছে সেখানে এবং আলজেরীয়দের সালাফী আক্বীদার প্রতি আকৃষ্ট হ'তে দেখা যাচ্ছে। শায়খ আব্দুল মালিক রামাযানী, আলজিয়ার্স বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আলী ফারকূস মাদানী প্রমুখ নেতৃবৃন্দের প্রচেষ্টায় সেখানে সালাফী আন্দোলনের উত্তরোত্তর প্রসার ঘটছে। এক্ষেত্রে তাঁদের নিয়মিত মুখপত্র 'মাজাল্লাতুল ইছলাহ' পত্রিকা বেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

সালাফীদের উৎসাহে সেখানে ১৩০ বছরের ফরাসী শাসনের চিহ্ন লোপ পেতে চলেছে। ফরাসীদের শাসনের চিহ্ন বেশির ভাগই ছিল রাজধানী আলজিয়ার্সে, যেখানে বাড়ির আঙ্গিনায়, বারে ও রেস্তোরাঁয় মদ্যপান চলত আর মহিলারা অনৈসলামী পোশাক পরিধান করত। কিন্তু গত এক দশকে এসব শহর থেকেও মদ বিক্রির দোকানগুলো প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে। মহিলাদের মধ্যে বোরকার প্রচলন ব্যাপক বৃদ্ধি পেয়েছে।

এছাড়া আলজেরিয়াব্যাপী মসজিদ বিস্তার লাভ করছে। এর কিছু সংখ্যকের ব্যয় নির্বাহ করছে সরকার। বাকিগুলো ব্যক্তিগত দানে

Contents

তৈরী হচ্ছে। ১৯৯৯ সাল থেকে গত ১৭ বছর যাবৎ ক্ষমতাসীন দেশটির প্রেসিডেন্ট আবদেল আযীয বুতেফ্লিকা বর্তমানে আলজিয়ার্সে শত কোটি ডলার ব্যয়ে মুসলিম বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম মসজিদ নির্মাণ করছেন।

আলজিয়ার্স বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনের অধ্যাপক সাঈদ আহমেদ বলেন, আল্লাহ্র কাছে শুকরিয়া যে, আলজেরীয় সমাজ তার পরিচিতির উৎসের কাছে ফিরে আসছে। উদারপন্থী ইসলামিস্ট পার্টি 'মুভমেন্ট ফর এ পিসফুল সোসাইটি'র সাথে ঘনিষ্ঠ সাঈদ আহমাদ মহিলাদের ক্রমবর্ধমান সংখ্যায় ইসলামী পোশাক পরাকে আশীর্বাদ বলে মনে করেন।

পক্ষান্তরে আধুনিকতাবাদী সমালোচকরা উদ্বিগ্ন যে, সালাফীরা বর্তমানে শক্তি অর্জন করলেও কর্তৃপক্ষ সে ব্যাপারে প্রকাশ্যে কমই উদ্বেগ প্রকাশ করে। এভাবে সালাফীবাদ ধর্মীয় ও সামাজিক রীতিনীতির গভীরে প্রবেশ করতে থাকলে তা আধুনিক আলজেরিয়ার সম্ভাবনাকে বিলুপ্ত করবে।

১৯৯৩ সালে দেশ ত্যাগ করা সাংবাদিক মেজিয়ান উরাদ সম্প্রতি দেশে ফিরে এসে বলেন, আগের সেই ফেলে যাওয়া দেশকে আমি চিনতে পারছি না। গত তিন মাসেরও বেশী সময় আমি দেশে ফিরেছি। কিন্তু নগ্ন পায়ের কোন নারীকে দেখতে পাইনি।

[ইনশাআল্লাহ বাংলাদেশেও একদিন আহলেহাদীছ আন্দোলন-এর মধ্যপন্থী শান্তিবাদী আন্দোলন বিরোধীদের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে মানুষের অন্তর জয় করবে এবং অধিকাংশ জনগণ পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের অনুসারী হবে (স.স.)]

সঊদী আরবে প্রতিদিন ইসলাম গ্রহণ করছে ১৬৪ প্রবাসী শ্রমিক

সঊদী আরবে কর্মরত ভিন্নধর্মাবলম্বী প্রবাসী শ্রমিকদের মধ্যে থেকে প্রতিদিন গড়ে ১৬৪ জন নিজ ধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করছে। গত বছর দেশটিতে অন্তত ৪৬ হাযার নারী ও পুরুষ প্রবাসী শ্রমিক ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে। ইসলাম ধর্ম গ্রহণকারী এই শ্রমিকদের মধ্যে পুরুষের সংখ্যাই বেশী। নতুন মুসলিমের সংখ্যা সবচেয়ে বেশী দেশটির রাজধানী রিয়াদে। মোট ইসলাম গ্রহণকারীর ৫৬ শতাংশ (২৫ হাযার ৬৪২ জন) রিয়াদে কাজ করছেন। দেশটির ইসলামিক কল, গাইডেন্স অ্যান্ড ফরেন কমিউনিটি অর্গানাইজেশনের এক পরিসংখ্যানে এ তথ্য উঠে এসেছে। দেশটির বিভিন্ন শহরে সংস্থাটির ৪৫টি শাখা রয়েছে।

সঊদী আরবে নতুন আইন
ছালাত না পড়লে তিন দিনের জেল

সঊদী আরবে নতুন আইন হয়েছে। ছালাতের সময় দোকান খোলা থাকলে তিন দিনের জেল হয়ে যেতে পারে। দোকান খোলা থাকলে তখনই কিছু বলবে না দেশটির বিশেষ ধর্মীয় পুলিশ। আযান শেষে ৫ মিনিট সময় অতিবাহিত হ'লে তারা থানায় রিপোর্ট দিয়ে দিবে। রিপোর্ট পেয়ে সাদা পোশাকের পুলিশ এসে যেকোন মুহূর্তে দোকানীকে থানায় নিয়ে যাবে। সম্প্রতি একটি দোকান থেকে একজন বাংলাদেশী স্টাফকে রাত ১-টায় ধরে নিয়ে যাওয়ার খবর পাওয়া গেছে। কারণ সে মাগরিবের সময় দেরীতে দোকান বন্ধ করেছে। এভাবে আযান দেওয়ার সাথে সাথে দোকান বন্ধ করে না দিলে ১ থেকে ৩ দিন পর্যন্ত থানা হাজতে থাকতে হ'তে পারে। এভাবে দু'বার ধরা পড়ার পর আর আক্বামা অনুমোদন হবে না।

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

সূর্যের আলোয় পানি গরম করবে স্পঞ্জ

সূর্যের আলো ব্যবহার করে পানি ফোটানো যায় এমন স্পঞ্জের মতো যন্ত্র তৈরী করেছেন বিজ্ঞানীরা। তাপবাহী ধাতু, তামা, কার্বন ফোম এবং বাবল র‍্যাপ বা বুদবুদের মতো দেখতে মোড়ক দিয়ে এ স্পঞ্জ তৈরী হয়েছে। ঘরে বা শিল্প কারখানায় অতি সস্তায় পানি ফোটানোর কাজে এটি ব্যবহার করা যাবে, এমনটিই ধারণা করছেন যুক্তরাষ্ট্রের এমআইটির গবেষকরা। সূর্যের আলো ব্যবহার করে পানি ফোটানো নতুন কোন প্রযুক্তি নয়। কিন্তু বর্তমানে এ জন্য যে প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয় তা অত্যধিক ব্যয়বহুল। কিন্তু নতুন প্রযুক্তি সে তুলনায় অনেক সস্তা। এছাড়া প্রযুক্তি খাতের খুব কম দামী উপাদান ব্যবহার করা হয়েছে এতে। সাধারণভাবে যে আলো মানুষ দেখে, তা বিদ্যুৎ চৌম্বকীয় বর্ণালীর একটি ক্ষুদ্র অংশ মাত্র। এ বর্ণালীর অতি বেগুনি বা অবলোহিত রশ্মির মতো অনেক আলোক তরঙ্গই দেখতে পায় না মানুষের চোখ। এমআইটি গবেষকদের স্পঞ্জসদৃশ যন্ত্র পানি ফোটানোর জন্য বিদ্যুৎ চৌম্বকীয় বর্ণালীর প্রায় সব আলোক তরঙ্গই ব্যবহার করতে পারবে। স্পঞ্জ দিয়ে পানি ভেতরে ঢোকার পর তা নালী বেয়ে সুনির্দিষ্ট স্থানে জমা হয়। বাবল বা বুদবুদ মোড়কে আটকে পড়া সূর্যের আলোয় এ পানি অবিরাম গরম হ'তে থাকে। ফলে পানি খুব দ্রুত ফুটতে থাকে এবং বাষ্পে পরিণত হয়। অবশ্য এ যন্ত্র কবে বাজারে আসবে তা এখনো জানা যায়নি।

রাস্তায় আলো ছড়াবে প্রাকৃতিক গাছ!

রাস্তায় আলোর জন্য আগামীতে আর ল্যাম্পপোস্ট লাগবে না। কারণ রাস্তার দু'পাশে লাগানো গাছই আলো ছড়াবে। শুধু আলো ছড়াবে তাই নয় সাদা, হলুদ, নীলাভ এমনকি সবুজ আলোয় মায়াবী এক জগত সৃষ্টি করবে এসব গাছগুলো!

সম্প্রতি বিজ্ঞান সাময়িকী 'কারেন্ট বায়োলজি' এক গবেষণাপত্র প্রকাশ করে তাক লাগিয়ে দিয়েছে বিশ্বাবাসীকে। সেখানে বলা হয়েছে যে, শুধু জোনাকী, মাশরুম বা কয়েকটি অণুজীবই নয়, রাতে ঘুটঘুটে অন্ধকারের সময় আলো জ্বালিয়ে চমকে দেওয়ার ক্ষমতা রয়েছে কয়েকটি বিশেষ প্রজাতির ছত্রাকেরও!

বিজ্ঞানীরা বলেছেন, ব্রাজিলের আমাজান নদীর তীর ধরে গভীর অরণ্যে গেলে এ ধরনের ছত্রাক দেখা যায়। তারা দেখিয়েছেন যে, লুসিফেরিন নামে একটি প্রোটিন রয়েছে ছত্রাক ও মাশরুমের মধ্যে। এই লুসিফেরিন লুসিফেরেজ নামে একটি এনজাইমের মাধ্যমে বায়ুমণ্ডলের অক্সিজেনের সঙ্গে বিক্রিয়া তৈরি করে নীলাভ-সবুজ আলো জ্বালাতে সক্ষম। বর্তমানে ডিএনএ রিকম্বিনেশনের মাধ্যমে যদি অন্য প্রজাতির ছত্রাক কিংবা গাছের মধ্যেও আলো জ্বালানোর ক্ষমতা সৃষ্টি করা যায়, সেক্ষেত্রে আগামী দিনে ল্যাম্পপোস্টের বদলে আলো দেবে রাস্তার দু'পাশের ছত্রাক কিংবা সারি সারি করে লাগানো গাছ। বিজ্ঞানীরা বলছেন, এইসব ছত্রাক দিয়ে তৈরী করা যেতে পারে আলোকস্তম্ভও। এতে বিদ্যুতের চাহিদা কমানোর পাশাপাশি কমানো যাবে বায়ু ও পরিবেশ দূষণও!

কাপড় ধুয়ে ইস্ত্রি করে দেবে ওয়াশিং মেশিন

জাপানি ইলেকট্রনিক পণ্যনির্মাতা প্রতিষ্ঠান 'প্যানাসনিক' একটি স্বয়ংক্রিয় ওয়াশিং মেশিন তৈরী করেছে, যা কাপড় ধোয়া ও শুকানোর সাথে সাথে ইস্ত্রি এবং ভাজও করে দেবে। এটি বাজারে আসবে ২০১৯ সাল নাগাদ। যন্ত্রের মধ্যে স্থাপিত 'লনড্রয়েড' নামের একটি রোবট এই ওয়াশিং মেশিন নিয়ন্ত্রণ করবে।

Contents

সংগঠন সংবাদ

আন্দোলন

সংস্কৃতি চর্চা নয় বরং বিশ্বাসগত ভ্রান্তি দূর করার মাধ্যমেই জঙ্গীবাদ নির্মূল করা সম্ভব

-প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

গত ২৫ ও ২৬শে আগস্ট বৃহস্পতি ও শুক্রবার **'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'**-এর উদ্যোগে রাজশাহী মহানগরীর নওদাপাড়ায় অনুষ্ঠিত বার্ষিক কর্মী সম্মেলনে প্রদত্ত উদ্বোধনী ভাষণে সংগঠনের আমীর **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** উপরোক্ত মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, গান-বাজনা আর নষ্ট সংস্কৃতির চর্চা করিয়ে কখনো আমাদের সন্তানদের জঙ্গীবাদ থেকে বিরত রাখা যাবে না, যতক্ষণ না তার বিশ্বাসের পরিবর্তন করা সম্ভব হবে। বরং এধরনের ভ্রান্ত চিন্তা জঙ্গীবাদকে আরো উস্কে দিবে *(দৈনিক ইনকিলাব ২৭শে আগস্ট শনিবার ৪র্থ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত)*।

উদ্বোধনী ভাষণ : দেশের অধিকাংশ যেলা থেকে আগত নেতা, কর্মী ও সুধী মণ্ডলীর উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত উক্ত কর্মী সম্মেলনে উদ্বোধনী ভাষণের শুরুতে তিনি সর্বপ্রথম আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করেন। অতঃপর প্রশাসনকে ধন্যবাদ দেন, যারা আগের দিন সম্মেলনের উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করে চিঠি দেন এবং পরের দিন আবার অনুমতি দিয়ে চিঠি পাঠান। অতঃপর তিনি কর্মীদের ধন্যবাদ জানান। যারা অত্যন্ত স্বল্প সময়ের মোবাইল নোটিশে দূর-দারায থেকে অনেক কষ্ট স্বীকার করে চলে এসেছেন। অতঃপর তিনি সূরা ইবরাহীম ২৭ আয়াত পাঠ করেন এবং দুনিয়াতে ও কবরে কালেমা ত্বাইয়িবার উপর দৃঢ় থাকার শুভ পরিণাম ব্যাখ্যা করেন। অতঃপর তিনি বলেন, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' এদেশের তরুণ সমাজকে আল্লাহ মুখী সুনাগরিক হিসাবে গড়ে তোলার চেষ্টা করে যাচ্ছে। অল্প বয়স্ক একটা তরুণের জঙ্গী হওয়ার জন্য সে একা দায়ী নয় মন্তব্য করে তিনি বলেন, নয়নের পুত্তলি ঐ সন্তানটিকে কি তার পিতা-মাতা নিজের সবটুকু উজাড় করে মানুষ করেনি? কিন্তু ঐ প্রস্ফুটিত গোলাপটি কেন আজ নষ্ট হয়ে গেল? এর জন্য পিতা-মাতা হিসাবে যেমন আমরা দায়ী, তেমনি আমাদের পরিবার, সমাজ ও শিক্ষা ব্যবস্থা এবং প্রশাসন দায়ী। ইসলামের বিশুদ্ধ আক্বীদা শিক্ষা না দেওয়ার কারণে সে আজ বিপথগামী হয়েছে। এজন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন তার বিশ্বাসগত ভ্রান্তি দূর করা। তিনি বলেন, জঙ্গীবাদ দূর করতে হ'লে অবশ্যই আমাদের সন্তানদের সঠিক ইসলামী শিক্ষা দিতে হবে।

তিনি বলেন, আমাদের সন্তানরা ছোট থেকেই যদি কুরআন-হাদীছ পাঠ করত, সে যদি জানতো কিয়ামতের দিন প্রথম বিচার হবে খুনীর, তবে কি সে মানুষ খুন করত? যদি সে জানতো রাসূলের হাদীছ- 'যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের প্রতি অস্ত্র উত্তোলন করে, সে মুসলমানদের দলভুক্ত নয়' তাহ'লে সেকি অস্ত্র হাতে নিত?... তাকে এগুলি আমরা শিখাইনি। সুতরাং শিক্ষা ব্যবস্থার কর্ণধাররা সাবধান হয়ে যান। মনে রাখবেন গান শুনিয়ে আর কথিত সংস্কৃতির পাঠদান করে কখনোই জঙ্গীবাদ দমন করা যাবে না। যতক্ষণ না তার ভিতরকার বিশ্বাসের পরিবর্তন করা যাবে এবং তার মধ্যে আল্লাহভীতি সৃষ্টি করা যাবে।

তিনি বলেন, পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের দাওয়াত বা আন্দোলকেই বলা হয় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন'। যারা এই আন্দোলন সম্পর্কে অজ্ঞ, তারাই এ আন্দোলন সম্পর্কে নানা কথা বলেন। আজকে যাদেরকে জঙ্গী বলা হচ্ছে তাদের অনেকে নাকি রাফউল ইয়াদায়েন করে ছালাত আদায় করে। বাহ্যিক এই নিদর্শন দেখে অনেকেই ভুল বুঝছেন যে, আহলেহাদীছ জামা'আতের সবাই জঙ্গী। তিনি বলেন, হুজিনেতা, তাহরীর নেতা, আনছারুল্লাহ নেতা সহ হানাফীদের মধ্যে শত শত জঙ্গী থাকলেও তাদের নাম হয় না, অথচ একজন রাফাদানী ধরা পড়লে গোটা আহলেহাদীছ জামা'আতকে দোষারোপ করা হয়। তিনি এই সংকীর্ণ মানসিকতা পরিহার করার জন্য সরকার ও প্রশাসনের প্রতি আহ্বান জানান। পাশাপাশি হানাফী আলেম-ওলামা ও পীর-মাশায়েখদের প্রতি আহলেহাদীছ সম্পর্কে বিদ্বেষমূলক অপপ্রচার বন্ধের আহ্বান জানান। তিনি দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বলেন, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' কস্মিনকালেও কোনরূপ সন্ত্রাস ও জঙ্গী তৎপরতায় জড়িত ছিল না, আজও নেই, ভবিষ্যতেও থাকবে না ইনশাআল্লাহ। আমরা সর্বদা মধ্যপন্থী আক্বীদার অনুসারী এবং ১৯৯৮ সাল থেকে আমরাই সর্বপ্রথম এর বিরুদ্ধে সরকার ও জনগণকে সাবধান করে আসছি।

ইসলামিক ফাউণ্ডেশন কর্তৃক সরবরাহকৃত জুম'আর খুৎবার সমালোচনা করে তিনি বলেন, এর মাধ্যমে প্রকারান্তরে একথাই বুঝানো হচ্ছে যে, মসজিদগুলিই জঙ্গীবাদের প্রজনন ক্ষেত্র। খতীব ছাহেবরাই জঙ্গীবাদ উস্কে দিচ্ছেন। অথচ হাযার বছর ধরে এদেশে খুৎবা চলছে। খুৎবা শুনে কখনো কেউ জঙ্গী হয়েছে বলে আজও প্রমাণিত হয়নি। তিনি বলেন, এদেশের আলেম-ওলামারা খুৎবায় কি বলতে হবে তা ভালোভাবেই জানেন। তারা খুৎবার নামে ইসলামিক ফাউণ্ডেশনের শিখানো বুলি পড়তে বাধ্য নন।

তিনি সরকারের উদ্দেশ্যে বলেন, আমরা আপনাদেরকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে শাসন পরিচালনার আহ্বান জানাই। তবে এর অর্থ এই নয় যে, আমরা প্রচলিত নিয়মের মধ্যে বসবাস করতে রাযী নই। বরং সকল সরকারের শরী'আতসম্মত নির্দেশ আমরা মেনে চলব এবং শরী'আত বহির্ভূত আদেশের প্রতিবাদ করব এটাই আমাদের নীতি।

দরসে কুরআন : পরদিন শুক্রবার বাদ ফজর তিনি সূরা বাক্বারাহ ২১৩-১৪ আয়াতের উপর দরসে কুরআন পেশ করেন। তিনি বলেন, মানবজাতি সবাই এক উম্মতভুক্ত ছিল। অতঃপর তাদের মধ্যে বিভক্তি সৃষ্টি হয়েছিল আল্লাহ্র কিতাবকে দম্ভভরে প্রত্যাখ্যান করার কারণে। আজও সেই যিদ ও হঠকারিতার কারণে উম্মতের বিভক্তি অব্যাহত রয়েছে। মুসলিম উম্মাহ ৭৩ ফিরকায় বিভক্ত হয়েছে মূলতঃ

Contents

অহংকার ও হঠকারিতার কারণে। তারা নিজেদের ভ্রান্তির উপর যিদ করবে। কিন্তু কোন সংস্কার আন্দোলনকে তারা মেনে নিবে না। তারা হাবীলের প্রতি ক্বাবীলের ন্যায় ভাল-র প্রতি হিংসা করবেই। রাসূল (ছাঃ) সহ সকল নবীর বিরুদ্ধে স্ব স্ব আমলের সমাজ নেতাদের আক্রোশের কারণ ছিল মূলতঃ ভাল-র প্রতি হিংসা। আমরাও সেটা আমাদের জীবনে হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছি এবং এখনো পরীক্ষা দিয়ে চলেছি। এরপরেও হিংসা পরাজিত হবে এবং তাক্বওয়া বিজয়ী হবে; আমাদের সংগঠন তার বাস্তব প্রমাণ। ইনশাআল্লাহ এমন একটা সময় আসবে, যখন এ দেশের অধিকাংশ মানুষ সত্যিকার অর্থে 'আহলেহাদীছ' হয়ে যাবে।

অতঃপর তিনি 'ফিরক্বা নাজিয়াহ' তথা মুক্তিপ্রাপ্ত জামা'আতের বৈশিষ্ট্যগুলির উপর আলোকপাত করে বলেন, নাজী ফের্কার প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি হ'ল- (১) তাঁরা সংস্কারক হবেন। (২) আক্বীদার ক্ষেত্রে তারা সর্বদা মধ্যপন্থী হবেন এবং কখনোই চরমপন্থী বা শৈথিল্যবাদী হবেন না (৩) আল্লাহ্র নাম ও গুণাবলীর ক্ষেত্রে তারা সর্বদা পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের প্রকাশ্য অর্থের অনুসারী হবেন এবং ছাহাবায়ে কেরাম ও সালাফে ছালেহীনের বুঝ অনুযায়ী শরী'আত ব্যাখ্যা করবেন (৪) তারা জামা'আতবদ্ধভাবে আল্লাহ্র রাস্তায় সংগ্রাম করবেন এবং কখনোই উদ্ধত ও বিশৃংখলা সৃষ্টিকারী হবেন না (৫) তারা কুফর ও কুফরী শক্তির বিরুদ্ধে কঠোর ও শক্তিশালী থাকবেন এবং নিজেদের মধ্যে সর্বদা রহমদিল ও আল্লাহ্র প্রতি বিনীত থাকবেন (৬) তাঁরা যেকোন মূল্যে সুন্নাতকে আঁকড়ে থাকবেন ও বিদ'আত হ'তে দূরে থাকবেন (৭) তারা সর্বাবস্থায় সমবেতভাবে হাবলুল্লাহকে ধারণ করবেন এবং কখনোই সেখান থেকে বিচ্ছিন্ন হবেন না। কেউ তাদেরকে ছেড়ে গেলে সে অবস্থায় তারা আল্লাহ্র উপর ভরসা করবেন ও তাঁর গায়েবী মদদ কামনা করবেন।

আলোচনার একপর্যায়ে নেতা-কর্মীদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, যত ষড়যন্ত্র, যত অত্যাচারই হৌক না কেন, আমাদেরকে সর্বদা নাজী ফের্কার বৈশিষ্ট্য ধারণে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাতে হবে। শিরক ও বিদ'আতের বিরুদ্ধে আমাদের আপোষহীন থাকতেই হবে। প্রকৃত ইসলামের আলো ছড়িয়ে যেতেই হবে। ইসলামী অর্থনীতি, সমাজনীতি, রাষ্ট্রনীতির কথা বললে যদি কেউ ক্ষিপ্ত হন, তাতে আমাদের কিছুই যায় আসে না। আমরা সূদের বিরুদ্ধে, প্রচলিত হানাহানির রাজনীতির বিরুদ্ধে, দ্বিমুখী শিক্ষা ব্যবস্থার বিরুদ্ধে, শিরক ও বিদ'আতেপূর্ণ ধর্মীয় রীতির বিরুদ্ধে সর্বদা জাতিকে সতর্ক করেই যাবো ইনশাআল্লাহ। কারণ এখনি যদি আমার মরণ আসে, তাহ'লে আল্লাহ্র নিকটে কি জবাব দেব? তাই সত্য যতই তিক্ত হৌক না কেন, আমাদেরকে অবশ্যই তা বলে যেতে হবে।

অতএব হে কর্মী ভাইয়েরা! যে আদর্শ নিয়ে আমরা পথে নেমেছি, তার উপর সর্বদা দৃঢ় থাকুন। অল্পতেই যারা টলটলায়মান হয়, তাদের জন্য 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' নয়। যারা দোদুল্যমান, যারা কিছু সুবিধা ভোগ করতে চান, যারা দুনিয়াকে প্রাধান্য দিতে চান, তাদের জন্য এ আন্দোলন নয়। আদর্শ কখনই অর্থের নিকট বিক্রয় হয় না, আদর্শ কখনো স্বার্থের নিকট বিক্রি হয় না। আদর্শবান ব্যক্তিকে কখনো জেল-যুলুমের ভয় দেখিয়ে পিছপা করা যায় না। আদর্শবান ব্যক্তি দুনিয়াতে অত্যাচারিত ও নিগৃহীত হ'লেও আখেরাতে তারা হন সম্মানিত। সেকারণেই রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'ক্বিয়ামত পর্যন্ত একটি দল হক-এর উপর বিজয়ী থাকবে। পরিত্যাগকারীরা তাদের কোনই ক্ষতি করতে পারবে না' *(মুসলিম হা/১৯২০)*। আল্লাহ আমাদের সবাইকে দ্বীনে হক-এর উপর আমৃত্যু টিকে থাকার তাওফীক দান করুন- আমীন!

বক্তব্যের শেষ পর্যায়ে তিনি বর্তমান আওয়ামী সরকারের প্রতি মাথা ঠাণ্ডা রেখে কাজ করার আহ্বান জানিয়ে বলেন, দেশপ্রেম কোন নির্দিষ্ট একটি দলের জন্য একচেটিয়া নয়, বরং এদেশের প্রত্যেক নাগরিকই দেশপ্রেমিক। দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব রক্ষার দায়িত্ব প্রত্যেক নাগরিকের। তাই কাউকে অধিক প্রাধান্য দিয়ে ও কাউকে দূরে ঠেলে দিয়ে কাজ করলে ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। এভাবে একদেশদর্শী হয়ে কাজ করে বিদেশীদের অনুপ্রবেশের সুযোগ করে দিবেন না।

তিনি বলেন, এটা এমন একটি দেশ যা লক্ষ মানুষের রক্তের বিনিময়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। কেবল ১৯৭১ সালেই জীবন যায়নি, ১৯৪৭ সালেও বহু মানুষের জীবন গেছে। আমাদের বাপ-দাদারা স্রেফ ইসলামের জন্যই ৪৭-এ জীবন দিয়েছিলেন। আর ৪৭-এর মানচিত্রের উপরেই ৭১-এর 'বাংলাদেশ' গড়ে উঠেছে। আর সেই দেশ থেকে ইসলাম হারিয়ে যাবে তা আমরা কখনোই মেনে নেব না। সুতরাং দ্বীনদার-পরহেযগার মানুষদেরকে স্বাধীনভাবে চলতে দিন। বরং এরূপ কিছু মানুষের কারণেই আজ সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলি টিকে আছে। সাথে সাথে মুসলমানের দেশে মুসলমানদের নিগৃহীত করার মানসিকতা পরিত্যাগ করুন। সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় সহ শিক্ষা ও চাকুরীর বিভিন্ন ক্ষেত্রে কিছু মানুষরূপী শয়তান রয়েছে, যারা মুখে ধর্মনিরপেক্ষতার বুলি আওড়ালেও ইসলামের বিরুদ্ধে, পুরুষের দাড়ি-টুপী ও নারীদের বোরকা-হিজাবের বিরুদ্ধাচরণ করতে আদৌ পিছপা হন না। এইসব লোকদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করুন।

সমাপনী ভাষণ : পরদিন জুম'আর প্রাক্কালে সম্মেলন শেষে তিনি কর্মীদের উদ্দেশ্যে বলেন, পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে ইসলামী সমাজ গড়ার জন্য ইমারতের অধীনে দৃঢ়ভাবে জামা'আতবদ্ধ থাকুন। দেশী-বিদেশী চক্রান্ত সম্পর্কে সজাগ থাকুন। ভ্রান্ত পথে পা বাড়াবেন না। ইমারতের পক্ষ থেকে যে নির্দেশ যাবে, তাতে অটল থাকবেন। বাধা আসলে ধৈর্যের সাথে মোকাবেলা করবেন। কেবল আল্লাহ্র নিকট সাহায্য চাইবেন। তিনি গায়েবী মদদ করবেন ইনশাআল্লাহ।

জুম'আর খুৎবা : হামদ ও ছানা পাঠের পর আমীরে জামা'আত বার্ষিক কর্মী সম্মেলন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হওয়ায় আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করে বলেন, বর্তমান ভীতিকর রাজনৈতিক অবস্থা উপেক্ষা করে কেবলমাত্র মহান আল্লাহ্র সন্তুষ্টিকে সামনে রেখে অত্যন্ত স্বল্প সময়ের নোটিশে মারকাযে উপস্থিত হওয়ার জন্য আমরা আপনাদের প্রতি আন্তরিক শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি।

Contents

তিনি বলেন, প্রিয় সাথী ভাইয়েরা! কষ্টার্জিত অর্থ ব্যয় করে এখানে এসেছেন কেবলমাত্র নিজেদের ইহকালীন ও পরকালীন কল্যাণ সাধন ও ঈমান-আমল সংশোধনের দিকনির্দেশনা লাভের উদগ্র বাসনা নিয়ে। একইভাবে স্রেফ আল্লাহভীতির পুঁজি হৃদয়ে ধারণ করে ছহী-সালামতে স্ব স্ব গন্তব্যে পৌঁছে যাবেন বলে আমরা আশা পোষণ করি।

তিনি 'রিয়া' থেকে সাবধান করে বলেন, শিরক-বিদআত যেমন আমলকে ধ্বংস করে দেয়, তেমনি রিয়া বা লোক দেখানো আমল আল্লাহ্র দরবারে কবুল হয় না। তাই যতটুকু আমল করবেন তাতে যেন তিনটি বিষয় থাকে। (১) শিরক বিমুক্ত নির্ভেজাল তাওহীদ বিশ্বাস (২) বিদ'আত মুক্তভাবে ছহীহ সুন্নাহ্র পূর্ণ অনুসরণ (৩) ইখলাছে আমল অর্থাৎ কেবলমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কাজ করা।

বহু অর্থ ব্যয়ে মানুষ রাস্তাঘাট, বিদ্যালয়, মসজিদ-মাদ্রাসা স্থাপন করে থাকে, হাসপাতাল নির্মাণ করে, প্রাকৃতিক দুর্যোগে ত্রাণ সহায়তা প্রদান করে। কিন্তু তাদের এই কার্যক্রম যদি আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য না হয়ে লোক দেখানো হয় বা ভোটারদের মনস্তুষ্টির জন্য হয়, তাহ'লে দুনিয়ায় 'দানবীর' খেতাব পেয়ে সকল উপার্জন দুনিয়াতে রেখেই পরকালে পাড়ি দিতে হবে। তার এই লোক দেখানো আমল আল্লাহ্র দরবারে কবুল হবে না। কেননা তা তো সে আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য করেনি।

তাই সংগঠন করার পূর্বে নিয়তকে পরিশুদ্ধ করুন। মানুষকে দেখানোর জন্য, শোনানোর জন্য, দুনিয়া লাভের জন্য এক পাও আগে বাড়বেন না। যে কাজে নেকী নেই, সে কাজ থেকে বিরত থাকবেন। নেকীর কাজগুলো অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সম্পন্ন করবেন। যে কাজে গুনাহের সম্ভাবনা আছে, তা থেকে দূরে থাকবেন। যে ব্যক্তি আপনাকে মহান আল্লাহ্র পথে ডাকে আপনি তার সাথী হউন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্র পথ থেকে আপনাকে বিচ্যুত করার চেষ্টা করে, আপনি তাকে এড়িয়ে চলুন।

অতঃপর তিনি দুনিয়ার ফিৎনা থেকে নিজেকে ও নিজ পরিবারকে বাঁচানোর জন্য কয়েকটি পরামর্শ প্রদান করেন।-

(১) প্রথমে নিজের গৃহকে ইসলামী গৃহে পরিণত করুন। রহমতের ফেরেশতারা যেন সর্বদা আপনার বাড়িতে বিচরণ করতে পারে, তার জন্য নিজ গৃহকে ছবি-মূর্তি থেকে মুক্ত রাখুন।

(২) পরিবারের সদস্যদের নিয়মিত ছালাত আদায়ে অভ্যস্ত করুন। পুরুষ সদস্যদের মসজিদে জামা'আতে যেতে বাধ্য করুন। যিকির-আযকারে বাড়ী পূর্ণ রাখুন। কিছু কিছু নফল ছালাত বাড়িতে আদায় করবেন। নিয়মিত তাহাজ্জুদে অভ্যস্ত হউন। বৃদ্ধ হ'লে পড়বেন এই মানসিকতা পরিহার করে যৌবন বয়সকেই অগ্রাধিকার দিন।

ফজরের ওয়াক্তে আপনার সন্তানটি মসজিদে না গিয়ে ঘুমিয়ে আছে। আপনি মনে করছেন সারারাত পড়াশুনা করেছে বা দাওয়াতী কাজে ব্যস্ত থেকেছে। থাক পরে ক্বাযা করে নিবে। পিতা ডাকলেন না, মা-ও ডাকলেন না। কিন্তু না! এখানে অন্ধ হলে চলবে না। তাহ'লে ছেলেমেয়েরা ছালাত ক্বাযা করায় অভ্যস্ত হয়ে উঠবে। আর অবহেলার কারণে পিতা-মাতাও গুনাহগার হবেন।

(৩) বিশুদ্ধ জ্ঞানের আলোয় নিজ গৃহকে আলোকিত করে রাখুন। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের পাশাপাশি ইতিহাস, সমাজ, রাষ্ট্র ইত্যাদি বিষয়ে তথ্য সমৃদ্ধ সাহিত্য নিজে পড়বেন ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের পড়তে উৎসাহিত করবেন। ভালো বই ও ভালো মানুষের সান্নিধ্য উন্নত চরিত্র গঠনে সহায়তা করে। বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখবেন এমন কোন বই যেন আপনার পরিবার না পড়ে, যা চারিত্রিক সৌন্দর্য্যকে ধীরে ধীরে কালিমালিপ্ত করে দেয়।

(৪) মোবাইল, ট্যাব, ল্যাপটপসহ বিভিন্ন ডিজিটাল পণ্য ব্যবহারে সতর্ক হউন। বিশেষ করে অপ্রয়োজনে আপনার পরিবারের সদস্যদের মোবাইল ব্যবহারে নিরুৎসাহিত করুন। যারা ব্যবহার করছে তাদের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখুন, সে কোন কাজে তা ব্যবহার করছে। এসব পণ্যের ব্যবহারে ভালোর তুলনায় মন্দটাই বেশী হয়। অতএব সাবধান থাকুন।

(৫) অর্থ-সম্পদ, ক্ষমতা পৃথিবীতে পরীক্ষাস্বরূপ। এটা আল্লাহ কাউকে দিয়ে, আবার কাউকে না দিয়ে পরীক্ষা করেন। যেমন ফেরাউন রাষ্ট্রক্ষমতা পেয়ে তা যুলুমের পথে ব্যয় করেছিল। পক্ষান্তরে মূসা (আঃ)-কে আল্লাহ তদ্রুপ ক্ষমতা প্রদান করেননি। কিন্তু মূসার জন্যই আল্লাহ শক্তিশালী ফেরাউনকে দলবলসহ সাগরে ডুবিয়ে মেরেছেন। তাই যে যত বড় শক্তিশালীই হৌক না কেন, একজন তাওহীদপন্থী ঈমানদারের দো'আর সামনে কখনোই সে টিকতে পারবে না ইনশাআল্লাহ।

(৬) তিনি স্ব স্ব পরিবারকে শরী'আতের উপর দৃঢ় রাখার জন্য মা-বোনদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, স্বামী-সন্তান যদি ভ্রান্ত পথে যাওয়ার চেষ্টাও করে, তথাপি তারা আপনার দৃঢ়তায় ও ভালোবাসায় ফিরে আসতে বাধ্য হবে ইনশাআল্লাহ। আপনার স্বামী সূদ-ঘুষের টাকা নিয়ে আসছেন, স্ত্রী-সন্তানের জন্য দামী দামী কাপড় ক্রয় করছেন। স্বামীকে প্রশ্ন করুন- অল্প বেতনে কিভাবে তিনি এসব করছেন। বলুন- আপনার এই অবৈধ উপার্জন পরিবারের কোন সদস্য স্পর্শ করবেনা। যে স্ত্রী দ্বীনের ব্যাপারে এরূপ দৃঢ়চিত্ত হ'তে পারবেন, তিনিই হবেন হাদীছে বর্ণিত সেই স্ত্রীর মত, যাকে বলা হয়েছে 'দুনিয়ার সেরা সম্পদ' *(মুসলিম হা/১৪৬৭)*।

(৭) তিনি পিতা-মাতাদের প্রতি স্বীয় সন্তানকে দ্বীনের উপর দৃঢ় রাখার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানোর আহ্বান জানিয়ে বলেন, যখন আপনি জানলেন আপনার সন্তান কোন সূদভিত্তিক প্রতিষ্ঠানে চাকুরী করছে বা হারাম ব্যবসায়ে জড়িত হচ্ছে, তখন তাকে বলে দিন- আমি অভুক্ত থাকব, কিন্তু তোমার হারাম উপার্জন কখনোই স্পর্শ করবনা'। দেখবেন সন্তান একসময় উপলব্ধি করবে যে, আমার জন্মদাতা পিতা যখন আমার অর্থ নিচ্ছেন না, তখন কার জন্য আমি এসব উপার্জন করছি? এই উপলব্ধি তাকে অবশ্যই একদিন ফিরিয়ে আনবে হালাল পথে ইনশাআল্লাহ।

এভাবে সকলে সর্বাত্মকভাবে চেষ্টা করুন ঈমানের আলোকে স্ব স্ব পরিবারকে গড়ে তুলতে। পরিবারের সদস্যদের ঈমান যেন কখনই হ্রাসপ্রাপ্ত না হয়, সে ব্যাপারে সর্বদা সচেতন থাকবেন।

তিনি বলেন, কিছু ব্যাংক কর্মকর্তা আমার নিকট দো'আ চান এবং বলেন যেন তিনি একটা হালাল চাকুরী পেয়ে যান,

Contents

তারপর ব্যাংকের চাকুরী ছেড়ে দিবেন। আমি বলি- আগে ব্যাংকের চাকুরী ছাড়ুন, তারপর চাকুরী খুঁজুন। আপনাকে কে গ্যারান্টি দিয়েছে যে, চাকুরী ছাড়া পর্যন্ত আপনি বেঁচে থাকবেন? সূদের উপর মৃত্যু হলে পরিণতি কেমন হবে একবার ভেবে দেখুন তো? অতএব মানসিক শক্তি যোরদার করুন এবং বিশ্বাস দৃঢ় রাখুন যে, আপনার রূযির মালিক আপনি নন; আপনার প্রভু আল্লাহ।

তিনি বক্তা ভাইদের উদ্দেশ্যে বলেন, সংগঠনের যারা বক্তা রয়েছেন, তাদেরকে আমরা জোরালোভাবে বলে দিয়েছি- আপনারা অবশ্যই দাওয়াতী কাজে আত্মনিয়োগ করবেন। তবে মনে রাখবেন- ওয়ায-নছীহত ব্যবসার বস্তু নয়, তা কেবল পরকালীন মুক্তির জন্য নিবেদিত হ'তে হবে। আমাদের কর্মী ও শুভাকাংখীগণ আপনাদের যথাসাধ্য আপ্যায়ন ও পাথেয়র ব্যবস্থা করেন এবং করবেন। অতএব যাতায়াতের খরচ ব্যতীত কিছুই গ্রহণ করবেন না। একান্ত নিতে হ'লে কেন্দ্রীয় বায়তুল মাল ফাণ্ডে তা জমা করবেন।

সংগঠনের আমীর হিসেবে আমি স্পষ্ট ভাষায় বলে দিচ্ছি- সাবধান! ব্যবসার জন্য দাওয়াতী কাজ করবেন না। নইলে সমস্ত নেকী বরবাদ হয়ে যাবে।

তিনি সকলের প্রতি আখেরাতের স্বার্থে দুনিয়ার প্রতিটি কর্ম সম্পাদন করার আহ্বান জানিয়ে বলেন, যে ব্যক্তি দুনিয়ার জন্য দুনিয়া করে, সে কেবল দুনিয়া পায়, আখেরাত হারায়। যে দুনিয়ার জন্য দ্বীন করে, সে দুনিয়া-আখেরাত দু'টিই হারায়। আর যে ব্যক্তি আখেরাতের জন্য দুনিয়া করে, সে দুনিয়া ও আখেরাত দু'টিই পায়। তাই স্রেফ আখেরাতের জন্য কাজ করুন। দেখবেন দুনিয়া আপনার পায়ের নিচে লুটাবে। বিশ্বাস রাখুন- আল্লাহ আমাদের রিযিকদাতা। তিনি স্বয়ং আমাদের রূযির দায়িত্ব নিয়েছেন। তাই আল্লাহ্র সাহায্য পাওয়ার জন্য শুধুমাত্র তাঁর উপরেই নির্ভর করুন। তাঁর পথে সাধ্যমত সময়, শ্রম ও অর্থ ব্যয় করুন। বখীল হবেন না। তবেই আল্লাহ্র গায়েবী মদদ আসবে।

তিনি বলেন, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর নেতা-কর্মীরা কারা নির্যাতনের অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে। তারা গীবত-তোহমত ও যুলুম-নির্যাতনের শিকার হচ্ছে সদা-সর্বদা। বিভিন্ন ব্যক্তি, দল ও গোষ্ঠীর হিংসার শিকার হতে হচ্ছে প্রতিনিয়ত। প্রশাসনের প্রশ্নবিদ্ধ আচরণে সর্বদা দগ্ধীভূত হতে হচ্ছে আমাদের। এগুলো কি আমাদের জন্য পরীক্ষা নয়? মহান আল্লাহ্র কাছে বিনীতভাবে প্রার্থনা জানাচ্ছি, তিনি যেন আন্দোলনের সাথী ভাই ও বোনদের সকল কষ্ট ও বাধা দূর করে দেন- আমীন!

আমরা শান্তিপূর্ণ আন্দোলনে বিশ্বাসী। কোন অবস্থাতেই আমরা অশান্তি সৃষ্টিকারী কোন কাজ করি না। আমরা যাবতীয় জঙ্গীবাদ ও সন্ত্রাসবাদের ঘোর বিরোধী। সবসময় জনগণকে সমাজ ও রাষ্ট্রবিরোধী সকল কাজে আমরা সজাগ করে আসছি। সাথে সাথে সরকারকেও আমরা এসব বিষয়ে সতর্ক করেছি, বর্তমানেও করছি এবং ভবিষ্যতেও করে যাবো ইনশাআল্লাহ।

আমরা মনে-প্রাণে কামনা করি, পৃথিবীর মানুষ সত্যিকারার্থে ঈমানদার ও সৎকর্মশীল হয়ে গড়ে উঠুক। তাদের ঈমানে যেন কোন শিরক ও বিদ'আত না থাকে। তাদের প্রাত্যহিক কর্মে যেন হাদীছ বিরোধী কোন আমল না থাকে। আমাদের এই দাওয়াত আমাদের এই কর্মতৎপরতার বিনিময়ে আমরা মহান আল্লাহ্র কাছে শুধু রহমত ও জান্নাত কামনা করি। আমরা জাহান্নামকে যেমন ভয় করি, তেমনি জান্নাতের আকাংখা করি। এই ভয় ও আকাংখা নিয়েই আমরা আহলেহাদীছ আন্দোলন করি। যার বিনিময় আমরা দুনিয়াতে চাই না। চাই কেবল আখেরাতে। হে আল্লাহ! তুমি আমাদের এই প্রার্থনা কবুল কর!

আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে প্রকৃত ঈমানদার হওয়ার ও আমলে ছালেহ করার এবং ছিরাতে মুস্তাক্বীমের উপর দৃঢ় থেকে দুনিয়া থেকে বিদায় হওয়ার তাওফীক দান করুন- আমীন!

সম্মেলনের অন্যান্য রিপোর্ট :

১ম দিন বাদ আছর পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত ও জাগরণীর মাধ্যমে সম্মেলন শুরু হয়। অতঃপর প্রচার সম্পাদক ড. সাখাওয়াত হোসাইনের পরিচালনায় স্বাগত ভাষণ পেশ করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম এবং উদ্বোধনী পেশ করেন মুহতারাম আমীরে জামা'আত। অতঃপর মাগরিবের পূর্ব পর্যন্ত 'প্রশিক্ষণ' কর্মসূচী হিসাবে সদ্য প্রকাশিত 'শারঈ ইমারত' বইয়ের উপর দেড় ঘণ্টার একটি 'সামষ্টিক পাঠ' অনুষ্ঠিত হয়। যেখানে বিভিন্ন যেলার কর্মীদের পৃথক পৃথক নেতৃত্বে ভাগ করে 'সামষ্টিক পাঠ' শেষ করা হয়। অতঃপর একত্রিতভাবে পর্যালোচনা করা হয়। যার নেতৃত্ব দেন কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক ডঃ কাবীরুল ইসলাম ও 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ'-এর গবেষণা সহকারী নূরুল ইসলাম।

অতঃপর বাদ মাগরিব মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল (পাবনা) ইনফাক্ব ফী সাবীলিল্লাহ্র উপর বক্তব্য রাখেন। এরপর এশার ছালাত পর্যন্ত যেলা প্রতিনিধিগণ স্ব স্ব যেলার কর্মতৎপরতা ব্যাখ্যা করেন ও মূল্যবান পরামর্শ সমূহ পেশ করেন। বাদ এশা 'কর্মীদের গুণাবলী ও পারস্পরিক সহনশীলতা'র উপর বক্তব্য রাখেন মজলিসে শূরা সদস্য অধ্যাপক জালালুদ্দীন (নরসিংদী) এবং 'সংগঠনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা'র উপর বক্তব্য পেশ করেন সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম।

পরদিন বাদ ফজর আমীরে জামা'আত 'দরসে কুরআন' পেশ করার পর শূরা সদস্য কাযী হারূণুর রশীদ (ঢাকা)-এর পরিচালনায় 'জঙ্গীবাদ ও সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে আহলেহাদীছ আন্দোলনের ভূমিকা'-এর উপর বক্তব্য রাখেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন। অতঃপর 'ইহতিসাব' বইয়ের উপর কেন্দ্রীয় দফতর ও যুববিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম, 'হিসাব সংরক্ষণের গুরুত্ব ও অফিস ব্যবস্থাপনা'-এর উপর কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক বাহারুল ইসলাম এবং 'মৃত্যুকে স্মরণ'-এর উপর খুলনা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম আলোচনা পেশ করেন।

Contents

নাশতার বিরতির পর 'আদর্শ মানুষ গঠনে 'সোনামণি' সংগঠনের ভূমিকা'-এর উপর 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক আবদুল হালীম, 'যুবকদের ইসলামী আদর্শে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে অভিভাবকদের ভূমিকা'-এর উপর 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি আব্দুর রশীদ আখতার, 'চরমপন্থীদের দলীল ও তার জবাব'-এর উপর রাজশাহী-পশ্চিম যেলা সহ-সভাপতি মাওলানা দুর্রুল হুদা, 'দ্বীনের উপর দৃঢ়তা'-এর উপর 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা দুর্রুল হুদা বক্তব্য পেশ করেন। এরপর 'বার্ষিক সাংগঠনিক রিপোর্ট' পেশ করেন কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম। অতঃপর মুহতারাম আমীরে জামা'আতের সমাপনী ভাষণের মাধ্যমে সম্মেলন শেষ হয়।

কেন্দ্রীয় পরিষদ সদস্য সম্মেলন :

২য় দিন শুক্রবার সকাল ৯-টা থেকে ১১-টা পর্যন্ত আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর পূর্ব পার্শ্বস্থ মাদরাসার ৩য় তলায় 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় পরিষদ সদস্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে গঠনতন্ত্রের নিয়ম অনুযায়ী কেন্দ্রীয় বার্ষিক আয়-ব্যয়ের অডিটকৃত হিসাব সহ সংগঠনের সার্বিক রিপোর্ট পেশ করা হয়। সাথে সাথে তাঁদের মূল্যবান পরামর্শ সমূহ গ্রহণ করা হয়।

উল্লেখ্য যে, বিরূপ রাজনৈতিক পরিস্থিতি সত্ত্বেও অত্র সম্মেলনে দেশের অধিকাংশ যেলা থেকে সহস্রাধিক কর্মী অংশগ্রহণ করেন।

গৃহীত প্রস্তাব সমূহ :

বার্ষিক কর্মী সম্মেলন ২০১৬-তে নিম্নোক্ত প্রস্তাবসমূহ বিবেচনার জন্য দেশের সরকার ও জনগণের নিকটে পেশ করা হয় এবং তা বিপুলভাবে সমর্থিত হয়-

(১) পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে দেশের আইন ও শাসন ব্যবস্থা চালু করতে হবে এবং মানুষের রক্তচোষা সূদভিত্তিক পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থা বাতিল করে ইসলামী অর্থনীতি চালু করতে হবে। (২) হিংসা ও প্রতিহিংসার রাজনীতি বন্ধ করে দল ও প্রার্থীবিহীন ইসলামী নির্বাচন ব্যবস্থা চালু করতে হবে। (৩) জঙ্গীবাদের বিশ্বাসগত ভ্রান্তি দূর করার জন্য শিক্ষার সর্বস্তরে ধর্মীয় শিক্ষা বাধ্যতামূলক করতে হবে। (৪) ইসলামের বিরুদ্ধে যেকোন ধরনের উসকানীমূলক কার্যক্রম বন্ধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। (৫) ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ কর্তৃক প্রচারিত Hallo CT apps-এর প্রমোশনাল ভিডিও থেকে 'ইক্বামতে দ্বীন : পথ ও পদ্ধতি' এবং 'আক্বীদায়ে মোহাম্মদী বা মাযহাবে আহলেহাদীছ' বই দু'টির ছবি অতি দ্রুত অপসারণ করতে হবে। (৬) ইসলামিক ফাউন্ডেশনের পরিচালনা কমিটি, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সিলেবাস কমিটি ও ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনা কমিটিতে 'আহলেহাদীছ' প্রতিনিধি রাখতে হবে। (৭) আহলেহাদীছদের বিরুদ্ধে বিষোদগার বন্ধ করতে হবে এবং নির্দোষ কাউকে জঙ্গীবাদের অপবাদে অভিযুক্ত না করে প্রকৃত দোষীদের খুঁজে বের করে দৃষ্টান্ত মূলক শাস্তি দিতে হবে। (৮) সুন্দরবনকে রক্ষার জন্য রামপাল কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্প নির্মাণের অনুমতি অবিলম্বে বাতিল করতে হবে। (৯) মরণফাঁদ ফারাক্কা তুলে ফেলার জন্য এবং তিস্তার বিপরীতে গজলডোবা ও সিলেটের বিপরীতে টিপাইমুখ বাঁধসহ আন্তঃ নদীসংযোগ প্রকল্প বাতিল করার জন্য ভারত সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করতে হবে। প্রয়োজনে আন্তর্জাতিক আদালতে মামলা করার জন্য এ সম্মেলন সরকারের প্রতি জোর দাবী জানাচ্ছে। (১০) বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত সর্বস্বহারা মানুষদের পর্যাপ্ত সহযোগিতা প্রদান ও পুনর্বাসনে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সরকার ও সচ্ছল ভাই-বোনদের প্রতি এ সম্মেলন উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছে। (১১) কাশ্মীর, সিরিয়া ও ফিলিস্তীন সহ বিভিন্ন মুসলিম দেশে ব্রাহ্মণ্যবাদী ও সাম্রাজ্যবাদীদের রক্তের হোলিখেলা বন্ধে আন্তর্জাতিকভাবে চাপ সৃষ্টি করতে হবে। (১২) ডা. যাকির নায়েক পরিচালিত 'পীস টিভি'র উপর সরকারী নিষেধাজ্ঞা অবিলম্বে তুলে নিতে হবে এবং এর সম্প্রচার পুনরায় শুরু করতে হবে।

সন্ত্রাসবাদ ও জঙ্গীবাদের বিরুদ্ধে অনুষ্ঠিত সমাবেশ, মানববন্ধন ও সংবাদ সম্মেলন সমূহ *(গত সংখ্যার পর)*

নওগাঁ ১০ই আগস্ট বুধবার : অদ্য সকাল ১১-টায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' নওগাঁ যেলার উদ্যোগে শহরের নওজোয়ান মাঠের সম্মুখস্থ সড়কে (মুক্তির মোড়ে) এক মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুস সাত্তারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ আফযাল হোসাইন, সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক শহীদুল আলম, প্রচার সম্পাদক মাওলানা মুহাম্মাদ আফযাল হোসাইন ও সদর শাখা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক বীর মুক্তিযোদ্ধা ডাঃ আলতাফ হোসাইন প্রমুখ।

বাঘা, রাজশাহী ১১ই আগস্ট বৃহস্পতিবার : অদ্য সকাল ৯-টায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' বাঘা উপযেলার উদ্যোগে মণিগ্রাম ইউনিয়ন পরিষদ সংলগ্ন চারঘাট-ঈশ্বরদী সড়কে এক মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। বাঘা উপযেলা 'আন্দোলন' -এর সভাপতি মাওলানা আবুল হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম, রাজশাহী-পূর্ব সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মাস্টার এস.এম. সিরাজুল ইসলাম, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, সহ-সভাপতি আব্দুল্লাহিল কাফী, বাঘা উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি আব্দুর রাকীব ও সাংগঠনিক সম্পাদক আনোয়ারুল হক প্রমুখ। মানববন্ধন শেষে জনগণের মাঝে জঙ্গী বিরোধী লিফলেট ও বই বিতরণ করা হয়।

নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর-পূর্ব ১২ই আগস্ট শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' দিনাজপুর-পূর্ব সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে নবাবগঞ্জ বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন সড়কে এক মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল ওয়াহহাব শাহের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আনোয়ারুল হক, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাধারণ সম্পাদক রায়হানুল ইসলাম ও সাবেক সভাপতি আবুবকর প্রমুখ।

Contents

পার্বতীপুর, দিনাজপুর ১২ই আগস্ট শুক্রবার : অদ্য সকাল ১০-টায় পার্বতীপুর প্রেসক্লাবে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' পার্বতীপুর উপযেলার উদ্যোগে এক সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা ছাদেকুল ইসলাম। তিনি বলেন, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' কুরআন-হাদীছের আলোকে পরিচালিত নির্ভেজাল ইসলামী আন্দোলনের নাম। সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদকে এই আন্দোলন সমর্থন করে না। তিনি বলেন, যারা সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদের সাথে জড়িত তাদের কেউ 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কর্মী নয়।

সংবাদ সম্মেলন শেষে সকাল ১১-টায় পার্বতীপুর শহীদ মিনার সংলগ্ন সড়কে সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদের বিরুদ্ধে এক মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা ছাদেকুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন চিরিরবন্দর উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি জনাব মামূনুর রশীদ, পার্বতীপুর উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল আলীম, উপযেলা 'যুবসংঘ'-এর ভারপ্রাপ্ত সভাপতি সাজ্জাদ হোসাইন, সাধারণ সম্পাদক মুনীরুয্যামান, সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল-মাহমূদ, প্রচার সম্পাদক রাহাত হোসাইন প্রমুখ। এতে শতাধিক নেতা-কর্মী অংশগ্রহণ করেন *(১৩ই আগস্ট দৈনিক ইত্তেফাক, কালের কণ্ঠ ও জনকণ্ঠ প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত)*।

সন্ত্রাসবাদ ও জঙ্গীবাদের বিরুদ্ধে র‌্যালী ও পথসভা

মোহনপুর, রাজশাহী ১১ই সেপ্টেম্বর রবিবার : অদ্য সকাল ১১-টায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' মোহনপুর উপযেলার উদ্যোগে সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদের বিরুদ্ধে মোহনপুর উপযেলা চত্বরে এক র‌্যালী ও পথসভা অনুষ্ঠিত হয়। উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আফাযুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত পথসভায় বক্তব্য রাখেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দফতর ও যুববিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম, রাজশাহী-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মাওলানা দুররুল হুদা, উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা ইমদাদুল হক ও ধুরইল এলাকা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল বারী প্রমুখ। উল্লেখ্য, এর পূর্বে উপযেলা চত্বর থেকে জঙ্গীবাদ বিরোধী একটি র‌্যালী বের হয়ে উপযেলা মেডিক্যাল মোড় হয়ে ডাকবাংলা ঘুরে উপযেলা চত্বরে গিয়ে পথসভার মাধ্যমে শেষ হয়। উক্ত র‌্যালী ও পথসভায় উপযেলার বিভিন্ন এলাকা আগত পাঁচ শতাধিক নেতা, কর্মী ও সুধী অংশগ্রহণ করে।

যুবসংঘ

'আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় কমিটি পুনর্গঠন

রাজশাহী ২৫শে ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ এশা 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় কার্যালয় নওদাপাড়া রাজশাহীতে কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। 'যুবসংঘ' -এর কেন্দ্রীয় সভাপতি আব্দুর রশীদ আখতারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান পৃষ্ঠপোষক মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় যুববিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম। সম্মেলনে 'যুবসংঘ'-এর ২০১৬-২০১৮ সেশনের পুনর্গঠিত কেন্দ্রীয় কমিটি ঘোষণা করা হয়।

২০১৬-২০১৮ সেশনের কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ

	নাম	পদ	শিক্ষাগত যোগ্যতা	সাংগঠনিক মান	যেলা
১	আব্দুর রশীদ আখতার	সভাপতি	কামিল	কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য	কুষ্টিয়া
২	মুহাম্মাদ আরীফুল ইসলাম	সহ-সভাপতি	দাওরায়ে হাদীছ; এম,এ	ঐ	চাঁপাই নবাবগঞ্জ
৩	মুস্তাক্বীম আহমাদ	সাধারণ সম্পাদক	বি,এ	ঐ	রাজশাহী
৪	শেখ আব্দুছ ছামাদ	সাংগঠনিক সম্পাদক	দাওরায়ে হাদীছ; এম,এ	ঐ	সাতক্ষীরা
৫	আব্দুল্লাহিল কাফী	অর্থ সম্পাদক	এম,এ	ঐ	রাজশাহী
৬	আবুল বাশার আব্দুল্লাহ	প্রচার সম্পাদক	কামিল	ঐ	মেহেরপুর
৭	আবুল কালাম	প্রশিক্ষণ সম্পাদক	কামিল	ঐ	জয়পুরহাট
৮	ইহসান ইলাহী যহীর	ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক	দাওরায়ে হাদীছ; বি,এ, অনার্স (অধ্যয়নরত)	ঐ	কুমিল্লা
৯	মুস্তাফীযুর রহমান সোহেল	তথ্য ও প্রকাশনা সম্পাদক	এম,কম	ঐ	নারায়ণগঞ্জ
১০	মুখতারুল ইসলাম	সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক	দাওরায়ে হাদীছ; এম,এ	ঐ	রাজশাহী
১১	সা'দ আহমাদ	সমাজ কল্যাণ সম্পাদক	এস,এস,সি	ঐ	মেহেরপুর
১২	মিনারুল ইসলাম	দফতর সম্পাদক	বি,এ,অনার্স (অধ্যয়নরত)	কর্মী	রাজশাহী

মৃত্যু সংবাদ

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' রাজশাহী যেলার সাবেক উপদেষ্টা ও 'আন্দোলন'-এর একনিষ্ঠ শুভাকাঙ্ক্ষী, সপুরা মিয়াঁপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদের দীর্ঘ দিনের কোষাধ্যক্ষ ও বর্তমান কমিটির উপদেষ্টা জনাব মুহাম্মাদ মানছূর রহমান (৭০) গত ৭ই সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার দিবাগত রাত সাড়ে ১২-টায় রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন। *ইন্না লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেঊন*। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, ২ ছেলে, ১ মেয়ে সহ বহু আত্মীয়-স্বজন ও গুণগ্রাহী রেখে যান। পরদিন ৮ই সেপ্টেম্বর বুধবার বেলা ২-টায় সপুরা আহলেহাদীছ ঈদগাহ ময়দানে তার জানাযার ছালাত অনুষ্ঠিত হয়। জানাযা ছালাতে ইমামতি করেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন। 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম, রাজশাহী সদর 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মুবীনুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক ডা. সিরাজুল হক, রাজশাহী-পশ্চিম যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মাওলানা দুররুল হুদা সহ রাজশাহী সদর, রাজশাহী-পূর্ব ও পশ্চিম সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন' ও যুবসংঘে'র দায়িত্বশীলগণ, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উক্ত জানাযায় অংশগ্রহণ করেন। অতঃপর সপুরা গোরস্থানে তাকে দাফন করা হয়। জনাব মানছূর রহমান দীর্ঘদিন যাবৎ হৃদরোগে ও প্রেসারে ভুগছিলেন।

[আমরা তার রূহের মাগফেরাত কামনা করছি এবং তার শোকাহত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।- সম্পাদক]

Contents

প্রশ্নোত্তর

দারুল ইফতা, হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্ন (১/১) : সাহারী খাওয়ার পূর্বে সিগারেট-তামাক, গুল-জর্দা খেয়ে আমাদের এলাকায় অনেকে ছিয়াম পালন করে। তাদের ছিয়াম কবুলযোগ্য হবে কি?

-নাঈম হোসাইন, পবা, রাজশাহী।

উত্তর : ছিয়াম পালনের ফরযিয়াত আদায় হয়ে যাবে। কারণ সে ছিয়ামের শর্ত পূর্ণ করেছে। তবে হারাম খাদ্য খাওয়ার কারণে সে গুনাহগার হবে এবং তার ছিয়াম ত্রুটিপূর্ণ হবে। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা ও তার উপর আমল করা ছাড়তে পারল না, তার খানা-পিনা পরিত্যাগ করায় আল্লাহ্র কোন প্রয়োজন নেই' *(বুখারী হা/১৯০৩; মিশকাত হা/১৯৯৯)*। বিড়ি-সিগারেট, তামাক-জর্দা-গুল ইত্যাদি মাদকদ্রব্যের অন্তর্ভুক্ত, যা খাওয়া বা ব্যবহার করা সর্বাবস্থায় নিষিদ্ধ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'মাদকতা আনয়নকারী প্রত্যেক বস্তুই মদ এবং প্রতিটি মাদকদ্রব্য হারাম' *(মুসলিম হা/২০০৩; মিশকাত হা/৩৬৩৮)*। তিনি বলেন, যে বস্তুর বেশী পরিমাণে মাদকতা আসে, তার কম পরিমাণও হারাম' *(তিরমিযী হা/১৮৬৫; ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৩৬৪৫, সনদ ছহীহ)*।

প্রশ্ন (২/২) : যদি কোন ব্যবসায়ী বাকীতে গরুর ভুষি বিক্রয় করে এই শর্তে যে, তুমি অমুক দিন পর্যন্ত বাকীতে নিবে এবং কম হোক বা বেশী হোক সেদিন ভুষির যে বাজারদর থাকবে সে অনুযায়ী মূল্য পরিশোধ করবে। এরূপ লেনদেন বৈধ হবে কি?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
আলমডাঙ্গা, চুয়াডাঙ্গা।

উত্তর : মূল্য নির্ধারণ না করে এরূপ লেনদেন বৈধ হবে না। কেননা তা 'গারার' বা প্রতারণার অন্তর্ভুক্ত হবে, যা থেকে রাসূল (ছাঃ) নিষেধ করেছেন *(মুসলিম হা/১৫১৩; মিশকাত হা/২৮৫৪)*।

প্রশ্ন (৩/৩) : মৃত দাদীর নামে ইফতার মাহফিল করা যাবে কি এবং তাতে ধনী-গরীব সবাই শরীক হ'তে পারবে কি?

-আবদুল হামীদ, দিনাজপুর।

উত্তর : মৃত ব্যক্তির নামে ইফতার মাহফিল করা যাবে না, যেখানে সকল শ্রেণীর মানুষ অন্তর্ভুক্ত থাকবে। কারণ মৃত ব্যক্তির নামে যা করা হয় তা হ'ল ছাদাক্বাহ, যা ধনীরা খেতে পারে না *(তওবাহ ৯/৬০; তিরমিযী হা/৬৫২)*। তবে কেবলমাত্র দরিদ্র ছায়েমদের ইফতার করানো যাবে বা তাদের মধ্যে ছাদাক্বা হিসাবে ইফতার বিতরণ করা যাবে। জনৈক ব্যক্তি তার মৃত মায়ের জন্য দান করার অনুমতি চাইলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে দান করার অনুমতি দেন এবং বলেন এ দানের নেকী তোমার মা পাবেন' *(বুখারী হা/১৩৮৮; মুসলিম হা/১০০৪; মিশকাত হা/১৯৫০)*।

প্রশ্ন (৪/৪) : ক্বিয়ামতের দিন মানুষের আত্মার সাথে দেহ জুড়ে দেওয়া হবে, না কি দেহ ছাড়া কেবল আত্মা পুনর্জীবিত হবে?

-যাকারিয়া খন্দকার, দামুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা।

উত্তর : মৃত্যুর পরে রূহ কিছুক্ষণের জন্য দেহ হ'তে বিচ্ছিন্ন হলেও পুনরায় আপন দেহে তা স্থাপন করা হবে এবং বান্দাকে তিনটি প্রশ্ন করা হবে *(আহমাদ হা/১৮৫৫৭; ইবনু মাজাহ হা/৪২৬২; মিশকাত হা/১৬৩০)*। ক্বিয়ামতের দিনও মানুষের আত্মার সাথে তার দেহ জুড়ে দেওয়া হবে *(ফজর ৮৯/২৭-৩০; ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ' ফাতাওয়া ৫/৪৪৬)*। তবে সেটি বর্তমান দেহের মত হবে, না কি অন্য দেহে রূহ স্থাপন করা হবে, এ বিষয়ে আল্লাহই ভালো জানেন। কারণ এটি বারযাখী জীবনের বিষয়। যা দুনিয়াবী জীবনের সাথে তুলনীয় নয় *(উছায়মীন, ফাতাওয়া নূরুন 'আলাদ-দারব ১২/১৬)*।

প্রশ্ন (৫/৫) : ফজরের আযান দেওয়া অবস্থায় সাহারী খাওয়া শুরু করে ছালাত শেষ হওয়া পর্যন্ত খাবার খেয়েছি। আমাদের ছিয়াম কবুল হবে কি?

-ইবরাহীম খলীল, গুলশান, ঢাকা।

উত্তর : এমতাবস্থায় ছিয়াম হবে না। বরং ভুলবশতঃ এরূপ করে ফেললে ক্বাযা আদায় করতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তোমরা (রামাযানের রাতে) খানাপিনা কর, যতক্ষণ না (রাত্রির) কালো রেখা হ'তে ভোরের শুভ্ররেখা স্পষ্ট হয় *(বাক্বারাহ ২/১৮৭)*। তবে আযানের পূর্বে খাওয়া শুরু করলে আযান শুরু হলেও দ্রুত খাওয়া সম্পন্ন করবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যখন তোমাদের কেউ খাবার পাত্র অথবা পানির পাত্র হাতে নেয় আর এমতাবস্থায় আযান হয়ে যায়, তখন সে যেন তা রেখে না দেয়; বরং খাওয়া শেষ করে' *(আবুদাঊদ হা/২৩৫০; মিশকাত, হা/১৯৮৮ 'ছওম' অধ্যায়)*।

প্রশ্ন (৬/৬) : আমি একটি মেয়ের সাথে তাকে বিবাহ করব বলে ওয়াদাবদ্ধ হই। কিন্তু আমার পিতা-মাতা এতে রাযী হচ্ছেন না। এক্ষণে আমি উক্ত ওয়াদা রক্ষা করব, নাকি পিতা-মাতার নির্দেশ শুনব?

-মাহবূব, মান্দা, নওগাঁ।

উত্তর : বিবাহের পূর্বে এরূপ ওয়াদাবদ্ধ হওয়ার কোন সুযোগ ইসলামে নেই। তাই পিতা-মাতার নির্দেশ মেনে নিতে হবে। কেননা শরী'আত বিরোধী নির্দেশ ছাড়া অন্য সকল ব্যাপারে পিতা-মাতার আনুগত্য করা অপরিহার্য *(নিসা ৪/৩৬; আনকাবূত ২৯/৮; ইসরা ১৭/২৩, ২৪, লোকমান ৩১/১৪)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'পিতা-মাতার সন্তুষ্টিতে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি ও পিতা-মাতার অসন্তুষ্টিতে আল্লাহ্র অসন্তুষ্টি' *(তিরমিযী হা/১৮৯৯, মিশকাত হা/৪৯২৭; ছহীহাহ হা/৫১৬)*।

প্রশ্ন (৭/৭) : কুরআনে বর্ণিত 'উসওয়াতুন হাসানাহ' বলতে কি বুঝায়?

-আবু সাঈদ খান, ঢাকা।

উত্তর : উক্ত বাক্য দ্বারা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সামগ্রিক জীবনাদর্শকে বুঝানো হয়েছে। আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ্র রাসূলের মধ্যে তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ নিহিত

রয়েছে, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিবসকে কামনা করে ও অধিকহারে আল্লাহকে স্মরণ করে' *(আহযাব ৩৩/২১)*। ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ)-এর বাণী, কর্ম ও তাঁর সামগ্রিক অবস্থাকে অনুসরণ করার জন্য এই আয়াতটি একটি বড় ভিত্তি *(ইবনু কাছীর, ঐ আয়াতের তাফসীর দ্রঃ ৬/৩৯১)*। কারণ রাসূল (ছাঃ)-এর সামগ্রিক জীবনকে অনুসরণ করলে কুরআনকেই অনুসরণ করা হবে। আয়েশা (রাঃ)-কে তাঁর চরিত্র সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হ'লে তিনি বলেন, তাঁর চরিত্র ছিল কুরআন। তোমরা কি জানোনা যে, আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আর অবশ্যই আপনি মহান চরিত্রের উপর অধিষ্ঠিত' *(কলম ৬৮/৪; আহমাদ হা/২৪৬৪৫; ছহীহুল জামে' হা/৪৮১১)*।

প্রশ্ন (৮/৮) : বিভিন্ন হাদীছে পাওয়া যায় যে, ছাহাবায়ে কেরাম বলতেন, 'হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য উৎসর্গীত হৌন'। এর মর্মার্থ কি?

- রায়হান, রাণীনগর, নওগাঁ।

উত্তর : এ ধরনের বাক্য মূলতঃ আরবী বাকরীতি। এর দ্বারা নিগূঢ় ভালবাসা ও আনুগত্য প্রকাশ করা হয় মাত্র। ছাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে কোন কথা বলতে চাইলে এ ধরনের বাক্য ব্যবহার করে তাঁকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করতে চাইতেন এবং আনুগত্য প্রকাশ করতেন। সাথে সাথে 'আমার পিতা-মাতাকে আপনার জন্য ফিদইয়া বা মুক্তিপণ দিতে রাযী আছি' একথা বুঝাতেন *(ফাৎহুল বারী, 'মানাক্বিব' অধ্যায়, ১৩ অনুচ্ছেদ হা/৩৭২৮-এর ব্যাখ্যা)*। এছাড়া রাসূল (ছাঃ)ও কখনো কখনো কোন ছাহাবীর উদ্দেশ্যে এরূপ বাক্য ব্যবহার করেছেন। যেমন ওহোদ যুদ্ধের দিন তিনি সা'দ বিন আবু ওয়াকক্বাছ (রাঃ)-কে উদ্দেশ্য করে বলেন, আমার পিতা-মাতা তোমার জন্য উৎসর্গিত হৌন, তুমি তীর নিক্ষেপ কর *(বুখারী হা/৪০৫৯; মুসলিম হা/২৪১১; মিশকাত হা/৬১০৩; সীরাতুর রাসূল (ছাঃ), ৩য় মুদ্রণ পৃ. ৩৬০ টীকা-৪৮৭)*।

প্রশ্ন (৯/৯) : সহো সিজদা দেওয়ার নিয়ম কি? সহো সিজদার পর একদিকে সালাম ফিরাতে হবে না দু'দিকে?

-মীযান, মোল্লাহাট, বাগেরহাট।

উত্তর : সহো সিজদার নিয়ম হ'ল- (১) যদি ইমাম ছালাতরত অবস্থায় নিজের ভুল সম্পর্কে নিশ্চিত হন কিংবা সরবে 'সুবহানাল্লাহ' বলার মাধ্যমে লোকমা দিয়ে মুক্তাদীগণ ভুল ধরিয়ে দেন, তবে তিনি শেষ বৈঠকের তাশাহ্হুদ শেষে তাকবীর দিয়ে পরপর দু'টি সিজদা দিবেন। অতঃপর সালাম ফিরাবেন *(মুসলিম, মিশকাত হা/১০১৫; মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/১০১৮ 'সহো' অনুচ্ছেদ-২০)*। (২) যদি রাক'আত বেশী পড়ে সালাম ফিরিয়ে দেন, অতঃপর ভুল ধরা পড়ে, তখন (পূর্বের ন্যায় বসে) তাকবীর দিয়ে 'সিজদায়ে সহো' করে সালাম ফিরাবেন *(মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/১০১৬)*। (৩) যদি রাক'আত কম করে সালাম ফিরিয়ে দেন। তখন তাকবীর দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বাকী ছালাত আদায় করবেন ও উপরোক্তভাবে 'সিজদায়ে সহো' দিয়ে পুনরায় সালাম ফিরাবেন *(মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/১০১৭)*। (৪) ছালাতের কমবেশী যাই-ই হৌক সালামের আগে বা পরে দু'টি 'সিজদায়ে সহো' দিবেন *(মুসলিম হা/৫৭২; বিস্তারিত দ্রঃ ছালাতু রাসূল (ছাঃ) ১৫৩-৫৪ পৃ.)*। মোটকথা 'সিজদায়ে সহো' সালামের পূর্বে ও পরে দু'ভাবেই জায়েয আছে। কিন্তু তাশাহহুদ শেষে কেবল ডাইনে একটি সালাম দিয়ে দু'টি 'সিজদায়ে সহো' করে পুনরায় তাশাহ্হুদ ও দরূদ পড়ে দু'দিকে সালাম ফিরানোর প্রচলিত প্রথার কোন ভিত্তি নেই *(মির'আতুল মাফাতীহ ২/৩২-৩৩ পৃ.; ঐ, ৩/৪০৭, হা/১০২৪-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য; ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) ১৫৩ পৃ.)*। আর সহো সিজদার পর দু'দিকে সালাম ফিরানোই উত্তম *(আবুদাউদ হা/৯৯৬; ইরওয়া হা/৩২৬; মিশকাত হা/৯৫০)*।

প্রশ্ন (১০/১০) : নিজস্ব পরিবহন থাকা অবস্থায় সফরে ঠিক ওয়াক্ত মত ছালাত আদায় করা উত্তম, না কি যোহর ওয়াক্তে আছর বা আছর ওয়াক্তে যোহর জমা করা উত্তম হবে? এসময় একাকী না জামা'আত করা উত্তম?

-আব্দুল লতীফ, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

উত্তর : সফর অবস্থায় জমা তাক্বদীম ও তাখীর করাই উত্তম *(বুখারী হা/১১১২; মুসলিম হা/৭০৪; মিশকাত হা/১৩৪৪)*। রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরাম অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিজস্ব পরিবহনে সফর করতেন এবং সেক্ষেত্রে তারা জমা ও ক্বছরই করতেন। আর ফরয ছালাত জামা'আতে আদায় করা সর্বাবস্থায় যরূরী *(নিসা ৪/১০২; দ্রঃ ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) ১৮৮ পৃ.)*।

প্রশ্ন (১১/১১) : বিভিন্ন অসুবিধার কারণে মসজিদের পবিত্রতা রক্ষা করা অসম্ভব হয়ে পড়ছে। এক্ষণে জমি বিনিময় করে পৃথক স্থানে মসজিদ নির্মাণ করায় শরী'আতে কোন বাধা আছে কি?

-রাকীবুল হাসান, সৈয়দপুর।

উত্তর : শারঈ কারণে মসজিদ স্থানান্তরে কোন বাধা নেই। অতএব উক্ত জমি বিক্রয় ও এওয়ায বা বিনিময় করা যাবে। ওমর ফারূক (রাঃ) কূফার পুরাতন মসজিদের স্থানটি বিক্রয় করেন এবং অন্য স্থানে মসজিদ নির্মাণ করেন। অতঃপর পুরাতন মসজিদের স্থানটি খেজুর ক্রয়-বিক্রয়ের বাজারে পরিণত করা হয় *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ৩/৩১২ পৃ.; ফাতাওয়া ইবনে তায়মিয়াহ ৩১/২১৭ পৃ.)*।

প্রশ্ন (১২/১২) : মসজিদে মূল জামা'আত হয়ে যাওয়ার পর পুনরায় জামা'আত করে ছালাত আদায় করা যাবে কি? এসময় পুনরায় ইক্বামত দিতে হবে কি?

-মুহাম্মাদ আল-আমীন, কুড়িগ্রাম।

উত্তর : মসজিদে ছালাতের নির্ধারিত জামা'আত শেষ হওয়ার পর দ্বিতীয় জামা'আত করা যাবে এবং সেজন্য ইক্বামতও দিতে হবে *(বুখারী ১/২১৬; উছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ১৫/৮৩-৮৪; বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ১২/১৬৬)*। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, এক ব্যক্তি (মসজিদে) আগমন করল এমতাবস্থায় যে, জামা'আত শেষ হয়ে গেছে। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, 'কেউ এই লোকটিকে ছাদাক্বা করবে কি? অর্থাৎ তার সাথে ছালাত আদায় করবে কি?' তখন এক ব্যক্তি দাঁড়াল এবং ঐ লোকটির সাথে ছালাত আদায় করল' *(আবুদাউদ হা/৫৭৪; মিশকাত হা/১১৪৬)*। আলবানী বলেন, অত্র হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, এক মসজিদে একাধিক জামা'আত হ'তে পারে এবং জামা'আতে ছালাত আদায়কারী ব্যক্তিও অন্যের সাথে পুনরায় জামা'আত করতে পারেন *(আলবানী, তাহকীক মিশকাত ১/৩৬০ পৃঃ উক্ত হাদীছের টীকা-৩)*।

Contents

প্রশ্ন (১৩/১৩) : জানাযার ছালাত সূরা ফাতিহা ছাড়া আদায় করলে তা সুন্নাত মোতাবেক হবে কি?

-মুজীবুর রহমান, সাতক্ষীরা।

উত্তর : সূরা ফাতেহা ব্যতীত জানাযার ছালাত সুন্নাত মোতাবেক হবে না। কারণ সূরা ফাতিহা অন্যান্য ছালাতের ন্যায় জানাযার ছালাতেরও অন্যতম রুকন। কারণ সূরা ফাতিহা ব্যতীত ছালাত সিদ্ধ নয় *(বুখারী হা/৭৫৬; মুসলিম হা/৩৯৪; মিশকাত হা/৮২২)*। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) জানাযার ছালাতে সূরা ফাতিহা পাঠ করেছেন *(তিরমিযী হা/১০২৬; ইবনু মাজাহ হা/১৪৯৫)*। অন্য বর্ণনায় এসেছে, একবার আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) জানাযার ছালাতে সূরা ফাতিহা সরবে পড়লেন এবং বললেন, আমি এজন্য এটা পড়লাম যাতে তোমরা জান যে, এটি পড়া সুন্নাত' *(বুখারী হা/১৩৩৫; মিশকাত হা/১৬৫৪, 'লাশের অনুগমন ও জানাযার ছালাত' অনুচ্ছেদ)*। সূরা ফাতিহা ছাড়াও অন্য একটি সূরা পড়বে *(নাসাঈ হা/১৯৮৭)*। আনাস, ইবনু ওমর, ইবনু আব্বাস, আবু উমামাহ (রাঃ) প্রমুখ ছাহাবীগণ জানাযার ছালাতে সূরায়ে ফাতিহা পড়তেন *(বুখারী তা'লীক্ব ১/১৭৮ পৃ.; নাসাঈ হা/১৯৮৭-১৯৮৯; ইবনু মাজাহ হা/১৪৯৫; ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) পৃ. ২১৫)*।

প্রশ্ন (১৪/১৪) : আরাফার দিন জিবরীল (আঃ) দুনিয়ার নিকটবর্তী আসমানে নেমে আসেন কি?

-তারিক হাসান, পাবনা।

উত্তর : জিবরীল নন, স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা আরাফার দিনে প্রথম আকাশে নেমে আসেন। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'আরাফার দিন ব্যতীত অন্য কোন দিন আল্লাহ এত অধিক পরিমাণ লোককে জাহান্নাম থেকে মুক্ত করেন না। ঐদিন তিনি নিকটবর্তী হন। অতঃপর আরাফাহ ময়দানের হাজীদের নিয়ে ফেরেশতাদের নিকট গর্ব করে বলেন, দেখ ঐ লোকেরা কি চায়'? *(মুসলিম হা/১৩৪৮; মিশকাত হা/২৫৯৪; ছহীহাহ হা/২৫৫১)*। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, তিনি প্রথম আকাশে অবতরণ করেন *(ইবনু হিব্বান, ছহীহুল জামে' হা/১৩৬০)*।

প্রশ্ন (১৫/১৫) : মানববন্ধন বা মিছিল করা কি শরী'আত সম্মত?

-মেহেদী হাসান, গোপালগঞ্জ।

উত্তর : জনগণের ক্ষতি না করে এবং লোক চলাচলে ব্যাঘাত না ঘটিয়ে এগুলি করা যাবে। শান্তিপূর্ণ মিছিল বা মানববন্ধনে সাধারণতঃ এরূপ কোন বিশৃংখলা হয় না। রাসূল (ছাঃ) বলেন, অন্যায় কিছু দেখলে তা হাত দিয়ে প্রতিরোধ করবে। নইলে যবান দিয়ে। নইলে অন্তর দিয়ে ঘৃণা করবে। আর এটি হ'ল দুর্বলতম ঈমান' *(মুসলিম হা/৪৯; মিশকাত হা/৫১৩৭)*। তবে প্রতিবাদের নামে বিশৃংখলা সৃষ্টি করা, হরতাল করা, গাড়ি ভাংচুর করা, রাষ্ট্রকে আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করা কোনভাবেই জায়েয নয়।

প্রশ্ন (১৬/১৬) : রামাযান মাসে সফর অবস্থায় ছিয়াম পালন থেকে বিরত থাকা যরূরী কি?

-রুস্তম আলী, পুঠিয়া, রাজশাহী।

উত্তর : রামাযান মাসে সফর অবস্থায় ছিয়াম রাখা বা ছাড়া উভয়টিই জায়েয। আবু সাঈদ খুদরী, আনাস, ইবনু আব্বাস (রাঃ) সহ অনেক ছাহাবী থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে সফরকালে তিনি ছিয়াম পালনকারী বা পরিত্যাগকারী কাউকেই দোষারোপ করেননি। বরং তিনি কখনো রাখতেন আবার কখনো ছেড়ে দিতেন *(বুখারী হা/১৯৪৭, মুসলিম হা/১১১৩, ১১১৮; মিশকাত হা/২০২০)*। তবে কষ্টকর হ'লে ছেড়ে দেওয়াই ভাল। এক সফরে রাসূল (ছাঃ) জনৈক ব্যক্তিকে তার সাথীদের দ্বারা ছায়া দান করতে দেখে জিজ্ঞেস করলেন তার কি হয়েছে? তারা বলল, লোকটি ছিয়াম রেখেছে। রাসূল (ছাঃ) তখন বললেন, এটা কোন নেকীর কাজ নয় যে তোমরা সফরে ছিয়াম রাখবে *(মুসলিম হা/১১১৫)*। নববী বলেন, অর্থাৎ যদি তোমাদের জন্য তা কষ্টকর হয় এবং তোমরা ক্ষতির আশংকা কর *(শরহ মুসলিম ঐ ব্যাখ্যা দ্রঃ)*।

প্রশ্ন (১৭/১৭) : পবিত্র কুরআনের সর্বপ্রথম এবং সর্বশেষ অবতীর্ণ আয়াত কোনটি? দলীলসহ জানিয়ে বাধিত করবেন।

-শাহাদাত হোসাইন, উত্তরা, ঢাকা।

উত্তর : সর্বপ্রথম অবতীর্ণ আয়াত হ'ল সূরা আলাক্বের প্রথম পাঁচটি আয়াত- (১) 'পড় তোমার প্রভুর নামে যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন' (২) 'সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট রক্ত থেকে' (৩) 'পড় এবং তোমার প্রভু বড়ই দয়ালু' (৪) 'যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দান করেছেন' (৫) 'তিনি মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন যা সে জানত না' *(আলাক্ব ৯৬/১-৫; বুখারী হা/৪৯৫৩, মুসলিম হা/১৬০, মিশকাত হা/৫৮৪১; ফাৎহুল বারী ১/২৩, হা/৩)*। আর সর্বশেষ অবতীর্ণ আয়াত সম্পর্কে মতভেদ থাকলেও সর্বাধিক প্রসিদ্ধ মত হ'ল- সূরা বাক্বারাহর সর্বশেষ ২৮১ নং আয়াত- 'আর তোমরা ভয় কর সেই দিনকে, যেদিন তোমরা পুনরায় ফিরে যাবে আল্লাহ্‌র কাছে। অতঃপর প্রত্যেকেই তার কর্মফল পুরোপুরি পাবে। আর তাদের প্রতি কোনরূপ অবিচার করা হবে না' *(সৈয়ূত্বী, আল-ইৎক্বান ১/৩৫ পৃঃ)*। শেষোক্ত আয়াত সম্পর্কে ইমাম কুরতুবী বিভিন্ন বর্ণনা উদ্ধৃত করে বলেন, এটিই হ'ল সর্বাধিক পরিচিত, বহু সূত্রে বর্ণিত, সর্বাধিক বিশুদ্ধ ও সবচেয়ে প্রসিদ্ধ। যা রাসূল (ছাঃ)-এর মৃত্যুর ৭ বা ২১ দিন পূর্বে নাযিল হয় *(তাফসীর বাক্বারাহ ২৮১ আয়াত)*। ইবনু হাজার (রহঃ)ও এটাকে সর্বাধিক বিশুদ্ধ বলে মত পোষণ করেছেন *(ফাৎহুল বারী হা/৪৩৭৮-এর পূর্বে, ৮/৩১৭)*।

প্রশ্ন (১৮/১৮) : জনৈক বক্তা বলেন, তাহাজ্জুদের ছালাতের আউয়াল ওয়াক্ত রাত্রি ১০ থেকে ১১ টার মধ্যে হয়। সেকারণ এ সময়ের মধ্যে তাহাজ্জুদ আদায় করা যেতে পারে। এ বক্তব্য সঠিক কি?

-আরিফ, মিরপুর, ঢাকা।

উত্তর : উক্ত বক্তব্য সঠিক নয়। বরং তাহাজ্জুদের ছালাতের সঠিক সময় হ'ল রাত্রির তৃতীয় প্রহর *(বুখারী হা/৩৪২০; মুসলিম হা/১১৫৯; মিশকাত হা/১২২৫)*। যেসময় আল্লাহ তার বান্দাদেরকে ডেকে ডেকে বলেন, কে আছ আমাকে আহ্বানকারী, আমি তার আহ্বানে সাড়া দেব। কে আছ আমার কাছে যাঞ্চাকারী, আমি তাকে দান করব। কে আছ আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনাকারী, আমি তাকে ক্ষমা করব'। এভাবে বলতে থাকেন যতক্ষণ না ফজরের আলো স্পষ্ট হয়' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১২২৩; মুসলিম হা/৭৫৮)*। আর একারণেই রাসূল (ছাঃ)

তাহাজ্জুদ ফউত হওয়ার আশংকা থাকলে রাতের প্রথম ভাগে বিতর ছালাতের পর দু'রাক'আত নফল ছালাত আদায়ের নির্দেশ দিয়েছেন এবং একে রাত্রির নফল ছালাতের স্থলাভিষিক্ত হবে বলে ঘোষণা করেছেন *(দারেমী, মিশকাত হা/১২৮৬; ছহীহাহ হা/১৯৯৩)*। যদি এশার পরেই ওয়াক্ত হয়ে যেত, তাহলে এশার পর পুরো তাহাজ্জুদ আদায়েরই নির্দেশ দিতেন।

প্রশ্ন (১৯/১৯) : মসজিদে ছাগল, মুরগী, ডাব ইত্যাদি দান বা এসব বিক্রি করে মসজিদের উন্নয়নকাজে লাগানো যাবে কি?

-মাহবুবুর রহমান, গাংনী, মেহেরপুর।

উত্তর : যে কোন হালাল বস্তু ও প্রাণী মসজিদে দান করা যাবে ও তা বিক্রয় করে মসজিদের উন্নয়ন মূলক কাজে লাগানো যাবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির নিমিত্তে একটি মসজিদ নির্মাণ করবে, আল্লাহ তা'আলা জান্নাতে তার জন্য একটি গৃহ নির্মাণ করবেন' *(বুখারী হা/৪৫০; মিশকাত হা/৬৯৭)*। আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদিগকে আদেশ দিতেন- আমরা যেন আমাদের এলাকায় মসজিদ নির্মাণ করি, নির্মাণ কাজ সুন্দরভাবে করি এবং মসজিদ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র রাখি' *(আবুদাউদ হা/৪৫৫-৪৫৬; তিরমিযী হা/৫৯৪; ছহীহাহ হা/২৭২৪)*। অতএব মসজিদের উন্নয়নমূলক কাজে যে কোন হালাল বস্তু দান করা যাবে।

প্রশ্ন (২০/২০) : স্বামী কর্তৃক স্ত্রীর জীবিকা নির্বাহের খরচ বহন না করলে স্ত্রীর জন্য স্বামীর বিছানা থেকে পৃথক থাকার সিদ্ধান্ত গ্রহণে কোন বাধা আছে কি?

-ফাতেমা জাহান, কাদাকাটি, সাতক্ষীরা।

উত্তর : এরূপ ক্ষেত্রে বিছানা পৃথক না করে ধৈর্যধারণ করতে হবে। কারণ ধৈর্যের দ্বারা যে ফলাফল পাওয়া যায়, অন্য কিছু দ্বারা তা পাওয়া যায় না *(বুখারী হা/১৪৬৯, মুসলিম হা/১০৫৩)*। এভাবে স্বামীকে অন্যায় পথ থেকে ফিরিয়ে আনার সাধ্যমত চেষ্টা করতে হবে। এতে একসময় স্বামী অন্যায় সিদ্ধান্ত থেকে ফিরে আসতে পারে। তবে এতেও পরিবর্তন না আসলে ঘর পৃথক করা বা একবারেই বিচ্ছিন্ন হওয়ার অধিকার স্ত্রীর রয়েছে। কারণ স্ত্রীর যাবতীয় খরচ বহন করার দায়িত্ব স্বামীর। এ দায়িত্ব পালন না করলে স্বামী কঠিন গুনাহের ভাগিদার হবেন *(নিসা ৪/৩৪)*। মু'আবিয়া (রাঃ) বলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! আমাদের উপর স্ত্রীদের হক কি? তিনি বললেন, 'যখন তুমি খাবে, তখন তোমার স্ত্রীকে খাওয়াবে। যখন কাপড় ক্রয় করবে, তখন তার জন্যও ক্রয় করবে। আর তার মুখে প্রহার করবে না ও অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ করবে না। নিজ বাড়ী ব্যতিরেকে স্ত্রীকে কোথাও একাকী ছাড়বে না' *(আবুদাঊদ হা/২১৪২; মিশকাত হা/৩২৫৯)*।

প্রশ্ন (২১/২১) : শিক্ষক শ্রেণীকক্ষে প্রবেশ করলে শিক্ষার্থীদের জন্য দাঁড়িয়ে সালাম দেওয়া শরী'আত সম্মত হবে কি?

-আব্দুল্লাহ ছাকিব, গাযীপুর।

উত্তর : এভাবে সালাম দেওয়া শরী'আত সম্মত নয়। বরং শিক্ষক শ্রেণীকক্ষে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে সালাম দিবেন *(বুখারী হা/৬২৩১; মিশকাত হা/৪৬৩৩)* এবং তারা উত্তর দিবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'যদি কেউ এতে আনন্দবোধ করে যে, লোকেরা তাকে দেখে স্থিরভাবে দণ্ডায়মান থাকুক, তাহ'লে সে জাহান্নামে তার ঠিকানা বানিয়ে নিল *(তিরমিযী হা/২৭৫৫; মিশকাত হা/৪৬৯৯)*। অন্য বর্ণনায় এসেছে, 'ছাহাবীদের কাছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর চেয়ে অধিক প্রিয় ব্যক্তি আর কেউ ছিলেন না। কিন্তু তবুও তাদের অবস্থা এমন ছিল যে, যখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে আগমন করতে দেখতেন, তখন কেউই তার সম্মানার্থে দাঁড়াতেন না। কেননা তারা জানতেন যে, রাসূল (ছাঃ) এটা পসন্দ করেন না' *(তিরমিযী হা/২৭৫৪; ছহীহাহ হা/৩৫৮; মিশকাত হা/৪৬৯৮)*।

প্রশ্ন (২২/২২) : জুম'আর ছালাতের পূর্বে তাহিইয়াতুল মাসজিদ সহ কত রাক'আত ছালাত আদায় করা শরী'আতসম্মত?

-ফরহাদ আলম, বাগদাদ, ইরাক।

উত্তর : জুম'আর ছালাতের পূর্বে তাহিইইয়াতুল মসজিদ দু'রাক'আত ব্যতীত নির্ধারিত কোন ছালাত নেই। বরং খুৎবার আগ পর্যন্ত দুই দুই রাক'আত করে যতটুকু সম্ভব নফল ছালাত আদায় করবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি জুম'আর দিনে গোসল করে ছালাতে আসবে এবং সাধ্যানুযায়ী ছালাত আদায় করবে। তারপর ইমাম খুৎবা শেষ করা পর্যন্ত চুপ থাকবে এবং তার সাথে ছালাত আদায় করবে, তার জন্য উক্ত জুম'আ ও পরবর্তী জুম'আর মাঝের পাপসমূহ এবং অতিরিক্ত আরো তিন দিনের পাপ ক্ষমা করা হবে *(মুসলিম হা/৮৫৭; মিশকাত হা/১৩৮২)*। ইমাম শাওকানী (রহঃ) বলেন, এ হাদীছে দলীল রয়েছে যে, জুম'আর পূর্বে ছালাতে নির্ধারিত কোন রাক'আত সংখ্যা নেই *(নায়লুল আওত্বার হা/১২২২-এর ব্যাখ্যা দ্রঃ)*। এছাড়া অন্য হাদীছ দ্বারাও এটাই প্রমাণিত হয় *(বুখারী হা/৯১০; মিশকাত হা/১৩৮১)*।

এছাড়া জুম'আর পর দুই, চার বা ছয় রাক'আত সুন্নাত পড়বে *(মুসলিম হা/৮৮১; আবুদাউদ হা/১১৩২; তিরমিযী হা/৫২৩; মিশকাত হা/১১৮৭, ১১৬৬)*। উল্লেখ্য, জুম'আর আগে 'ক্বাবলাল জুম'আ' বলে পরিচিত চার রাক'আত ছালাত পড়া সম্পর্কে বর্ণিত হাদীছ ও আছারসমূহ যঈফ *(ইবনু মাজাহ হা/১১২৯; সিলসিলা যঈফাহ হা/১০০১, ১০১৬, ৫২৯০; মির'আতুল মাফাতীহ ৪/৪৫৭)*।

প্রশ্ন (২৩/২৩) : বিবাহের ওয়ালীমার ন্যায় আক্বীক্বার দাওয়াত দেওয়া যাবে কি?

-সোহাইল আহমাদ, পত্নীতলা, নওগাঁ।

উত্তর : ইসলামের সোনালী যুগে আক্বীক্বার জন্য লোকদেরকে দাওয়াত দেওয়ার কোন প্রচলন ছিল না। ইবনু 'আব্দিল বার্র ইমাম মালেক (রহঃ)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, 'বিবাহের ওয়ালীমায় যেভাবে লোকদেরকে দাওয়াত দেওয়া হয়, সেভাবে আক্বীক্বায় লোকদের দাওয়াত দেওয়া হ'ত না' *(ইবনুল ক্বাইয়িম, তুহফাতুল মওদূদ বি আহকামিল মওলূদ পৃঃ ৬০)*। তবে আক্বীক্বার গোশত কুরবানীর গোশতের ন্যায় তিন ভাগ করে একভাগ ফকীর-মিসকীনকে ছাদাক্বা দিবে ও একভাগ বাপ-মা ও পরিবার খাবে এবং একভাগ আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদের মধ্যে হাদিয়া হিসাবে বণ্টন করবে *(বায়হাক্বী ৯/৩০২ পৃ.)*। চামড়া বিক্রি করে তা কুরবানীর পশুর চামড়ার ন্যায় ছাদাক্বা করে দিবে *(ইবনে রুশদ, বিদায়াতুল মুজতাহিদ ১/৪৬৭ পৃঃ; মাসায়েলে কুরবানী ও আক্বীক্বা পৃ. ৫২)*।

প্রশ্ন (২৪/২৪) : কোন ব্যক্তির এক স্ত্রীর সন্তান যদি তার অন্য স্ত্রীর দুধ পান করে তবে দুধপানকারীর মা কি তালাক হয়ে যাবে?

-তাজুল ইসলাম, ময়মনসিংহ।

উত্তর : তালাক হবে না। বরং তিনি উক্ত সন্তানের দুধ মা

Contents

হিসাবে গণ্য হবেন *(বুখারী হা/২৬৪৫; মিশকাত হা/৩১৬১)*।

প্রশ্ন (২৫/২৫) : আমরা তিন ভাই পৃথক পৃথক পরিবার নিয়ে বসবাস করি। আমাদের মা জীবিত আছেন তবে আমাদের রান্না পৃথকভাবে হয় এবং জমিজমা এখনো বণ্টিত হয়নি। এমতাবস্থায় সবাই মিলে একত্রে একটি পশু কুরবানী দিলে তা শরী'আতসম্মত হবে কি?

-শহীদুল ইসলাম, সৈয়দপুর, নীলফামারী।

উত্তর : কবুলযোগ্য হবে না *(বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ১৮/৩৭; ফাতাওয়া লাজনাহ দায়েমাহ ১১/৪০৬)*। তবে একান্নবর্তী পরিবারের সদস্য সংখ্যা যত বেশীই হৌক না কেন সকলের পক্ষ থেকে একটি পশুই যথেষ্ট হবে *(মুসলিম হা/১৯৬৭; মিশকাত হা/১৪৫৪)*।

প্রশ্ন (২৬/২৬) : মুসাফির অবস্থায় মুক্বীম ইমামের সাথে জামা'আতে শরীক হ'লে পূর্ণ ছালাত না ক্বছর আদায় করতে হবে?

-লতীফুল ইসলাম, টাঙ্গাইল।

উত্তর : উক্ত অবস্থায় পূর্ণ ছালাত আদায় করতে হবে। ইবনু ওমর (রাঃ) (সফরে) একাকী ছালাতরত অবস্থায় দু'রাক'আত এবং ইমামের সাথে চার রাক'আত ছালাত আদায় করতেন *(মুসলিম হা/৬৯৪, মিশকাত হা/১৩৪৭)*। ইবনু আব্বাস (রাঃ) এভাবে পড়াকেই সুন্নাত বলেছেন *(আহমাদ, ইরওয়া হা/৫৭১; ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/১৭৭)*।

প্রশ্ন (২৭/২৭) : ইমাম বুখারী (রহঃ) কোন মাযহাবের অনুসারী ছিলেন? অনেকেই বলে থাকেন যে ইমাম বুখারী সহ কুতুবে সিত্তাহর ইমামদের অধিকাংশই শাফেঈ মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। একথার কোন সত্যতা আছে কি?

-আব্দুল বারী, লোহাগড়া, নড়াইল।

উত্তর : ইমাম বুখারী (রহঃ) কোন মাযহাবের অনুসারী ছিলেন না। বরং তিনি একজন উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন মুহাদ্দিছ ও মুজতাহিদ ছিলেন। তিনি ইমাম শাফেঈ, মালেক ও আহমাদ (রহঃ)-এর ন্যায় হাদীছের অনুসরণ করতেন বলেই অধিকাংশ মাসআলায় তাঁদের সাথে ঐক্যমত পরিলক্ষিত হয়। অপরদিকে ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) অধিকাংশ ক্ষেত্রে রায় অনুযায়ী ফৎওয়া প্রদান করায় তাঁর সাথে মতপার্থক্য বেশী দেখা যায়। ভারতের দেওবন্দ মাদরাসার সাবেক মুহতামিম আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী বলেন, জেনে রেখ ইমাম বুখারী (রহঃ) নিঃসন্দেহে একজন মুজতাহিদ ছিলেন *(ফায়যুল বারী ১/৫৮)*। স্বীয় কিতাবে তিনি কারো তাক্বলীদ করেননি *(ফায়যুল বারী ১/৪৩৮)*। তিনি ফক্বীহদের নেতা ছিলেন *(তারীখে বাগদাদ ২/০৬)*। ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেন, এটা খুবই প্রসিদ্ধ যে ইমাম বুখারী হাদীছ থেকে মাসআলাসমূহ সাব্যস্ত করেছেন *(ফাৎহুল বারী ১/৮২)*। হাফেয যাহাবী বলেন, তিনি ইমাম, হাফেয, হুজ্জাত, ফিক্বহ ও হাদীছের নেতা এবং মুজতাহিদ ছিলেন। তিনি দ্বীনদারী, পরহেযগারিতা ও আল্লাহ ভীরুতার সাথে সাথে দুনিয়ার অনন্য সাধারণ ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন *(আল-কাশিফ ফী মা'রিফাতি মান লাহু রিওয়ায়াতুন ফিল কুতুবিস সিত্তাহ ৩/১৮, ক্রমিক নং ৪৭৯০)*। ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, ইমাম বুখারী ও আবুদাউদ ফিক্বহের ইমাম ও মুজতাহিদ মুত্বলাক্ব ছিলেন। পক্ষান্তরে মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ, ইবনু খুযায়মাহ, আবু ইয়া'লা, বাযযার প্রমুখ আহলেহাদীছ মাযহাবের উপরে ছিলেন। তারা কোন নির্দিষ্ট আলেমের মুক্বাল্লিদ ছিলেন না। তারা মুজতাহিদ মুত্বলাক্বও ছিলেন না *(মাজমূ' ফাতাওয়া ২০/৩৯-৪০)*। অতএব ইমাম বুখারীসহ কুতুবে সিত্তার অন্যান্য ইমামগণ হাদীছের অনুসারী ছিলেন। প্রচলিত কোন মাযহাবের মুক্বাল্লিদ ছিলেন না।

প্রশ্ন (২৮/২৮) : মক্কা বিজয়ের পূর্বে রাসূল (ছাঃ) যে কয়বার হজ্জ করেছেন প্রত্যেকবার কি তিনি ৩৬০টি মূর্তিকেও প্রদক্ষিণ করেছেন?

-মাহমূদুল হাসান, রাজারবাগ, ঢাকা।

উত্তর : রাসূল (ছাঃ) হিজরতের পরে মাত্র একবার হজ্জ করেছেন। যা বিদায় হজ্জ নামে খ্যাত *(বুখারী হা/৪৪০৪ মুসলিম হা/১২৫৩)*। তবে হিজরতের পূর্বে তিনি একাধিকবার হজ্জ করেছেন *(তিরমিযী হা/৮১৫; ইবনু মাজাহ হা/৩০৭৬; সনদ ছহীহ, আলবানী, হাজ্জাতুন নবী (ছাঃ) ৬৭-৮৩ পৃষ্ঠা)*। ইবনু হাজার বলেন, রাসূল (ছাঃ) হিজরতের পূর্বে একাধিকবার বরং প্রতিবছরই হজ্জ করেছেন। কারণ তখন কুরাইশদের মধ্যে এভাবে হজ্জ করার প্রচলন ছিল *(ফাৎহুল বারী ৮/১০৭)*। এক্ষণে যেহেতু মক্কা বিজয়ের সময় তিনি কা'বা গৃহে সংরক্ষিত মূর্তিসমূহ অপসারণ করেন *(বুখারী হা/৪২৮৭)*, তাতে বুঝা যায় যে, তা পূর্ব থেকেই সেখানে ছিল এবং রাসূল (ছাঃ) মূর্তি থাকা অবস্থাতেই কা'বা গৃহ তাওয়াফ করেছেন। ক্ষমতা না থাকায় তিনি তা অপসারণ করেননি। তবে তিনি কখনোই মূর্তি স্পর্শ করেননি *(ত্বাবারাণী কাবীর হা/৪৬৬৮; হাকেম হা/৪৯৫৬, সনদ ছহীহ)*।

প্রশ্ন (২৯/২৯) : ইবনু মাজাহ ৩০৫৬ নং হাদীছে যে আমীরগণের আনুগত্য করার কথা এসেছে, তাদের বৈশিষ্ট্য কি কি?

-এনামুল হক, চারঘাট, রাজশাহী।

উত্তর : মুসলমানদের বায়'আতপ্রাপ্ত আমীর হওয়ার প্রধানতম শর্ত হ'ল মুসলিম হওয়া *(নিসা ৪/১৪১, ৫৯; নববী শরহ মুসলিম ১২/২২৯)*। এছাড়া অন্যান্য প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ : (১) পবিত্র কুরআন এবং ছহীহ সুন্নাহ মোতাবেক জনগণকে পরিচালনা করা *(তিরমিযী হা/১৭০৬; ইবনু মাজাহ হা/২৮৬১)* (২) পুরুষ হওয়া *(বুখারী হা/৭০৯৯; মিশকাত হা/৩৬৯৩)* (৩) সৎকাজের আদেশ আর অসৎকাজ হ'তে নিষেধ করার গুণসম্পন্ন হওয়া *(হজ্জ ২২/৪১)* (৪) আমানাতদার হওয়া *(নিসা ৪/৫৮)* (৫) ন্যায়পরায়ণ হওয়া *(বুখারী হা/৬৬০; মিশকাত হা/৭০১)* ইত্যাদি।

প্রশ্ন (৩০/৩০) : ভিক্ষুককে খালি হাতে ফিরিয়ে দেওয়া যাবে কি? এ ব্যাপারে শরী'আতের কোন নির্দেশনা আছে কি? আর ভিক্ষুক ঘোড়ায় চড়ে আসলেও তার কিছু পাওয়ার অধিকার আছে মর্মে বর্ণিত হাদীছটি কি ছহীহ?

-মুজাহিদুল ইসলাম, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : প্রত্যেক ভিক্ষুককে ভিক্ষা চাইলে কিছু দান করা যরূরী। উম্মু বুজাইদ (রাঃ) বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! ভিক্ষুক আমার দরজায় দাঁড়ায়, আমার বাড়িতে কিছু না থাকায় আমি তার হাতে কিছু দিতে পারি না, এতে আমি লজ্জাবোধ করি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, কিছু হ'লেও দাও' *(আহমাদ হা/২৭১৯২; আবুদাঊদ হা/১৬৬৭; তিরমিযী হা/৬৬৫; মিশকাত/১৮৭৯)*। এছাড়া আল্লাহ তা'আলা সাহায্যপ্রার্থীকে ধমকাতে নিষেধ করেছেন *(যোহা ৯৩/১০)*। অন্য আয়াতে অপারগ অবস্থায় কিছু দিতে না পারলে তাদের সাথে নম্রভাবে কথা বলার নির্দেশনা এসেছে *(বনী ইস্রাঈল ১৭/২৮)*। তবে সংশোধন ও কল্যাণের স্বার্থে কঠোর হওয়াটা এই নিষেধের অন্তর্ভুক্ত

Contents

নয়। কারণ সুস্থ সবল দেহী মানুষের জন্য ভিক্ষা করা জায়েয নয়। সেকারণ এরূপ ভিক্ষুকদেরকে উপদেশ ও সতর্কীকরণের মাধ্যমে এ পেশা থেকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করতে হবে। আর ভিক্ষুক ঘোড়ায় চড়ে আসলেও তার অধিকার আছে মর্মে বর্ণিত হাদীছটি যঈফ *(আহমাদ হা/১৭৩০; সিলসিলা যঈফাহ হা/১৩৭৮)*।

প্রশ্ন (৩১/৩১) : শরী'আত সম্মতভাবেই আমার বিবাহ হয়। কিন্তু আমার পিতা আমার স্ত্রীকে অপসন্দ করেন এবং তালাক দিতে বলেন। এমতাবস্থায় আমার করণীয় কি?

-সাজেদুর রহমান, সারিয়াকান্দী, বগুড়া।

উত্তর : শারঈ কারণের প্রেক্ষিতে পিতা-মাতা যদি অনুরূপ নির্দেশ দেন, তবে তা মান্য করতে হবে। ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, 'আমার স্ত্রীকে আমি ভালবাসতাম। কিন্তু আমার পিতা ওমর তাকে ঘৃণা করতেন এবং আমাকে তালাক দিতে বললেন। আমি তালাক দিতে অস্বীকার করি। আমার পিতা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট এসে ঘটনা বর্ণনা করলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাকে তালাক দেওয়ার নির্দেশ দিলেন' *(আবুদাঊদ হা/৫১৩৮; মিশকাত হা/৪৯৪০, সনদ ছহীহ)*। ছাহাবী আবুদ্দারদার নিকটে এক ব্যক্তি এসে বলল, আমার মা আমাকে আমার স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। (আমি কি করব?) আবুদ্দারদা (রাঃ) বললেন, আমি আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, পিতা-মাতা হচ্ছেন জান্নাতের দরজাসমূহের মধ্যম দরজা। তুমি যদি চাও, তাহ'লে দরজাটিকে বিনষ্ট কর অথবা সেটিকে সংরক্ষণ কর *(তিরমিযী হা/১৯০০; মিশকাত হা/৪৯২৮; সনদ ছহীহ)*।

তবে স্ত্রী যদি দ্বীনদার ও ন্যায়পরায়ণ হয় এবং কোন মারাত্মক অপরাধে অপরাধী না হয়, তাহ'লে পিতা-মাতাকে অবশ্যই সেদিকে খেয়াল রেখে তালাক দেওয়ার নির্দেশ না দেওয়া উচিত। কেননা ইসলাম স্বামী-স্ত্রীর বিচ্ছেদ পসন্দ করে না। বরং সংসার অক্ষুণ্ণ রাখাই ইসলামী শরী'আতের একান্ত লক্ষ্য।

প্রশ্ন (৩২/৩২) : ছালাতে কিংবা ছালাতের বাইরে হাই উঠলে করণীয় কি? 'লা-হাওলা ওয়ালা-কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ' বা আসতাগফিরুল্লাহ' বলা যাবে কি?

-সবুজ মিয়াঁ, সরোজগঞ্জ, চুয়াডাঙ্গা।*

**[আরবীতে সুন্দর নাম রাখুন (স.স.)]*

উত্তর : হাই উঠার সময় কোন দো'আ পড়তে হবে না। বরং এসময় 'হা' করে শব্দ না করে মুখে হাত দিয়ে চেপে রাখতে হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যখন তোমাদের কারো হাই আসে তখন সে যেন স্বীয় হাত দ্বারা নিজের মুখ বন্ধ করে রাখে। কেননা শয়তান মুখের ভিতর প্রবেশ করে' *(মুসলিম হা/২৯৯৫; মিশকাত হা/৪৭৩৭)*। উল্লেখ্য যে, এসময় 'লা হাওলা ওয়া লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ' বা 'আসতাগফিরুল্লাহ' বলার কোন দলীল নেই *(দ্রষ্টব্য : ফাৎহুল বারী হা/৬২২৬-এর ব্যাখ্যা; উছায়মীন, লিকাউল বাবিল মাফতূহ)*। এছাড়া ছালাত অবস্থায় হাঁচি-কাশির শব্দ চেপে রাখতে হবে। কেননা তা অন্যের মনোযোগে বিঘ্ন ঘটায়।

প্রশ্ন (৩৩/৩৩) : গোসল করার সময় বস্ত্রহীন থাকা যাবে কি?

-মেহেদী হাসান, সাভার, ঢাকা।

উত্তর : মানব চক্ষুর অন্তরালে কিংবা বাথরুমের মধ্যে হ'লে যাবে *(বুখারী হা/২৭৯, ৩৪০৪; মিশকাত হা/৫৭০৭, ৫৭০৬)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তোমাদের কেউ যখন গোসল করবে তখন সে যেন পর্দা করে' *(নাসাঈ হা/৪০৬; মিশকাত হা/৪৪৭)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর গুপ্তাঙ্গ কখনো দেখেননি বলে আয়েশা (রাঃ) বর্ণিত হাদীছটি যঈফ *(ইবনু মাজাহ হা/৬৬২)*। এছাড়া যায়েদ বিন হারেছাহকে আলিঙ্গনের সময় রাসূল (ছাঃ) নগ্ন হয়ে গিয়েছিলেন মর্মে আয়েশা (রাঃ) বর্ণিত হাদীছটিও যঈফ এবং এর অর্থ তাঁর দেহের উপরাংশের কাপড় পড়ে গিয়ে নগ্ন হওয়া *(তিরমিযী হা/২৭৩২; মিশকাত হা/৪৬৮২; তুহফা হা/২৭৩২)*।

প্রশ্ন (৩৪/৩৪) : পেপার-পত্রিকা বা বইয়ে প্রকাশিত রাশিফলের কোন কার্যকারিতা আছে কি? এসব পড়া যাবে কি?

-শাহরিয়ার ছালেহীন, পবা, রাজশাহী।

উত্তর : রাশিফলের কোন কার্যকারিতা নেই। বরং এগুলি মানুষকে আল্লাহ্র উপর বিশ্বাস থেকে দূরে নিয়ে যাওয়ার একেকটি শয়তানী ফাঁদ মাত্র। এর মাধ্যমে কৃত ভবিষ্যদ্বাণী বিশ্বাস করলে বা তা সত্য বলে মেনে নিলে আমল বিনষ্ট হয়ে যাবে। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি গণকের কাছে যায় এবং তাকে কোন কথা জিজ্ঞেস করে, তার ৪০ দিনের ছালাত কবুল হয় না' *(মুসলিম হা/২২৩০; মিশকাত হা/৪৫৯৫)*। তিনি বলেন, 'যে ব্যক্তি গণকের কাছে গেল এবং সে যা বলে তা বিশ্বাস করল, ঐ ব্যক্তি মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে, তার সাথে কুফরী করল' *(আবুদাঊদ হা/৩৯০৪; মিশকাত হা/৪৫৯৯)*।

উল্লেখ্য যে, জ্যোতিষীরা ভাগ্য গণনার জন্য প্রাচীন যুগেই তৈরী করেছে রাশিচক্র। রাশিচক্র মাকড়শার জালের মত একটি চক্রাকার চিত্র, যাতে সূর্যের গতিপথ অনুসারে ১২টি রাশি স্থির করা হয়েছে। সেখানে বিশেষ কোন দিনে নক্ষত্রমণ্ডলের পটভূমিতে দেখানো হয় বিভিন্ন গ্রহ, সূর্য ও চন্দ্রের অবস্থান। এই অবস্থান অনুসারে নেওয়া হয় ভাগ্য গণনার সিদ্ধান্ত। পশ্চিমা বিশ্বে 'শুক্র' (ভেনাস)-কে প্রেমের দেবী বলা হয়। অতএব শুক্র যদি রাশিচক্রের বিশেষ স্থানে থাকে, তাহ'লে জ্যোতিষীরা বলে থাকে জাতকের উপর প্রেম ভর করেছে। পক্ষান্তরে ভারতীয় পুরাণে 'শুক্র' অসুরদের গুরু। অতএব ভারতীয় মতে জ্যোতিষীরা বলে থাকে, জাতকের উপর প্রেমের বদলে হিংস্রতা ভর করেছে। ফলে কোন ব্যক্তি পশ্চিমাদের রাশিচক্র অনুসারে প্রেমে ডুববে এবং আবার কেউ ভারতীয় মতে হিংস্রতায় মেতে উঠবে; যা পরস্পর বিরোধী। এছাড়াও পশ্চিমারা সূর্যের হিসাবে ভাগ্য গণনা করে এবং ভারতীয়রা চন্দ্রের হিসাবে গণনা করে। সবকিছুই কাল্পনিক। ফলে মতভেদ স্বাভাবিক *(তাফসীরুল কুরআন ৩০তম পারা, সূরা বুরূজের তাফসীর দ্রষ্টব্য ২০১ পৃ.)*। অতএব এসব পাঠ করা বা গবেষণা করা থেকে বিরত থাকা আবশ্যক।

প্রশ্ন (৩৫/৩৫) : মাসিক অবস্থায় নারীরা তা'লীমী বৈঠক সহ বিভিন্ন কারণে মসজিদে অবস্থান করতে পারবে কি?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, রাজশাহী।

উত্তর : মাসিক অবস্থায় নারীরা মসজিদে অবস্থান করতে পারবে। তবে ছালাত আদায় করতে পারবে না। রাসূল (ছাঃ) ঋতুবতী অবস্থায় কেবলমাত্র ছালাত ও তাওয়াফ থেকে নিষেধ করেছেন, মসজিদে গমন থেকে নয়। যেমন ঋতুবতী অবস্থায় আয়েশা (রাঃ) হজ্জ পালনের জন্য মক্কায় আসলে রাসূল (ছাঃ) তাকে ছালাত ও তাওয়াফ ব্যতীত হজ্জের যাবতীয় বিধান পালনের অনুমতি দেন *(বুখারী হা/৭২৩০)*। স্মর্তব্য যে, উম্মু সালামা ও আয়েশা

Contents

(রাঃ) থেকে ঋতুবতী ও অপবিত্র ব্যক্তির জন্য মসজিদ হালাল' নয় মর্মে বর্ণিত হাদীছটি যঈফ *(আবুদাঊদ হা/২৩২; মিশকাত হা/৪৬২)*।

প্রশ্ন (৩৬/৩৬) : মসজিদের নামের সাথে আহলেহাদীছ যুক্ত করায় শরী'আতে কোন বাধা আছে কি?

-শাহাদত হোসাইন, ফুলবাড়িয়া, ময়মনসিংহ।

উত্তর : মসজিদের নামের সাথে 'আহলেহাদীছ' যুক্ত করায় শরী'আতে কোন বাধা নেই। রাসূল (ছাঃ)-এর যুগে 'মসজিদে ক্বোবা', 'মসজিদে বনী যুরায়েক্ব' নামে মসজিদ সমূহের নামকরণ করা হয়েছিল *(বুখারী হা/৪২০; মুসলিম হা/১৮৭০; মিশকাত হা/৩৮৭০)*। ইবনু হাজার (রহঃ) বলেন, এ হাদীছ দ্বারা মসজিদকে এর নির্মাতা বা এতে ছালাত আদায়কারীদের সাথে সম্পর্কিত করা জায়েয হওয়ার ফায়দা পাওয়া যায় *(ফাৎহুল বারী হা/৪২০-এর ব্যাখ্যা দ্রঃ)*। নববী বলেন, পরিচিতির স্বার্থে এরূপ নামকরণে কোন বাধা নেই *(আল-মাজমূ' ২/২০৮)*। এছাড়া মসজিদুল আক্বছা, মসজিদুল হারাম নামদ্বয় পবিত্র কুরআনে এসেছে *(ইসরা ১৭/১)*।

প্রকাশ থাকে যে, 'আহলেহাদীছ' হ'ল পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের অনুসারীদের নাম। এক্ষণে যে মসজিদের ব্যবস্থাপনা আহলেহাদীছগণের হাতে থাকে এবং যে মসজিদ পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের ভিত্তিতে পরিচালিত হয় এবং যাবতীয় শিরক ও বিদ'আতী আচার-অনুষ্ঠান হ'তে মুক্ত থাকে, তাকেই 'আহলেহাদীছ মসজিদ' বলা হয়। তবে সেখানে যেকোন মুসলমানের ছালাত আদায়ের পূর্ণ অধিকার থাকবে।

প্রশ্ন (৩৭/৩৭) : ইমাম গাযালী (রহঃ) রচিত 'কীমিয়ায়ে সা'আদাত' বইতে এসেছে, রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে জনৈক ব্যক্তি অভাবগ্রস্ত হওয়ার অভিযোগ নিয়ে আসলে তিনি তাকে সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী... দো'আটি পাঠ করতে বলেন। ফলে সে ধনী হয়ে যায়। হাদীছটি কি ছহীহ?

-মামূন, গোপালপুর, নওগাঁ।

উত্তর : উক্ত মর্মে বর্ণিত হাদীছটি যঈফ *(মুসনাদুল ফিরদাঊস হা/৩৭৩১; লিসানুল মীযান হা/১৭০০, ইবনু হাজার বলেন, এটি একাধিক সনদে বর্ণিত হলেও তার সবই যঈফ)*। তবে অভাব বা ঋণমুক্তির জন্য অনেক বিশুদ্ধ দো'আ হাদীছে বর্ণিত হয়েছে। যেমন (১) 'আল্লাহুম্মাগফিরলী যানবী ওয়া ওয়াসসি'লী ফী দারী ওয়া বারিকলী ফী-মা রাযাক্বতানী' অর্থাৎ 'হে আল্লাহ! তুমি আমার গোনাহসমূহ ক্ষমা কর, আমার গৃহকে প্রশস্ত কর এবং আমাকে তুমি যে জীবিকা দান করেছ তাতে বরকত দান কর' *(তিরমিযী হা/৩৫০০, ৬৩; মিশকাত হা/২৪৪৯)*। (২) *আল্লা-হুম্মাকফিনী বিহালা-লিকা 'আন হারা-মিকা ওয়া আগ্নিনী বিফায্লিকা 'আম্মান সিওয়া-কা।* অর্থাৎ 'হে আল্লাহ! আপনি আমাকে হারাম ছাড়া হালাল দ্বারা যথেষ্ট করুন এবং আপনার অনুগ্রহ দ্বারা আমাকে অন্যদের থেকে মুখাপেক্ষীহীন করুন! রাসূল (ছাঃ) বলেন, এই দো'আর ফলে পাহাড় পরিমাণ ঋণ থাকলেও আল্লাহ তার ঋণ মুক্তির ব্যবস্থা করে দেন' *(তিরমিযী হা/৩৫৬৩; মিশকাত হা/২৪৪৯)*।

প্রশ্ন (৩৮/৩৮) : আমাদের এলাকায় কুরবানীর গোশত এক-তৃতীয়াংশ পঞ্চায়েতে জমা করার পর সেখান থেকে গরীবদের মাঝে বিতরণ করা হয়। কিন্তু সবসময় দেখা যায় সবাইকে দেওয়ার পর অনেক গোশত বেঁচে যায় এবং পঞ্চায়েত কমিটির সদস্যরা নিজেদের পরিবারের সদস্য সংখ্যা অনুযায়ী নিজেরা ভাগ করে নেন। এভাবে নিজেরা গোশত বণ্টন করে নেওয়া শরী'আত সম্মত হবে কি?

-মিনহাজুল ইসলাম, গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

উত্তর : গরীবদের মাঝে বিতরণের জন্য জমাকৃত গোশত বন্টনের পর অতিরিক্ত গোশত নিজেদের মধ্যে বণ্টন করে নেওয়া জায়েয নয়। কেননা দান করে ফেরত নেওয়াকে রাসূল (ছাঃ) বমি করে পুনরায় তা ভক্ষণ করার সাথে তুলনা করেছেন *(বুখারী হা/১৪৯০, মিশকাত হা/১৯৫৪)*। এক্ষেত্রে প্রয়োজনে পরিমাণ বৃদ্ধি করে হকদারদের মধ্যে বণ্টন করে দিতে হবে। অথবা অতিরিক্ত অংশ পার্শ্ববর্তী গ্রামের হকদারদের নিকটে পৌঁছে দিতে হবে। তবে পঞ্চায়েতের কোন সদস্য দরিদ্র হ'লে এবং কুরবানী না দিয়ে থাকলে তাকেও এর অংশ দেওয়ায় কোন বাধা নেই *(দ্রঃ মাসায়েলে কুরবানী ও আক্বীক্বা পৃ. ২২-২৩)*।

প্রশ্ন (৩৯/৩৯) : হাশরের দিন সন্তানকে পিতার নাম ধরে, না মাতার নাম ধরে ডাকা হবে?

- আব্দুল মান্নান, মান্দা, নওগাঁ।

উত্তর : হাশরের দিন প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার নাম, পিতার নাম ও বংশ পরিচয় সহ আহ্বান করা হবে *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৯৬)*।

প্রশ্ন (৪০/৪০) : আদম (আঃ) দুই সন্তান হাবীল ও ক্বাবীল-এর মধ্যে বিরোধ সম্পর্কিত ঘটনার সত্যতা সম্পর্কে জানতে চাই।

-ক্বামরুল ইসলাম, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

উত্তর : উক্ত বিষয়ে রাসূল (ছাঃ) থেকে কোন হাদীছ বর্ণিত হয়নি। বরং এ বিষয়ে কুরআনী বর্ণনা হ'ল এই যে, আদম (আঃ)-এর পুত্রদ্বয় আল্লাহ্র নামে কুরবানী করেছিল। কিন্তু আল্লাহ একজনের কুরবানী কবুল করেন, অন্যজনেরটা করেননি। এতে একজন ক্ষুব্ধ হয়ে অপরজনকে বলল, 'আমি অবশ্যই তোমাকে হত্যা করব'। জবাবে সে বলল, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তাক্বওয়াশীল বান্দাদের থেকে (কুরবানী) কবুল করে থাকেন। এক্ষণে যদি তুমি আমাকে হত্যা করতে উদ্যত হও, তবে আমি তোমাকে পাল্টা হত্যা করতে উদ্যত হব না। কেননা আমি বিশ্বচরাচরের পালনকর্তা আল্লাহকে ভয় করি'। অতঃপর ক্ষিপ্ত হয়ে একজন অন্যজনকে হত্যা করে, যার কুরবানী কবুল হয়েছিল *(মায়েদাহ ৫/২৭-৩১)*।

উক্ত আয়াতসমূহ থেকে স্পষ্ট হয় যে, ভ্রাতৃ হত্যার কারণ ছিল এই হিংসা বশতঃ যে, হাবীলের কুরবানী কবুল হয়েছিল, কিন্তু ক্বাবীলের কুরবানী কবুল হয়নি। আর ভালোর প্রতি হিংসা মানুষের মধ্যে চিরন্তন।

তবে বিবাহগত মতবিরোধের কারণে তাদের মধ্যে ক্রোধের সঞ্চার হওয়া এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে আগুন এসে কুরবানী উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া বিষয়ে যে সব 'আছার' বর্ণিত হয়েছে, সে সম্পর্কে তিরমিযীর ভাষ্যকার আহমাদ শাকের বলেন, এগুলি আহলে কিতাবদের গ্রন্থসমূহ থেকে গৃহীত, যার কোন বিশুদ্ধ ভিত্তি নেই। তবে এগুলি উত্তম সনদে বর্ণিত হওয়ায় আমরা তা গ্রহণ করব উদাহরণ হিসাবে, বিশুদ্ধ ও কবুলযোগ্য বর্ণনা হিসাবে নয় *(আহমাদ শাকের, উমদাতুত তাফসীর মুখতাছার তাফসীর ইবনে কাছীর (আলেকজান্দ্রিয়া, মিসর, দারুল ওয়াফা : ২য় সংস্করণ ১৪২৬/২০০৫) ১/৬৬২-৬৬৩)*।